নিশিপালন

বিমল মিত্র

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
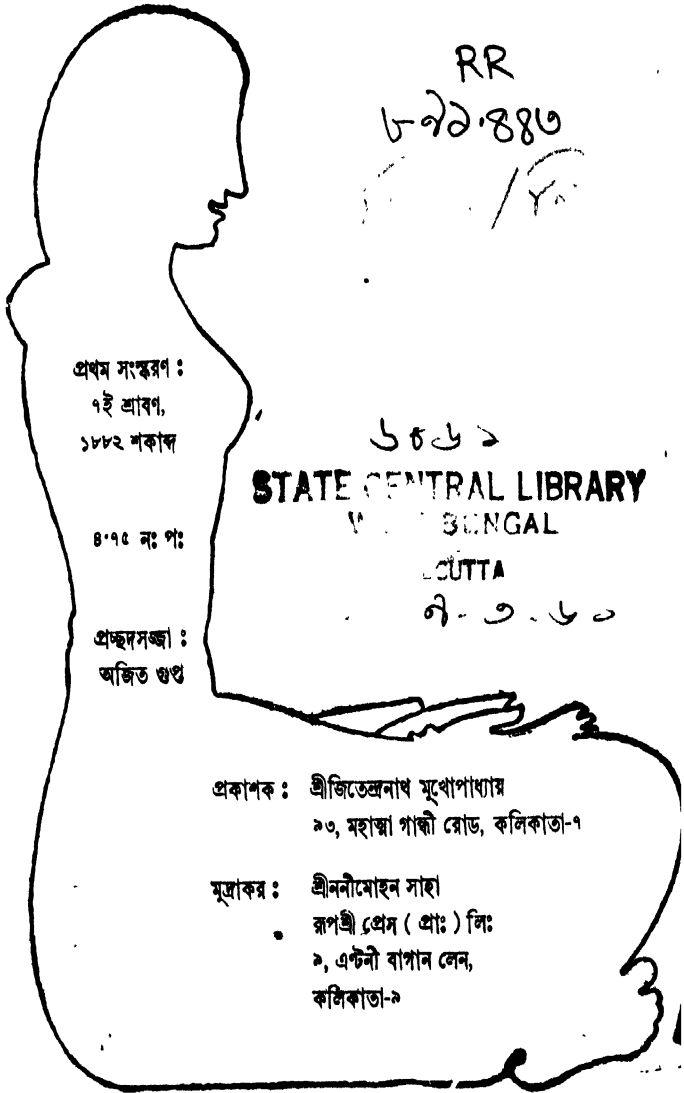
প্রথম সংস্করণ :
৭ই শ্রাবণ,
১৮৮২ শকাব্দ

৪.৭৫ নঃ পঃ

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৯, এণ্টনী বাগান লেন,
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু

লেখক-জীবনের সব চেয়ে বড় শত্রু তার খ্যাতি। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গেই বলতে গেলে সত্যিকারের লেখক-জীবনের পরীক্ষার পালা আরম্ভ হয়। খ্যাতির সঙ্গে বিষও আসে, অমৃতও আসে। শত্রুও আসে, বন্ধুও আসে। কিন্তু কজন লেখক পারে বিষামৃতের সমন্বয় সাধন করতে! জীবনের দেবতাকে উদ্দেশ করে কে বলতে পারে—বিষও তোমার দেওয়া, অমৃতও তোমার দেওয়া—। তাই তোমার দেওয়া বিষামৃত, তোমারই দেওয়া নিন্দা-প্রশংসা সব আমি মাথায় তুলে নিলাম! তুমি আমাকে সর্ববিভেদের উর্ধ্বে রেখে আমার মধ্যে এসে আমার হয়ে সর্ব-সাধারণের হও!

যাঁরা জনপ্রিয় লেখক তাঁদের খ্যাতি আরো ভয়াবহ।

প্রশংসা যেমন তাঁদের ভাগ্যে জোটে অপ্রত্যাশিত, নিন্দাও জোটে অকুণ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে-গ্লানি এসে পড়ে আমার ভাগ্যে অন্যদের চেয়ে তা অনেক আবিল হয়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মত আর কোনও সাহিত্যিককেই সইতে হয়নি। এও আমার খ্যাতি পরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি।"

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বলি!

একদিন সকালবেলা একটি ছেলে এসে হাজির। বয়েস বেশি নয়। গোঁফ দাড়ি ওঠেনি—চৌদ্দ পনরোর বেশি নয় বয়েস। লাজুক বিনয়ী প্রকৃতির ছেলে। আস্তে আস্তে সঙ্কুচিত হয়ে ঘরে ঢুকলো।

জিজ্ঞেস করলাম—কে তুমি?

ছেলেটি বললে—আমার মা আপনার কাছে একটা লেখা পাঠিয়েছিলেন, সেটা আপনি পড়েছেন?

লেখা অনেক লোকই পাঠিয়েছে—কেউ পত্রিকায় প্রকাশ

করবার সুপারিশের জন্যে, কেউ বা পড়ে মতামত দেবার জন্যে। বেশির ভাগ লেখাই স্তোকবাক্য দিয়ে ফেরত দেবার মতন। সকলের নাম-ধাম মনে রাখবার কথা নয়।

তবু জিজ্ঞেস করলাম—কী লেখা? লেখাটার নাম কী?

ছেলেটি বললে—নিশিপালন।

বললাম—উপন্যাস?

ছেলেটি বললে—ঠিক উপন্যাস নয়, জীবনী! মা নিজের জীবনের সব ঘটনাগুলো লিখে ছিল আপনাকে দেখাবার জন্যে —ইচ্ছে ছিল যদি আপনার পছন্দ হয় তা নিয়ে আপনি উপন্যাস লিখতে পারেন—

এ এক নতুন ধরনের প্রস্তাব! এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না। খানিকটা কৌতূহল হলো।

ছেলেটি আবার বললে—মা নাম দিয়েছিল 'নিশিপালন'—তবে আপনি ইচ্ছে করলে নামটা বদলাতে পারেন, মা বলেছিল আপনিই ঠিক বুঝতে পারবেন মার জীবনের কথাগুলো। অনেক পাতা লেখা হয়েছিল—প্রায় চার শো পাতার কাছাকাছি। মার ইচ্ছে ছিল আপনার সঙ্গে নিজেই দেখা করেন—কিন্তু খুব অসুখে পড়াতে আর হয়ে ওঠেনি—

বললাম—অসুখ সারলে দেখা করতে বোল—আমি সব সময়েই বাড়িতে থাকি—

ছেলেটি বললে—কিন্তু আমার মা তো মারা গেছে—

মারা গেছে! কেমন যেন চমকে উঠলাম:

ছেলেটি আবার বললে—মারা যাবার একমাস আগে আমাদের পাড়ার একজন লোককে ডেকে তাঁর হাতে মা লেখাটা দিয়ে গিয়েছিল। তিনি আপনাকে চেনেন খুব ভালোরকম বললেন, তাই তাঁর হাত দিয়েই আপনাকে পাঠিয়েছিল মা—

বললাম—তাঁর নামটা কী বলতে পারো?

ছেলেটি বললে—তিনি আমাদের বাড়ির পাশে ভাড়া থাকতেন —এখন বাড়ি বদল করে কোথায় চলে গেছেন জানি না—

বললাম—কিন্তু তাঁর নামটা তো বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে—তাঁর নামটা জেনে আমাকে জানিয়ে যেও—আর যদি খবর পাও তো ঠিকানাটাও জানতে পারলে ভালো হতো— তা হলে আমিই তাঁর কাছ থেকে সেটা চেয়ে নিতাম—

ছেলেটি চলে গেল। তারপর আর বহুদিন তার কোনও সন্ধান পাইনি। 'নিশিপালন' শেষ পর্যন্ত কোথায় গেল, কে আত্মসাৎ করলে তাও খবর পেলাম না। একটি নারীর সারাজীবনের মর্মকথা, তা সে যত তুচ্ছই হোক, তার একটা আলাদা মূল্য নিশ্চয়ই আছে। এত লোক থাকতে কেন তিনি অচেনা হয়েও আমার কাছে সব কথা অকপটে জানাতে চেয়েছিলেন কে জানে! কেমন তাঁর জীবন, কেমন ভাবে সে-জীবন তিনি কাটিয়েছেন, কিছু জানা গেল না। সে-জীবন কি পূর্ণিমা না অমাবস্যা—সারা জীবনভোর তিনি কি কেবল নিশিপালনই করে গিয়েছেন—তাই কি জীবনীর নাম দিয়েছেন তিনি 'নিশিপালন'?

যা'হোক, হঠাৎ একদিন ছেলেটির সঙ্গে রাস্তায় আবার দেখা হয়ে গেল।

বললাম—কই, তুমি তো আর দেখা করলে না আমার সঙ্গে?

ছেলেটি যেন বিব্রত হয়ে উঠলো।

বললে—তিনি লেখাটা দিলেন না—তিনি বললেন তিনি নিজে উপন্যাস লিখবেন—

বললাম—তা ভালোই তো—

ছেলেটি বললে—কিন্তু মা বলে গিয়েছিল কেউ মা'র কথা ভালো করে বুঝতে পারবে না এক আপনি ছাড়া—তাই আপনাকে দেবার কথাই মা বলে গিয়েছিল—মা'র বিশেষ ইচ্ছে ছিল আপনিই ওটা লেখেন—

বললাম—কেন লিখতে পারবে না, খুব পারবে! আমার চেয়েও ভালো পারবে অনেকে—দেখো—

ছেলেটি বললে—কিন্তু মা তো তা চায়নি! আমি অনেক করে বললাম, কিছুতেই আমার কথা রাখলেন না। আমার তো বাবা নেই, বাবা থাকলে এমন করে তিনি ঠকাতে পারতেন না আমাকে—

বললাম—তিনি ঠকাবেন তোমাকে তা ভাবছো কেন—তিনি দেখেছেন তোমার মাকে, হয়ত তিনিই ঠিক সুবিচার করতে পারবেন—

ছেলেটি চুপ করে রইল। তারপর বললে—তিনি সুবিচার করতে পারবেন না—

বললাম—কেন?

ছেলেটি আবার বললে—আমি জানি—তিনি সুবিচার করবেন না—

বললাম—কেন? কী করে জানলে তুমি?

ছেলেটি বললে—তিনি যে আপনার নিন্দে করলেন। বললেন, —তোমার মা সতী নারী ছিলেন, মহিয়সী নারী ছিলেন, তাঁকে লিখতে দিলে তিনি তোমার মাকে অসতী করে তুলবেন—

এর পর আমি আর কিছুই জানি না। 'নিশিপালন' নামে কোন বই বেরিয়েছে কিনা তাও জানি না—কিম্বা সেই ছেলেটির মার জীবন-কাহিনী অবলম্বন করে অন্য কোনও উপন্যাস লেখা হয়েছে কিনা তাও খবর রাখিনি। কারণ এত অসংখ্য বই প্রকাশিত হয় প্রতি মাসে যে সবগুলোর সন্ধান রাখা কোনও অবসরপ্রাপ্ত লোকের পক্ষেও সম্ভব নয়।

এমনি যখন অবস্থা তখন সত্যিই এক অদ্ভুত নারীচরিত্র নিয়ে একটা গল্প লিখলাম। গল্পটি প্রকাশিত হলো 'দেশ' পত্রিকার ১৩৬৫ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ-এর সংখ্যায়। চক্রধরপুরে যখন

থাকতাম, আমার পাশের ফ্ল্যাটে একটি য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবার থাকতো—গল্পটি তাদের জীবন-যাত্রার আভাস নিয়ে লেখা। গল্পটি লিখে আমি বিশ্রাম লাভের আশায় কার্সিয়াং ভ্রমণে যাই। 'দেশ' পত্রিকার শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ সেখানে আমায় একটি চিঠি লেখেন—

চিঠিটি এই :

প্রীতিভাজনেষু—

আমি ৮ই জুন দুপুরে কলকাতায় ফিরেছি, আপনার গল্প খুবই ভালো হয়েছে। জনপ্রিয় লেখক হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের মন ভোলানো গল্প যে আপনি লেখেন নি এইটিই প্রশংসনীয়। মেয়েরা চটবে এবং বলবে আপনি বড় বেশী নারী বিদ্বেষী। তার নমুনা স্বরূপ একটি পাঠিকার বেনামী চিঠি এই সঙ্গে আপনার কাছে পাঠালাম···ইত্যাদি।

ইতি—১৬. ৬. ৫৮

চিঠিরসঙ্গে নীল কাগজে একটি বেনামী চিঠিও ছিল। সত্যিই পত্র-লেখিকার নাম-ধাম কোথাও লেখা নেই। পত্রলেখিকা লিখেছেন—

প্রীতিভাজনেষু,

আপনি যেখানে প্রাত্যহিক জীবনের মানুষ সেখানে আপনাকে আমি চিনি না, কিন্তু আপনার লেখক-সত্তার সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের। আপনি যে নিষ্ঠার আবেগ কম্পিত প্রহরে আপনার সৃষ্টি ছাড়া আর সব কিছুই ভুলেছেন আমি ততোধিক একাগ্রতায় সেই সৃষ্টিলোকে নিমগ্ন হয়েছি। যা কেবল সুন্দর তাকে দেখানো আপনার কাজ নয়, সত্যকে অনাবৃত করাতেই আপনার আনন্দ। আপনার শক্তি দুর্লভ, লেখনী কৌশলী বাচনভঙ্গী মনোরম। আপনার সৃষ্ট চরিত্রে হয়তো কত নারীই ক্ষণে ক্ষণে নিজের স্বরূপ দেখেছে। নারী

স্বাধিকার প্রমত্তা, স্নেহ প্রীতি সবই তার লোভের কাছে হার মেনে যায় একথা সত্য, তবে জিজ্ঞাসা—এ সত্য নর-নারী উভয় ক্ষেত্রেই রয়েছে না ?

আপনার সৃষ্ট নারীদের দেখেছি আর ধৈর্য ধরে ভেবেছি—যে-নারীর প্রেমের কাছে নিষ্ঠার কাছে লালসা বার বার হার মেনে যায় আপনার সৃষ্টিতে তারাও একদিন ধরা দেবে। অচিরে আসবে সেই সব মেয়ের কথা যারা পবিত্র ভালবাসায় পরিতৃপ্ত, যাদের মাতৃস্নেহ খাদ মেশানো নয়—এমন মেয়ে কি আপনি একটিও দেখেন নি ? সম্পর্ক অমান্য করে কার রুচি কতটা বিকৃত হয়েছে, নারীদেহের কোন্ অংশ অনাবৃত হলে কেমন দেখায় এবং তা দেখে মনে যে-সব ইচ্ছা জাগে তার বর্ণনা করবার মত সস্তা কলম অনেক আছে। আপনি ও-সব না লিখলেও আপনার লেখা বাজারে অচল হবে না—আপনি তাদের কথা লিখুন যারা কম জানে, কম বোঝে, সন্ধ্যার দীপে আপনাদের মঙ্গল কামনা করে। যারা সতী যারা শান্ত! আর আমাদের মতন অজ্ঞাত অপরিচিতা, যারা আপনার লেখা ভালবাসে এবং সুপ্রচুরভাবে আধুনিক হবার সুযোগ না পেয়ে সেই লেখা পড়ে দুঃখ পায় তারা আপনার লেখায় রূপ নিক।

দুপুরবেলা লুকিয়ে লেখা চিঠিতে নাম আর ঠিকানা দেবার সাহস কই, তাই সে-চেষ্টা করছি না।

নমস্কার : ইতি—

দুটো ঘটনাই আমাকে ভাবিয়ে তুললো।

এতদিনের যত দেখা, এতদিনের যত লেখা, এত দিনের যত ভাবা সব আমাকে ভাবিয়ে তুললো। মানুষের কর্মকে কি তবে আমি খণ্ড করে দেখেছি! মানুষের শক্তির সীমাকে কি আমি খর্ব করে চিত্রিত করেছি। আমি যাদের কথা লিখেছি তারা তবে কোন্

মানুষ ! সে-মানুষদের সঙ্গে কি আমার চেনা-মানুষদের কিছু প্রভেদ আছে ! যে-মানুষ বিশ্ব-জগতে বিচিত্র হয়ে ছড়িয়ে আছে তাদের তো কোন জাত নেই, তাদের তো কোনও ভেদ নেই, তাদের তো ভূগোলের সীমায় বন্দী করা যায় না। তাদের তো ইতিহাসের পরিধিতে আবদ্ধ করা যায় না। তারা যে ঘরেরও নয়, বাইরেরও নয়। তারা যে দেশীও নয়, বিদেশেরও-নয়। তারা বলে—আমি বেঁচে আছি এই-ই আমার আসল পরিচয়, আমার আর কোনও পরিচয় নেই। তারা দুঃখ পায়, তারা কাঁদে, তারা দুঃখ পেয়েই আপনাকে প্রকাশ করে ! কারণ দুঃখই যে তাদের আনন্দ, কান্নাই যে তাদের প্রকাশ। আমি তো তাদের কথাই লিখি যারা কখনও বা শক্তির আনন্দে, আবার কখনও বা শক্তির বেদনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। আমি তো তাদেরই দেখতে পাই যারা বেদনার মধ্যে পরিত্রাণ খোঁজে, যারা ত্যাগের মধ্যে বিত্তবান হতে চেষ্টা করে ! তাই চোখের জলের মধ্যে শেষ হলেও আমার গল্প যে প্রাণের ঐশ্বর্যের মধ্যে আশ্রয় খোঁজে। আমার গল্পের যারা নায়িকা তারা শেষ অঙ্কে হয়ত জীবন দেয় কিন্তু বিশ্বাস যে দেয় না। তারা সব হারায় বটে কিন্তু প্রত্যয় যে হারায় না শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু নিজের লেখা সম্বন্ধে আর বেশি বলবো না।

আমি আবার ভাবতে লাগলাম। কাদের কথা লিখেছি আর কাদের কথা লিখিনি ! 'যারা সতী, যারা শান্ত, যারা কম বোঝে, কম জানে' তাদের কথা কি সত্যিই লিখিনি ? কিছু না-জেনেও যারা বেশি জানার ভান করে তাদের আমি অবশ্য চিনি না। তাদের কথা আমি অবশ্য জানলেও লিখবো না। তাদের জন্যে অবশ্য আমার কলম নয়। কিন্তু অনেক জেনেও যারা কিছু না-জানার দলে তাদের কথাতো অনেক লিখেছি !

তবু আবার ভাবলাম ! সেই জয়ন্তী, অবন্তী, সবিতা, বনলতার

কথা তো এখনও লেখা হয় নি। জয়ন্তী, অবন্তী, সবিতা, বনলতা —সবাই তো সতী। চারজনেই তো সংসার চেয়েছিল, স্বামী চেয়েছিল, সন্তান চেয়েছিল। সংসারে সব স্ত্রীরা যা চায় তাই-ই তো তারা চেয়েছিল। স্বামীও পেয়েছিল তো তারা—কিন্তু সুখ পেলে না কেন, তার জবাব কে দেবে! সম্পর্ক অমান্য করে জয়ন্তী তো নিজের রুচির বিকৃতি ঘটায়নি! সবিতা তো স্বামীর ভালবাসাতেই পরিতৃপ্ত হতে চেয়েছিল। বনলতা তো সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের আকাঙ্ক্ষাতেই মেয়ে ইস্কুলের ছাত্রী হয়েছিল।

কেমন করে আমি বোঝাবো বাইরে থেকে যা দেখি ভেতর থেকে তা দেখি না। কেমন করে বোঝাবো মানুষের মন নামক বস্তুটি আর সব মানে কিন্তু নিয়ম না-মানতে তার বড় সাধ। মনের ভেতরে তার সীমা নেই তাই বাইরে আসতে তার যে বড় আনন্দ। মনের বাইরে এসে সে বলে—পেয়েছি, কিন্তু মনের ভেতর থেকে সে যে বলে—পেলাম না। বাইরে সে পায়, কিন্তু ভেতরে সে যে হারায়। যাকে পায় তাকে সে চায় না, যাকে হারায় তাকে খুঁজেই সে যে হয়রান। নিজেকে দিতেই সে চায় কিন্তু না পেলে তার যে বড় কষ্ট! এমন যে মন—সেই মনের কারবারই তো আমি করেছি এতদিন।

এই দেওয়া নেওয়ার আরো তিনটে কাহিনী আজ বলবো। তিনজনেই নারী, তিনজনেই সতী, তিনজনেই গৃহিণী। তাদের কাহিনীর ওপর আমি আজ আর কলম চালাবো না। রং দিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে সভ্য-ভব্য করে তাদের আনবো না আপনাদের সামনে। আটপৌরে পোশাকেই তাদের দেখুন! তিনজনেই তারা তিনরকম। তবু কোথায় যেন তাদের জীবনে এক আশ্চর্য মিল! পড়ে আপনারাই বলুন—আমি তাদের নিয়ে কী করতে পারতাম! আপনারাই বলুন—তাদের জীবনের ওপর আমার কারিকুরি কতটা!

প্রথমে জয়ন্তীর কথা বলি। তারপর সবিতার কথা বলবো। তারপর সকলের শেষে বলবো বনলতার কথা।

জয়ন্তীর সব কাহিনীটুকু আমি পরের মুখেই শুনেছি অবশ্য, কিন্তু তাকে আমি চোখেও দেখেছি মাত্র দু'বার। জয়ন্তী তখন অনুপপুর হাসপাতালের লেডী ডাক্তার। আমি যেবার বিলাসপুর থেকে চিরিমিরি বেড়াতে যাই সেইবারই দেখা। তখন অনুপপুর থেকে চিরিমিরি পর্যন্ত রেল-লাইন তৈরি হচ্ছে। রেওয়া স্টেটের জঙ্গল। মধ্য প্রদেশের সে জঙ্গল সুবিখ্যাত। ভাল্লুক, হরিণ, সম্বর, ময়ুর শুধু নয়—বাঘও থাকে জঙ্গলের মধ্যে। বিলাসপুর থেকে অনুপপুর চার-পাঁচ ঘণ্টার পথ। আঁকা-বাঁকা রেল-লাইন খাদ পাহাড়, টানেল, নদীনালা পেরিয়ে অনুপপুরে গিয়ে পৌঁছেচে। চিরিমিরি যেতে গেলে অনুপপুরে নামতে হবে। বিলাসপুরের ট্রেনটা সোজা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে কাটনীর দিকে। পথটা বড় সুন্দর। আর হয়ত ওদিকে যাওয়া হবে না। যতদিন বিলাসপুরে থাকবো ততদিনের মধ্যে মনেন্দ্রগড় চিরিমিরি জায়গাগুলো না-দেখলে পরে আর দেখবার সুযোগ ঘটবে না। আর তাছাড়া রেল-লাইন তৈরি হবার পর জায়গাটার চেহারাই হয়ত বদলে যাবে। জঙ্গল কাটা হবে, ব্রিজ তৈরি হবে, পাহাড় ভাঙা হবে, স্টীম আর বয়লারের সঙ্গে সঙ্গে, সভ্যতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল জনপদ হয়ে উঠবে। তখন আর কোনও আকর্ষণ থাকবে না আমার, তার চেয়ে আগে যাওয়াই ভালো। সেই ভেবেই একদিন রওনা দিলাম। কোথায় যাবো কোথায় থাকবো কোথায় খাবো তখনও জানি না। শুধু শুনেছিলাম অনেক লোক চাকরি-সূত্রে গিয়ে হাজির হয়েছে ওখানে। অনুপপুরে কনস্ট্রাকসানের অফিস বসেছে। সাহেব-সুবো-ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার এসেছে। সমস্ত চড়াই-উতরাই জায়গাটা সমতল করে দিয়ে কোয়ার্টার তৈরি হয়েছে। শুনেছিলাম ভারতবর্ষের সব প্রদেশের লোক জড়ো হয়েছে ওখানে। তখন বৃটিশ রাজত্ব।

সাহেবদেরই প্রতিপত্তি বেশি। তবু ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার কন্‌ট্রাকটার এদেশী। কোথাও-না-কোথাও একটা আশ্রয় মিলবেই। বিশেষ করে রেওয়া-স্টেট্ সস্তাগণ্ডার দেশ তখন। চাল ডাল সস্তা। কুলি-মজুর অজস্র।

সেইখানেই জয়ন্তীর প্রথম সাক্ষাৎ পাই। সেই কন্‌স্ট্রাকশনের কাজে। সে ছিল লেডী-ডাক্তার। বাঙলাদেশ থেকে অতদূরে বাঙালী লেডী-ডাক্তার দেখতে পাওয়া সত্যিই বিস্ময়কর, মনেন্দ্র-গড়ের কয়লার গুঁড়ো মেশানো রাস্তায় তাকে হাঁটতে দেখে তাই সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সত্যিই সাহস আছে বলতে হবে। তার সেই য়্যাপ্রন-পরা হাতে স্টেথিস্‌কোপ্ ঝোলানো চেহারাটা যেন এখনও আমার চোখে ভাসছে। আমি সেখানে অনেক কিছু দেখবার আশা করেছিলাম—কিন্তু জয়ন্তী ছিল আমার আশাতীত।

লালবাবুকে আমি সেই জন্যই জিজ্ঞেস করেছিলাম—ওই লেডী ডাক্তার কি বাঙালী?

জয়ন্তীর কথা বলতে গেলে লালবাবুর কথাও বলতে হবে। কারণ লালবাবুকে না জানলে জয়ন্তীর কথাও আমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

আর অদ্ভুত এই লালবাবু। আর লালবাবুকেই কি আমি আগে চিনতাম! এত লোক থাকতে একজন বাঙালীই যে কনস্ট্রাকশনের ঠিকাদারি করবে তাই-ই বা কেমন করে কল্পনা করতে পারবো? লালবাবু নামটা অবশ্য আগেই শুনেছিলাম। কিন্তু লালবাবু নামটা শুনলে হিন্দুস্থানী বলে মনে করাই তো স্বাভাবিক! লালচাঁদ, লালকিষণ কি লালভাই এই রকম কল্পনা করেছিলাম। কিন্তু সেই লালবাবু যে আমাদের কলকাতা শহরের লোক, সেই লালবাবু যে কোষাকুষি গঙ্গাজল নিয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন তা ভাবিনি। অথচ কী ঘরোয়া মানুষ! দেখা

হবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো যেন কতকালের পরিচয় আমাদের—কত দিন থেকে একসঙ্গে একঘরে এক ছাদের তলায় যেন বাস করছি।

মনে আছে প্রথম যখন দেখা হয়েছিল—একটা বিশেষ প্রশ্ন আমাকে করেছিলেন।

বলেছিলেন—জন্ম মৃত্যু বিবাহ—তিনটেই নাকি ভগবানের হাতে। সেই দুর্জ্ঞেয় পুরুষকে চোখে দেখা দূরে থাক, কেউ তাঁর আসল চেহারাটিকে কল্পনা করতেও পেরেছে কিনা সন্দেহ। অথচ মানুষের চেষ্টার আর অবধি নেই তাঁকে জানবার, তাঁকে দেখবার। ভগবান নামক বস্তুকে নিয়ে পৃথিবীতে যত বই লেখা হয়েছে, তত বই অন্য কোনও বস্তুকে নিয়ে লেখা হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। তবু তাঁকে জানা যায়নি। ধরা যায়নি।

তারপর একটু থেমে লালবাবুই আমাকে আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন—আচ্ছা বলুন তো, জন্মটার ওপর মানুষের কতটা হাত, আর ভগবানেরই বা কতটা হাত ?

লালবাবুর মুখে এই প্রশ্ন শুনে সেদিন আমি অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম।

এর উত্তর আমি কী দেব বুঝতে পারিনি সেদিন। এ নিয়ে আমি কখনও মাথাই ঘামাই নি। ধর্ম নিয়ে ভগবান নিয়ে বই পড়েছি বটে, বড় বড় লোকের উপদেশও শুনেছি : কিন্তু বই পড়েছি নিছক আনন্দের টানে, গবেষণার লোভে নয়। গবেষণা করুক, ইস্কুলের আর কলেজের মাস্টাররা। তাতে তাদের চাকরিতে উন্নতি হবে, মাইনে বাড়বে। তাতে আমার কী ? আমি বই পড়ি নিছক আনন্দ পাবার আশায়। এ এক অদ্ভুত আনন্দ। শুধু ভগবান নিয়েই বা কেন, ভ্রমণ কাহিনীই কি কম পড়েছি নাকি ? আর জীবনী—সে যার জীবনই হোক, সে আমাকে বরাবর আকর্ষণ করে। রাস্তার ফুটপাথ থেকে রাম শ্যাম যদু মধুর জীবনীর বই পর্যন্ত

কিনেছি শুধু আনন্দের লোভে। এ অনেকটা মদের নেশার মত। একবার এ-নেশা হলে ছাড়া শক্ত। আর এইরকম একটা জীবনীর কথা আলোচনা করতে করতেই এ-গল্পটা পেয়েছিলাম। এ-আলোচনা না হলে আর লালবাবু মুখই খুলতেন না। নিজের কাহিনীটাও বলতেন না।

লালবাবু বলেছিলেন—সন্ধ্যে-আহ্নিক করবার অভ্যেস আছে নাকি আপনার?

আমি তাঁর প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

বললাম—হঠাৎ ও-কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

লালবাবু বললেন—না, অনেকে করেন কি না ও-সব, আমার বাড়িতে আমি নিজে সন্ধ্যে-আহ্নিক করি, তাই ব্যবস্থা রেখেছি সব-রকম, কোষাকুষি, গঙ্গাজল, আসন, এমন কি সন্ধ্যে দেবার জন্যে শাঁখ পর্যন্ত পাবেন—

বললাম—আজকাল কি ও-সব কেউ করে?

লালবাবু বললেন—নানা-রকম লোক তো আসেন, আমার এখানেই ওঠেন সবাই—দেখেছি সুটপরা সাহেবও আবার ধড়া-চুড়ো ছেড়ে জপ-তপ করেন—সুতরাং সব রকম ব্যবস্থাই রাখতে হয়েছে—হোটেল তো নেই এখানে—

—গঙ্গাজল কোথায় পান?

লালবাবু বললেন—কেন, কলকাতা থেকে হরদম লোক আসছে, আগে থেকে চিঠি লিখে দিলেই সিল-করা টিনে ভর্তি গঙ্গাজল এসে যায়। আর শুধু কি গঙ্গাজল? পটল তো এখানে পাওয়া যায় না—কলকাতা থেকে পটলও আনিয়ে নিই। এক-একবার খেজুর গুড়ের পাটালি, ভাজা মুগের ডাল, সব আনিয়ে নিই। সব আমার কাছে আছে। একবার বরফ দিয়ে ইলিশমাছও আনিয়েছিলাম মশাই—

অথচ লালবাবু নিজে বিশেষ ভোজন-রসিক লোক নন। কোন

দিকেই কোনও বিলাসিতা নেই তাঁর। সারা বাড়িতে চাকর-বাকর দরোয়ান সব আছে। নদীর ধারে মস্ত দোতলা বাড়ি। বাড়িটা কাঠের তৈরি। নদীর জল বাড়লে বাড়ির সিঁড়ির তলা পর্যন্ত এসে ঠেকে।

বললেন—মনে করুন এখানকার অনেক ঠাকুর-সাহেব আছে, তারা সব এদিকে কোট প্যাণ্ট পরে হাকিম সাহেবদের কাছে গিয়ে সেলাম বাজিয়ে আসে—কিন্তু টুপি খুললেই একহাত টিকি বেরিয়ে পড়বে—

বললাম—তারাও আসে নাকি আপনার কাছে !

বললেন—আমার মশাই ঢালাও অর্ডার দেওয়া আছে, নতুন লোক যে আসবে এখানে, সব আমার কাছে এসে উঠবে, যতদিন ইচ্ছে থাকবে, স্ফূর্তি করবে—তা সে আমি বাড়ি থাকি বা না-থাকি—বিশেষ করে যদি বাঙালী হয়—

বললাম—আপনাকে বাইরেও যেতে হয় নাকি ?

লালবাবু ঠিকেদার। বিলাসপুর, অনুপপুর, সাডোল, উমেরিয়া, কাটনী—সব জায়গায় লালবাবুর লোক আছে। ঠিকেদারি কারবার। অনেক লোক, অনেক কর্মচারী, অনেক কুলি-কাবারি নিয়ে তাঁর কারবার। অনেক জায়গায় তাঁকে যেতে হয়। রেলের সাহেবদের সঙ্গে ঘন-ঘন দেখা করতে হয়। বিলের পাওনা তাগাদার জন্যে অনুপপুরের আপিসের বড়বাবুকে গিয়ে খোসামোদ তোয়াজ সবই করতে হয়। অনুপপুর থেকে মনেন্দ্রগড়ে রেল-লাইন পাতা হচ্ছে। তারই কাজ-কারবার দেখা-শোনা করবার জন্যে ইঞ্জিনীয়ার আছে, ফোরম্যান আছে, ডাক্তার, কেরানি, চাপরাসী সবই আনতে হয়েছে। বিরাট আধা-শহর গড়ে উঠেছে অনুপপুরে।

আগে অনুপপুরেই লালবাবুর বাঙলো ছিল। শোন নদীর ধারে। সে-বাড়িটাও আছে এখন। কিন্তু সেখানে আর কারো থাকবার দরকার হয় না। এখন নতুন বাড়ি করে লালবাবু চলে এসেছেন মনেন্দ্রগড়ে।

তা অনুপপুর থেকে মনেন্দ্রগড় চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল দূর হবে। বন-জঙ্গল পাহাড় পর্বতে আগে বাস করতো ছত্রিশগড়িয়ারা। কিছু কিছু ঠাকুর-সাহেবরাও ছিল। রেওয়া স্টেটের একেবারে কেন্দ্র। বাঙালী সন্তান লালবাবু ঠিকেদারী নিয়ে সেইখানে এসে হাজির হয়েছেন।

প্রথমে তো আমি বিশ্বাসই করিনি।

রাত আটটায় বিলাসপুরের ট্রেন ধরে অনুপপুরে নেমেছিলাম শেষ রাত্রে, স্টেশনও যেমন, না-আছে একটা থাকবার জায়গা, না-আছে একটা কিছু। এক-কামরা একটা স্টেশন-ঘর। কেরোসিনের বাক্সবাতি জ্বালিয়ে এ-এস্-এম অর্থাৎ এ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন মাস্টার লাইন ক্লিয়ার দিচ্ছিলেন। রাত দু'টো কি তিনটে। ট্রেন থেকে নামলো যারা তারা বেশির ভাগই রেওয়ার লোক। পিল্-পিল্ করে সব কোথায় চলে গেল। অন্ধকারে তাদের দেখতেই পেলাম না। একলা প্লাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকে হতাশ হয়ে চাইতে লাগলাম। দূরে আকাশ অন্ধকার। সেই অন্ধকার আকাশের গায়ে সার-সার পাহাড়ের ধূসর রেখা। অল্প-অল্প হিম পড়ছে। ট্রেনটা বিকট শব্দ করে স্টেশন ছেড়ে কাটনির দিকে চলে গেল।

কুলিটা আমার মাল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

বললে—কাঁহা যাইয়েগা বাবু?

সত্যিই তো। কোথায় যাবো! এখানে থাকবার জায়গা তো ঠিক করে আসিনি। বেশি রাত নেই। কোনও বেঞ্চে বসে কাটিয়ে দিলেও চলে।

বললাম—ফার্স্ট ক্লাশ ওয়েটিং রুম।

কুলি বললে ফার্স্ট ক্লাশ ওয়েটিং রুমের দরজা তালা-বন্ধ। তালার চাবি আছে নাকি স্টেশন মাস্টার সাহেবের কাছে। তার কাছে গিয়ে চাবি চেয়ে আনতে হবে।

এ-এস্-এম তখন কাজে ব্যস্ত। টরে টক্কা করছেন।

আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

বললেন—মনেন্দ্রগড়ে যাবেন, ট্রেন তো সেই সকাল সাড়ে নটায়!

চাবিটা আমাকে দিলেন। ধন্যবাদ জানিয়ে চলে আসছিলাম।

হঠাৎ কী মনে পড়লো।

বললাম—মনেন্দ্রগড়ে থাকবার জায়গা কোথায় পাই বলতে পারেন?

এ-এস্-এম বললেন—লালবাবুর বাড়িতে থাকবেন, সবাই লালবাবুর বাড়িতেই থাকে—আপনি বাঙালী তো?

বললাম—হ্যাঁ—

—তবে আর আপনার ভাবনা কী! লালবাবুও বাঙালী—

—লালবাবুর বাড়িটা ঠিক কোন্ জায়গায়?

এ-এস্-এম বললেন—লালবাবু ওখানকার ঠিকেদার মশাই, লালবাবুর নাম বললে সবাই আপনাকে বাড়ি দেখিয়ে দেবে—সবাই ওখানেই ওঠে যে—তারপর আপনি হলেন স্বজাতি বাঙালী—

এমনি করেই লালবাবুর নামটা প্রথম শুনি। কোথাকার লোক আমি—শুধু বেড়াবার জন্যে মনেন্দ্রগড়ে যাচ্ছিলাম। শুনেছিলাম মনেন্দ্রগড়ের জঙ্গলের কথা।

তখনও নাকি বাঘের উৎপাতে ওখানকার মানুষ-জন সন্ত্রস্ত। মনেন্দ্রগড় পর্যন্ত রেল-লাইন হয়ে গিয়েছিল। তারপর মনেন্দ্রগড় থেকে চিরিমিরি। ওইটুকু তখনও বাকি। পাহাড় ভাঙা হচ্ছে ডিনামাইট দিয়ে। এ-রকম সুযোগ হয়ত আর পাওয়া যাবে না। তারপর যখন ইলেকট্রিক লাইট হয়ে যাবে, শহর হয়ে উঠবে জায়গাটা, তখন আর সেখানে দেখবার কিছু থাকবে না। তার আগে দেখে নেওয়াই ভালো। কোলিয়ারি অঞ্চলের ওপর আমার বরাবরের একটা মোহ ছিল। বিশেষ করে সি-পি তখনও দেখা

হয়নি। তখন বিলাসপুরে থাকি, সুতরাং এ-সুযোগ বিলাসপুর থেকে চলে গেলে আর না-ও আসতে পারে।

ট্রেন যখন মনেন্দ্রগড়ে পৌঁছলো তখন দুপুর। কিন্তু এখানকার মত মনেন্দ্রগড়ে তখন বসতিই হয়নি। সার সার কুলিদের খুপরি। অসংখ্য খুপরি। নদীর ওপরে ব্রিজ তৈরি হচ্ছে। পাহাড় ভেঙে সমতল রাস্তা তৈরি হচ্ছে। হঠাৎ যেন অরণ্যের শান্ত আবহাওয়ায় হট্টগোল জেগে উঠেছে। ক্রেন, ইঞ্জিন, বয়লার আর কুলি-কামিনদের ভিড় লেগে গিয়েছে। ভীষণ কর্মব্যস্ত জায়গা। ট্রেনের ইঞ্জিনটা ওয়াটার-স্ট্যাণ্ডে গিয়ে জল নিতে লাগলো। কাকে জিজ্ঞেস করবো, কোন্ দিকে যাবো, কোথায় লালবাবুর ঠিকানা কিছুই জানি না। ট্রেনে দু'একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারাও ওই এক কথাই বলেছিল।

সবাই বললে—লালবাবু তো মস্ত ঠিকাদার, যাকে জিজ্ঞেস করবেন সে-ই বলে দেবে—

ট্রেনে যারা ছিল তারা ভ্রমণকারী কেউ-ই নয়। কয়েকজন গ্রামের লোক। বেশীর ভাগই রেলের কর্মচারী, তারা যাচ্ছে ডিউটিতে। নতুন ট্রেন—নতুন লাইন। আগে এদিকে বাইরের জন-মানুষের বড় একটা পদার্পণ হতো না। এখন কনট্রাকটার এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে এসেছে তার লোকজন। তারপরেই ওভারসিয়ার, ডাক্তার, লেডী-ডাক্তার, নার্স, ইঞ্জিনীয়ার, ফোরম্যান, পি-ডব্লু-আই, গ্যাংম্যান,—সবাই। দু'পাশের সবুজ গাছ-পালা দেখতে দেখতে মন যেন কেমন উধাও হয়ে গেল। এমন রূপ আগে দেখিনি প্রকৃতির।

একজন বললেন—এখন তো এই দেখছেন, অথচ ভাবুন তো প্রথম যারা এসেছিল এখানে—

বললাম—তখন তো রেল-লাইনই হয়নি—

তিনি বললেন—তখন কত লোককে বাঘে নিয়ে গিয়েছে, তার

কি হিসেব আছে—এই এতখানি রাস্তা ক্যানেস্তারার টিন পিটিয়ে হেঁটে হেঁটে আসতে হতো—

বললাম—কেন ?

—বাঘ, মশাই বাঘ। বাঘের জন্যে দিনের বেলাই কুলিরা কাজ করতে পারতো না—তারপর একবার পনরো দিনের মধ্যে পঞ্চাশজন কুলিকে ধরে নিয়ে যেতেই রেলের সাহেবদের টনক নড়লো, তখন এলো পুলিশ, বন্দুক। রাইফেল নিয়ে পুলিশ এসে পাহারা দিত আর কুলিরা কাজ করতো—

তারপর আরো অনেক গল্প শুনলাম।

তখন কুলি পাওয়াই দুর্ঘট হয়ে উঠল। আর কোনও কুলি কাজ করতে চায় না। সবাই একজোট হয়ে কাজ বন্ধ করে দিলে। হায়দরাবাদ থেকে কুলি আমদানী করতেন লালবাবু। লোক গেল সব জায়গায়। দু'শো তিনশো টাকা আগাম মজুরি দিলেও কেউ আসতে চায় না। সব দেশের কুলি-মহলে রটে গেল যে মনেন্দ্রগড়ে গেলেই বাঘে খাবে। রাত্রে কুলিদের খুপরিতে থেকেও নিরাপদ নয়। সারারাত চারদিকে কয়লার আগুন জ্বেলে রেখে ঘুমোয় সব। তবু বাঘের উৎপাত যায় না। সে একদিন গেছে এখানে। এক বছর রেলের কাজ বন্ধ ছিল কুলির অভাবে। হৈ হৈ পড়ে গেল রেলআপিসে সাহেবদের মধ্যে !

কলকাতা থেকে বড়সাহেব এল দেখতে! চারদিকে তারের জাল দেওয়া মটর গাড়িতে চড়ে একদল সাহেব ঠিকাদারের সঙ্গে দেখা করলে। কী করা যায় মতলব বার করতে হবে। আসে পাশের জঙ্গল কাটতে হবে। কিংবা আগুন লাগিয়ে দিতে হবে জঙ্গলে।

শেষে তাই-হলো।

এই যে সব সবুজ গাছপালা দেখছেন এসব আগুন জ্বেলে

পুড়িয়ে দেওয়া হলো। আগুন জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। সে আগুন আর নেভে না।

বললাম—আর লালবাবু ?

তিনি বললেন—লালবাবু ছিল বলেই তো শেষ পর্যন্ত কাজ চালু হলো নইলে সাহেবরা সব মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল।—এ তো আর যে-সে লোক নয়, লালবাবু! লালবাবুকে দেখেছেন ?

বললাম—না, এখনও পরিচয় হয়নি, নামই শুনেছি কেবল—

তিনি বললেন—অন্য কোনও ঠিকেদার হলে সে-সময় কাজকর্ম ছেড়ে এই বুনো জঙ্গল ছেড়ে কবে পালিয়ে যেত তার ঠিক নেই—নেহাত লালবাবুর জন্যেই এই রেল-লাইন এত তাড়াতাড়ি হলো।

বললাম—খুব সাহসী লোক বুঝি ?

তিনি বললেন—লালবাবুর প্রাণের মায়াটাই কম—কিছুতেই পরোয়া নেই—

তারপর একটু থেমে বললেন—বাঙালী মানুষ হয়েও এই জঙ্গলের দেশে তো পড়ে আছেন। এখন না হয় কত লোকজন এসেছে, ভিড় বেড়েছে, রেল-লাইন হয়েছে, ইঞ্জিনের শব্দে সরগরম জায়গাটা! কিন্তু লালবাবু যখন এসেছিলেন তখন তো আর এ-রকম ছিল না, খাঁ খাঁ করতো সব। লালবাবুর মুখে শুনেছি মাছ পাওয়া যেত না এখানে। বাঙালী মানুষ মাছ না খেয়ে কী রকম করে কাটিয়েছে বলুন তো। তাঁবুর মধ্যে বাস আর জঙ্গলের মধ্যে কাজ। এই এত বড় বড় ক্রেট্ সাপ ছিল তখন। গাম্-বুট পায়ে দিয়ে ঘুরতে হতো। তাঁবুর চারদিকে আধ মাইল জায়গা জুড়ে গোল কোরে আগুন জ্বালিয়ে ঘুমোতেন। এমনি করে কেটেছে তাঁর ছ'মাস একলা-একলা। তখন ট্রাকও ছিল না, মটর আসবার রাস্তাও হয়নি। মোষের গাড়িতে কিম্বা পায়ে হেঁটে এইখানে এসেছেন। ঠিকেদারকেই তো সকলের আগে আসতে হবে—

যা হোক, খবর পেতেই লালবাবুর লোক স্টেশন থেকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেল।

লালবাবু তখন বাড়িতে ছিলেন না।

ছত্রিশগড়ি লোকটি বললে—আপনি ভিতরে চলুন—তাঁকে খবর দেব আমরা—

তখনও জানি না লালবাবুকে কেমন দেখতে। কেমন তাঁর চাল-চলন। কাঠের তৈরি বাড়ি। দোতলা। বোধ হয় জন্তু-জানোয়ারের ভয় থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যেই এই ব্যবস্থা। সামনে নদী—পাহাড়ি নদী। নদীর ওপর রেলের ব্রীজ তৈরি হচ্ছে। আধখানা তৈরি হয়ে গেছে। পুল পেরিয়ে হবে স্টেশন—মনেন্দ্রগড় স্টেশন। আসল ব্রীজেব পাশে কাজ-কর্ম চালাবার জন্যে একটা অস্থায়ী ব্রিজ হয়েছে। তার ওপর দিয়ে নদীর এপার-ওপাব করা যায়। লালবাবুর বাড়ির দোতলা থেকে সামনের সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। কোথাও বড় বড় গাছের ডালপালায় কিছু কিছু ঢাকা পড়ে গেছে।

ঘরের ভেতরে নানা রকম ফোটোগ্রাফ ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙানো। সাহেবরা এসেছে সার্ভে করতে—একপাশে একজন বাঙালী। ওইটিই বোধহয় লালবাবু। চেহারাটা দেখে মানুষটি সম্বন্ধে একটা ধারণা করবার চেষ্টা করলাম। বেশ স্বাস্থ্যবান চেহারা, ধুতি পাঞ্জাবি পরা। দেখে মনে হলো অমায়িক লোক—মিশুকে লোক। লোকের মুখে যা শুনেছিলাম তার সঙ্গে যেন চেহারার একটা মিলও আছে। তারপরের ছবিটা একটা শিকারের। একটা বাঘ পড়ে রয়েছে মাটিতে—তার ওপর বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন লালবাবু। বোধহয় শিকার করেছেন বাঘটাকে। আশে-পাশে আরো অনেক কুলি-কামীন বসে আছে পেছনে। তার পরের ছবিটা অস্থায়ী পুলটার। অস্থায়ী পুলটা তৈরি হবার পর প্রথম যেদিন লোক চলাচল শুরু হোল সেদিন লালবাবু দাঁড়িয়ে আছেন পুলের মাঝ-খানে। আর নিচে জলের স্রোত বয়ে চলেছে।

তারপরের ছবিটা একজন মহিলার। বোধহয় লালবাবুর কোনও আত্মীয়া হবে।

এমনি পর পর দেয়ালে অনেক ছবি টাঙানো।

খানিক পরেই নিশ্চয় কার গলা শোনা গেল—কোথায় রে—

বোধহয় খবর পেয়ে লালবাবুই এসেছেন।

তারপর একেবারে সোজা আমার ঘরে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। হাসতে হাসতে এসে হাজির। বোধহয় কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হাতে তখনও ছাতা।

একেবারে জুতো সুদ্ধ ঘরে ঢুকে পড়েছেন।

বললেন—আপনি এসে গেছেন, বেটারা খবর দিলে এখন—

তারপর কাকে চিৎকার করে বললেন—কই রে, চা দিস নি এখনও—

বললাম—না, এত বেলায় আর চা খাবো না—চা খেয়ে এসেছি ট্রেণে—

—চা খাবেন না, সেকি! চায়ের ওপরেই তো বেঁচে আছি আমি। তা হলে একটু শরবত দিক—মধু—

মধু চা নিয়ে ঘরে এল। আমার সামনের টেবিলের ওপর চায়ের কাপটা রাখলে।

ধমকে উঠলেন লালবাবু।

বললেন—তোকে এত বেলায় চা দিতে কে বলেছে—বললাম শরবত—

মধু কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললাম—না না চা-ও দরকার নেই, শরবত-ও দরকার নেই আমার—

লালবাবু বললেন—আমাদের কিন্তু খেতে একটু দেরি হবে এখানে মশাই, দেখছেন তো বন-জঙ্গলের মধ্যে পড়ে রয়েছি, সেই চিরিমিরিতে শনিবার হাট হয়, সেই হাটই আমাদের ভরসা এখানে,

মণ-মণ আলু-পেঁয়াজ কেনা থাকে আর ডিম—মাছ-ফাছ পাবেন না এখানে রোজ! তবে মাগুর মাছ জিয়ানো আছে, আপনার মাগুর মাছে আপত্তি নেই তো?

আমি কিছু বলবার আগেই লালবাবু বলে উঠলেন—এই এত মোটা মোটা মাগুর মাছ জানেন—

বলে হাতের আঙুল গোল করে দেখালেন।

অদ্ভুত মানুষ দেখলাম লালবাবু। কোথা থেকে আমি এসেছি, কেন আমি এসেছি, কী আমার কুলশীল, কোথায় থাকি—কিছুই জানবার দরকার নেই লালবাবুর। আমি ভদ্রলোক, লালবাবুও ভদ্রলোক। সুতরাং এর চেয়ে আমার বড় সার্টিফিকেট আর নেই লালবাবুর কাছে। আমি অতিথি, সুতরাং আমার কুলশীল জানবার প্রয়োজন কি! এই-ই তো যথেষ্ট।

প্রথম দর্শনেই লালবাবুর প্রিয় হয়ে উঠলাম। স্নান করে নিলাম। গরম জল, সাবান, তোয়ালে কোনও কিছুই বার করতে দিলেন না। কখন বেরিয়ে যান, কখন আসেন বাড়িতে কিছুই ঠিক নেই লালবাবুর। সামনেই কাজ হচ্ছে। তাঁর লোকজন আছে, কর্মচারী আছে, তবু সেই সকাল থেকে আমি ঘুম থেকে ওঠবার আগে বেরিয়ে যান, আবার বাড়িতে আসেন চা খেতে। একসঙ্গে বসে চা খাই।

বলেন—দেখছেন তো কেমন দেশে বাস করছি আমরা—

বললাম—এত দেশ থাকতে এখানে এসে জুটলেন কী করে?

লালবাবু বললেন—জুটলাম কি সাধ করে মশাই! এসেছিলাম চাকরির চেষ্টায়। চাকরি করতাম সাহেবদের কোলিয়ারীতে, ম্যাক্‌ফারসন্ সাহেবের খুব পেয়ারের লোক হয়ে গেলাম হঠাৎ—সাহেব বিলেত চলে যাবার সময় কনট্রাক্‌টারি কাজ দিয়ে গেল, আর তাইতেই ভাগ্য ফিরলো। তারপর রেললাইন খোলবার খবর পেয়ে টেণ্ডার দিলাম—

বললাম—চাকরি করতে এই দেশেই বা এলেন কী করে ?

—গ্রহ মশাই, গ্রহ! গ্রহ না থাকলে সোনার জায়গা কলকাতা ছেড়ে এই বাঘ-ভাল্লুকের দেশে আসবই বা কেন! আর এখন আর আপনি কী-ই বা দেখছেন! আমরা যখন এসেছিলাম, তখন এ-সব জায়গায় মানুষ আসতে ভয় পেতো—ওই যে ব্রিজটা তৈরি হচ্ছে দেখছেন—

বললাম—আধখানা তো হয়ে গেছে দেখছি—

—ওইখানেই বাঘটা মেরেছিলাম, বেটা তিনটে কুলিকে হজম করেছিল আমার—তিনদিন লেগেছিল ওটাকে মারতে—কোনও কুলি আর কাজ করতে চায় না এখানে—সে একেবারে কারবার বন্ধ হবার উপক্রম আর কি!

প্রথম দিনই খেয়ে দেয়ে বেরোলাম।

দুপুর বেলা বটে, কিন্তু তেমন গরম নেই। চারিদিকে বড় বড় গাছ। শাল শিশু আর গালা গাছের জঙ্গল। বড় বড় অনেক গাছ কাটা পড়ে আছে। রাস্তা হয়নি ভালো। মাটির রাস্তার ওপর ইঞ্জিনের কয়লার গুঁড়ো ফেলে দেওয়া হয়েছে। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে যার সঙ্গেই দেখা হয় ঠিকাদার বাবুকে তারা সেলাম করে। লালবাবুও মাথাটা হেলিয়ে অভিবাদন জানান।

কারোর সঙ্গে কথাও বলেন—এই ঝুমরি, তোর অসুখ ভালো হয়ে গেছে রে ?

কাউকে বলেন—কোথায় চললি রে দুপুর বেলা? কাজে লাগিসনি আজ ?

সবাই শ্রদ্ধা করে। সবাই সম্মান করে কথা বলে লালবাবুর সঙ্গে। সকলেরই হুজুর লালবাবু।

বলেন—ম্যাক্‌ফারসন্ সাহেবই আমাকে শিখিয়ে গিয়েছিল এই কনট্রাক্‌টারি কাজ, হাতে ধরে শেখানো। প্রথম প্রথম পাঁচ-

ছশো টাকার কাজ পেলেই খুশী হতাম—শেষে হাজারেও কুলোত না—এখন তো লাখ-লাখ টাকার ব্যাপার—

উঁচু নিচু রাস্তা। ব্রীজের তলায় পিলার উঠছে, ড্রেজার দিয়ে জল সরিয়ে পাথর গাঁথা হচ্ছে। বড় বড় পাথরের চাঁই পড়ে আছে। সেইগুলোই আবার চৌকো করে কেটে গাঁথা হবে।

লালবাবু আর আমি চলেছি। পাশে লালবাবুর চাকর ছাতা নিয়ে চলেছে। লালবাবু বললেন—আর ছু'বছর পরে এ-জায়গাটাকে আর চিনতে পারবেন না, ওই পুলের পাশে হবে লোকো সেড্, আর ওই ওপারে যেখানে জঙ্গল কাটা হচ্ছে, ওইখানে হবে মনেন্দ্র-গড় স্টেশন, এটা এখন কাঁচা স্টেশন, ওটা তৈরি হলেই এটা ভেঙে ফেলা হবে—

সবই মেয়ে কুলি। মেয়ে কুলিরা পুরুষ-কুলির চেয়ে খাটতে পারে বেশি। জোয়ান-জোয়ান চেহারা সব। লালবাবুকে দেখে সবাই সসম্ভ্রমে পাশ কাটিয়ে দাঁড়ায়। সার সার কুলি মজুর মাথায় ঝুড়ি নিয়ে পাথর বয়ে ফেলছে নদীতে। আর অনেক দূরে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ফাটানো হচ্ছে। পাথরের চাঁই জমেছে সেখানে। সরু রেল-লাইনের ওপর দিয়ে ট্রলি চালিয়ে সেই পাথর এনে এখানে জড়ো করা হচ্ছে।

অনেকক্ষণ কাজ দেখা হলো।

লালবাবু বললেন—চলুন এবার ফেরা যাক—

বললাম—আপনার কাজের ক্ষতি করলাম খুব—

লালবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

বললেন—ক্ষতির কথা শুনে হাসি পেল মশাই—লাভ-ক্ষতির বড় ভাবনা তো আমার—

বললাম—সে কি, এতবড় কারবার, এত লোক খাটছে আপনার তাঁবে, তাদের ভবিষ্যৎও তো আপনাকে ভাবতে হয়—

লালবাবু বললেন—ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবলে আর কাজ-কর্ম

চালানো যায় না মশাই, ভবিষ্যৎ ভাবা-টাবা ছেড়ে দিয়েছি আমি, আমার ভবিষ্যতের ভাবনা কে ভাবে তার ঠিক নেই, আমি ভাবতে যাবো ওদের ভবিষ্যতের কথা—তবেই হয়েছে !

আবার সেই কয়লার গুঁড়ো বিছোন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আসা। তখনও খাওয়া-দাওয়া হয়নি কারো। আমার জন্যে খাবার আয়োজন করতে বলে গিয়েছিলেন আমার সামনেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর লালবাবু বললেন—আপনি বরং এখন একটু বিশ্রাম করুন—আমি বেরোই—

বললাম—আমার বিশ্রামের দরকার ঠিক নেই—আমি তো দেখতেই এসেছি—

বললেন—তা হোক, একটু বিশ্রাম নিন—

লালবাবু চলেই যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বললাম—আচ্ছা লালবাবু, ওই মহিলাটি কে ? উনি কি বাঙালী ?

লালবাবু প্রথমে বুঝতে পারলেন না।

বললেন—কে ? কার কথা বলছেন ?

বললাম—ওই যে রাস্তায় দেখা হলো !

লালবাবুর যেন এতক্ষণে মনে পড়লো।

বললেন—ও, ও আমাদের লেডী-ডাক্তার, অনুপপুর থেকে এসেছেন—

বেশ ফরসা যৌবন-পুষ্ট চেহারা। ভালো গড়ন। সাদা শাড়ির ওপর কালো চওড়া পাড়। গায়ে একটা এ্যাপ্রন ! আমি আর লালবাবু রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, আর উনি পুলের দিকে যাচ্ছিলেন। কাছাকাছি আসতেই মহিলাটি কেমন যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠলেন।

ঠিক এমন ধারা ব্যবহার এতক্ষণ কারোর সঙ্গেই লক্ষ্য করিনি। যাকেই রাস্তায় আসতে দেখেছি, সেই-ই একবার লালবাবুকে সেলাম করেছে। কিংবা লালবাবুই হয়ত এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কথা

বলেছেন। ছোট জায়গা, সকলেই সকলকে চেনে। রাস্তায় দেখা হলে অন্তত মামুলি নমস্কার বিনিময়ও হয়। কিন্তু লেডী-ডাক্তারের সঙ্গে লালবাবুর ব্যবহারটা যেন কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল তখন। লেডী-ডাক্তারটি পাশ কাটিয়ে চলে গেল, আর লালবাবুও অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে কোনও কথা বলেন নি। লালবাবু এমনিতেই একটু বাক্যবাগীশ লোক। কথা না বলে বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না। সেই লোকের সেই নীরবতা তখনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু কিছু বলিনি। কিছু বলা হয়ত অন্যায় হবে ভেবেই বলিনি। ভেবেছিলাম বাইরের লোক আমি, একদিনের মাত্র পরিচয়, অত কৌতূহলের দরকার কী! কিন্তু মনের মধ্যে কথাটা তোলপাড় করছিল বরাবর। খেতে বসেও যখন লালবাবু প্রচুর গল্প করে যাচ্ছেন, তখনও কথাটা বলবো বলবো করছিলাম।

লালবাবু বলেছিলেন—মুরগীটাই প্রচুর পাওয়া যায়—হয় মাগুর মাছ নয় মুরগী, এই খেয়েই আছি আমরা এখানে—আর ডিম, টাকায় একশো ডিম—

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন—কী, ভাবছেন কী আপনি, রান্নাটা বুঝি পছন্দ হয়নি?

বললাম—না না, রান্না ঠিক হয়েছে—এত কি খেতে পারা যায়—

—এত আর কোথায় মশাই, এত পাবো কোথায় যে এত দেব—দেখছেন বন-জঙ্গলে পড়ে আছি, এ কি কলকাতা মশাই—খান্ খান্, ওই মুরগীর ঠ্যাংটা খেয়ে ফেলুন, ফেলবেন না—

লালবাবু খাচ্ছিলেন আর আপন মনেই বক্ বক্ করে চলেছিলেন। ভাবছিলাম এইবার কথাটা পাড়বো। লেডী-ডাক্তারের কথাটা পাড়বার এইটেই উপযুক্ত সময়।

কিন্তু আবার লালবাবু বাধা দিলেন কথা বলে।

—ওরে বেটা, এ কী করেছিস, তরকারিতে যে একেবারে নুন দিসনি! তোদের নিয়ে দেখছি আমার হয়েছে জ্বালা! দেখেছেন তো কাণ্ড এদের, আপনি এসেছেন, কোথায় ভালো-ভালো জিনিস রান্না করে খাওয়াবে তা নয়, তরকারিটায় একেবারে নুন দেয়নি বেটা—

বললাম—ভুল কি মানুষের হয় না!

লালবাবু বললেন—তা বলে রোজ ভুল হবে মশাই, ওদের ভুলের জন্যে আমি যে লজ্জায় পড়ে যাই—

বললাম—আপনার লজ্জা পাবার কী আছে, আপনার তো চাকরের ওপর ভরসা—

—তা বলে মাইনে তো কম নেয় না বেটারা! মাইনে ছাড়া আছে কাপড় জামা গামছা—তারপর চুরি—হাট-বাজার করতে গিয়ে ভাবছেন চুরি করে না বুঝি!

তারপর আমার থালার ওপর নজর পড়তেই বললেন—দইটা খেয়ে ফেলুন—বাড়িতে পাতা দই—শরীরের উপকার হবে—খান্ খান্—

খাওয়া-দাওয়ার পর লালবাবু ঘরে এসে বসলে ভেবেছিলাম কথাটা পাড়বো। কিন্তু ঘরে এসেই বললেন—আপনি বিশ্রাম করুন এখন খানিকটা, আমি একটু বেরোই—

তখনই কথাটা পাড়লাম।

বললাম—আপনি তো লেডী-ডাক্তারের সঙ্গে একবার কথাও বললেন না!

—কথা!

লালবাবু বললেন—কথা আবার কী বলবো মশাই! কথা বলবার কিছু ছিল না, তাই বলিনি! কাজে এসেছে—থাকে অনুপপুরে, এখানে অসুখ-বিসুখ হলে ওখানকার লেডী-ডাক্তারকে কল্ দেওয়া হয়—তা কারোর হয়ত অসুখ বিসুখ হয়েছে—তাহলে

আমি চলি, আপনি বিশ্রাম করুন—বেশি দেরি হবে না, শিগ্‌গিরই চলে আসবো আজ—

সত্যিই বেশি দেরি হয়নি লালবাবুর, ঘণ্টা তিন-চার পরেই আবার চলে এসেছিলেন তিনি।

আমি তখন বিছানাটায় একটু গড়িয়ে নিয়েছি। দেয়ালের ছবিগুলো চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। শৌখীন মানুষ খুব নন লালবাবু। তবে ছোটবেলাকার ছবি দেখে মনে হয় এককালে খুব সুন্দর ছিলেন দেখতে। নানা ধরনের ছবি রয়েছে। মনে হলো কলকাতার হোস্টেল-জীবনের ছবিও রয়েছে। হোস্টেলের ছেলেদের সঙ্গে গ্রুপ ফোটো। আরো কয়েকটি ছবি রয়েছে। পুরুষ মহিলা—তারা কে চেনা গেল না, বোঝা গেল না। হয়ত বাবা-মা বোনেরা।

হঠাৎ নিচেয় গলা শোনা গেল লালবাবুর।

—কোথায় রে—

ওই লালবাবু এসে গেছেন।

ঘরে ঢুকেই বললেন—ওঃ, কাজের আর কামাই নেই মশাই,—ঘেমে নেয়ে উঠেছি—বলে চেয়ারে বসে পা দু'টো বাড়িয়ে দিলেন। একটা চাকর এসে জুতো জোড়া খুলে নিলে পা থেকে।

বললেন—বেলা হয়ে গেল, আজকে আর কোথাও বেরোবেন নাকি ?

বললাম—আমার আপত্তি নেই, আমি তো বেড়াতেই এসেছি এখানে—

লালবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

—আপনি হাসালেন মশাই, কাশ্মীর, বম্বে, ম্যাড্রাস, দিল্লী পড়ে রইল, আপনি বেড়াতে এলেন এখানে !

তারপরে বিকেল বেলা চা খেতে খেতে বললেন—আপনার দেশ কোথায় ?

বললাম—কেন, ও-কথা জিজ্ঞেস করছেন . দেশ-ভেদে কি মানুষের কিছু তারতম্য হয় ?

বললেন—তা হয় বৈকি ! এই ধরুন না কেন আমার কথা। ছিলাম কলকাতায়, মানুষও হয়েছি কলকাতায়, কিন্তু এই দশ বছর এ-দেশে থেকে একেবার জংলী হয়ে উঠেছি—

—আপনার বাড়ি বুঝি কলকাতায় ?

লালবাবু বললেন—বাড়ি টাড়ি নয়, পড়াশোনা করেছি কলকাতায়, এই পর্যন্ত ! তারপর হঠাৎ খেয়াল হলো কলকাতার বাইরে চাকরি করবো !

—কেন, কলকাতায় চাকরি পেলেন না ?

—পাবো না কেন ? তখন কলকাতায় চাকরির ছড়াছড়ি। কিন্তু কলকাতা আর ভালো লাগলো না। মনে হলো এমন দেশে যাবো, যেখানে কেউ আমাকে চিনবে না। কলকাতার কোনও লোকের সঙ্গে দেখা হবে না। তাই দরখাস্ত করে এই সি-পি-র কোলিয়ারীতে চাকরি নিলাম। ভেবেছিলাম সেই চাকরিতেই সারা জীবনটা কাটিয়ে দেব—কিন্তু সেই যে কথায় বলে না—স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্ পুরুষস্য ভাগ্যং—আমারও হলো তাই—

—কেন ?

লালবাবু বললেন—আর কেন ! ম্যাক্‌ফারসন্ সাহেব ! ওই ম্যাক্‌ফারসন্ সাহেবই যত বিপদ ঘটালো। ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে এই ঠিকেদারি। সেই থেকে ঘানি টেনে চলেছি, কিন্তু কার জন্যে যে ঘানি টানি কে জানে—

সন্ধ্যেবেলা বললেন—আপনি সন্ধ্যে-আহ্নিক করেন নাকি ?

বললাম—হঠাৎ ও-কথা জিজ্ঞেস করছেন ?

লালবাবু বললেন—না এমনি, অনেকে করেন কি না—

বললাম—আমাকে দেখে কি আপনার সেই রকম মনে হয়— ?

লালবাবু বললেন—চেহারা দেখে কি লোক চেনা যায় ?

স্যুট-কোট-হ্যাটের মধ্যে থেকেও টিকি বেরিয়ে পড়তে দেখেছি তো! সুতরাং চেহারা দেখে লোক-চরিত্র বিচার করবার মত ভুল আর করি না—

তারপর একটু থেমে হঠাৎ বললেন—আচ্ছা একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন?

বললাম—বলুন আপনার প্রশ্নটা কী?

লালবাবু বললেন—দেখুন, কারো জন্মের ওপর ভগবানেরই বা হাত কতটা, আর মানুষেরই বা হাত কতটা থাকে, বলতে পারেন?

প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—হঠাৎ এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন যে?

লালবাবু বললেন—বলুন না আপনার কী মত?

বললাম—এ-কথা তো কখনও ভাবিনি আগে, আর তা ছাড়া ভগবান আছে কি নেই তাই-ই জানি না—

লালবাবু বললেন—ভগবান না থাকলে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চলছে কী করে বলুন—চালাচ্ছে কে?

বড় শক্ত প্রশ্ন!

লালবাবু বললেন—দেখলেন তো এক-কথায় কাবু করে দিলাম আপনাকে! আমিও মশাই আপনার মত ভগবান মানতাম না এককালে! এখন সব দেখে শুনে মানতে ইচ্ছে করে!

বললাম—আপনি বিশ্বাস করেন?

লালবাবু বললেন—করি! আপনি হাসুন আর যাই করুন, আমি সন্ধ্যে-আহ্নিক করি রোজ। সব আছে আমার, কোষাকুষি, গঙ্গাজল, প্রদীপ, ধূপ ধুনো—সব আছে—

রাত্রিবেলা শোবার আগে আমার ঘরে এলেন।

বললেন—দিন, আপনার একখানা বই দিন, অনেক বই এনেছেন দেখলাম—

বললাম—আপনি বই-টই পড়েন নাকি আবার?

লালবাবু বললেন—আগে পড়তাম, তা আজকে ঘুম আসছে না এখন, শুয়ে শুয়ে কিছু পড়বো—

বললাম—কী বই পড়বেন নিন—আপনিই বেছে নিন—যেটা আপনার খুশী—

লালবাবু নিজের মনেই একখানা বই বেছে নিয়ে বললেন—যাই, আপনি সারাদিন বিশ্রাম করেন নি, আপনাকে আর বিরক্ত করবো না—

বলে লালবাবু বইখানা নিয়ে চলে গেলেন।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি মনেন্দ্রগড়ের সে এক অন্য চেহারা। কোথাও কোনও লোকের চিহ্ন নেই। একটু সকাল সকালই ঘুম ভেঙেছিল আমার। বয়লার ক্রেন কিছুই তখনও চালু হয়নি। খাঁ খাঁ করছে পুলটা। আগের দিন ওখানে কুলি-কামিনে ভর্তি দেখেছি। লোক-জন ওভারসিয়ার ফোরম্যানের ভিড় ছিল। আজ কিছু নেই, একটু একটু করে বালাঘাট রেঞ্জের পাহাড়ের চুড়োয় ভোর হচ্ছে।

চাকরটা ঘরে এসে বললে—চা এনেছি—

জিজ্ঞেস করলাম—লালবাবু কি উঠেছেন নাকি—

চাকরটা বললে—না, এখনও ঘুমোচ্ছেন আজকে। অন্যদিন এতক্ষণ উঠে পড়েন—

বললাম—উঠলে বলে দিও আমি তৈরি—

খানিক পরেই লালবাবু হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন।

বললেন—চা দিয়েছে দেখছি, বেটাদের বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছু হয়েছে দেখছি, রাত্তিরেই বলে রেখেছিলুম আপনাকে ভোরবেলা চা দিতে—রাত্রে ঘুম হয়েছিল আপনার? নতুন জায়গায়—

বললাম—কোথা দিয়ে রাত কেটে গেছে বুঝতেই পারিনি—

লালবাবু বললেন—সারাদিন একটুও বসেন নি তো—তা আমার আজ উঠতে একটু দেরি হয়ে গেল—

বললাম—কেন ?

লালবাবু চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন—কাল রাত্তিরে আপনার বইটা পড়তে পড়তে রাত তিনটে বেজে গেল, তখন ঘুমোলুম কিনা—

বললাম—কী বই—?

লালবাবু বললেন—রামকৃষ্ণের কথামৃতখানা নিয়ে গিয়েছিলাম, আহা কী বই-ই লিখেছে মশাই, আহা, মনে হয় সব কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়ে বইটা পড়ি কেবল, কিন্তু ম্যাক্‌ফারসন্ সাহেব কী ঘানিতেই যে জুড়ে দিয়ে গিয়েছিল ! এর থেকে আর ছাড়ান-ছোড়েন নেই—

তারপর হঠাৎ থেমে বললেন—আপনি বইটা পড়েছেন নিশ্চয়ই—

বললাম—বার বার পড়েছি—

লালবাবু বললেন—কিন্তু আমার যে জিনিসটা জানবার দরকার ছিল, সেটার উত্তর পেলাম না মশাই—

বললাম—কী জিনিস ছিল জানবার ?

লালবাবু বললেন—ওই যে, জন্মের ওপরে মানুষেরই বা হাত কতখানি আর ভগবানের হাতই বা কতখানি ?

কথাটা মনে পড়লো। আগের দিনও লালবাবু এই প্রশ্নই করেছিলেন। এর কী উত্তর দেব বুঝতে পারলাম না। লালবাবু খানিক পরেই বললেন—বেরোবেন নাকি এখন—না বিশ্রাম নেবেন ?

বললাম—আপনার কাজের ক্ষতি হবে না তো ?

—ক্ষতি কে কার করতে পারে বলুন ! একমাত্র ভগবানই মানুষের ক্ষতি করলে করতে পারেন !

বললাম—তাহলে চলুন, আমি তো তৈরি !

লালবাবু বললেন—চলুন, আজ আমার গাড়িতে করে চিরি-মিরির দিকে যেতে হবে—দেখবার মত জায়গাটা, দেখলে আনন্দ পাবেন মশাই! আমাদের ওখানেও কাজ আছে কি না—

মনেন্দ্রগড় থেকে প্যারোডোল। প্যারোডোল থেকে চিরিমিরি। জঙ্গলময় রাস্তা। পাহাড় আর নদীর জন্যে সোজা রাস্তা নেই বললেই চলে। এঁকে বেঁকে উঁচু নিচু রাস্তা দিয়ে নদী ঝরনা পেরিয়ে লালবাবু গাড়ি চালিয়ে চললেন। মাথার ওপর সূর্যটা জ্বলছে। সারা রাস্তাতেই কাজ হচ্ছে। কুলিদের থাকবার খুপরি। রাস্তার পাশে হুঁশিয়ার করবার জন্য লাল কাপড়ের নিশেন উড়িয়ে দিয়েছে।

কোথাও এসে গাড়ি থামিয়ে দিচ্ছেন লালবাবু বলছেন—কীরে, সামনের রাস্তা ভালো আছে?

কুলিরা সমস্বরে বলে উঠছে—হ্যাঁ হুজুর—

—কাজ-কর্ম ঠিক-ঠাক চলছে তো?

—হ্যাঁ হুজুর—

এমনি করে মাইলের পর মাইল চলেছে গাড়ি। কোথাও টানেল কাটা হচ্ছে। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে ট্রেন যাবে। ডিনামাইটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে আকাশ।

কোথাও আবার সমতল। চারিদিকে ভুট্টা জোয়ারের ক্ষেত। জংলিরা ক্ষেত করেছে। গরু দু'চারটে। মুরগী উড়ে পালালো গাড়ির শব্দে। আবার কোথাও প্রান্তর। এক ঝাঁক ময়ূর চরে বেড়াচ্ছে।

তারপর চিরিমিরি।

চিরিমিরি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। চারিদিকে পাহাড় ঘেরা জায়গাটা। মাঝখানে শুধু একটু সমতল জায়গা। জায়গাটাকে পরিষ্কার করে ছাউনি পাতা হয়েছে।

লালবাবু বললেন—এখানেই চিরিমিরি স্টেশনটা তৈরি হবে—

বললাম—পাহাড়ে উঠবেন নাকি ?

লালবাবু বললেন—ওগুলো পাহাড় নয় মশাই, কয়লার খনি। আপনারা আসানসোলে মাটির তলায় কয়লার খনি দেখেছেন—এখানকার কোলিয়ারি মাটির ওপরে। কয়লা জমে জমে ওই রকম পাহাড় হয়ে গেছে—

গাড়িটা থামিয়ে লালবাবু বললেন—দাঁড়ান, আমি কাজটা সেরে আসি—

লালবাবু আপিসের ছাউনিতে চলে গেলেন। আমি গাড়ির ভেতরেই বসে রইলাম। চারিদিকে উঁচু পাহাড়। দুপুরবেলাও মনে হলে বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। নতুন স্টেশন হবে। তারই মাপ-জোপ হচ্ছে। এখানেও ওভারসিয়ার ইঞ্জিনীয়ার কুলি কারোরই বিরাম নেই। সবাই ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। রেলের সাহেব ইঞ্জিনীয়ার আগে থেকে এসে ছাউনি গেড়েছে। আশে পাশে আরো অনেক ছাউনি পড়েছে। কোনটায় আপিস। কোনটা থাকবার ঘর।

লালবাবু দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এলেন।

বললেন—আপনাকে অনেকক্ষণ একলা বসিয়ে রেখেছি—চলুন এবার, আপনার বোধ হয় ক্ষিদে পেয়ে গেছে—

বললাম—না, আমার ক্ষিদে পায়নি—সকালে যা খাইয়ে দিয়েছেন—

লালবাবু বললেন—আপনার ক্ষিদে না পাক, আমার পেয়েছে মশাই—আর ঘণ্টা দু'য়েক লাগবে ফিরতে—জোরে জোরে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবো—

যাবার সেই এক পথ। আবার নদী, টানেল, পাহাড় পার হওয়া। আবার সেই ময়ূয়ের পাল। মুরগী, জংলীদের গ্রাম। আবার এসে পড়লাম মনেন্দ্রগড়ে। সেই লোকের ভিড়। ঠিকাদারবাবুকে দেখে সবাই রাস্তা থেকে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়ায়।

পুলের কাছে আসতেই আবার দেখা গেল আগের দিনের

লেডী-ডাক্তারকে। কয়লায় গুঁড়ো ছড়ানো রাস্তা দিয়ে লেডী-ডাক্তার সোজা পুলের দিকে আসছিল। লালবাবু গাড়িটা রাস্তার একটু পাশে সরিয়ে নিলেন।

লেডী-ডাক্তার একপাশে সরে গিয়ে আমাদের দিকে একবার দেখেই চোখ নামিয়ে নিলে।

গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ যেন লালবাবুর মত লোকও কেমন নীরব হয়ে গেলেন। ঠিক আগেকার লালবাবুকে আর খুঁজে পেলাম না যেন।

সন্ধ্যেবেলা কথামৃতখানা ফেরত দিয়ে বললেন—নিন, আপনার বইখানা, আজকে আর পড়বো না মশাই, শেষে আজকে রাত্তিরেও যদি ঘুম না আসে—

বললাম—কেন ?

লালবাবু বললেন—না মশাই, ঘুম না হলে পরের দিন বড় কষ্ট হয়, শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে।

লালবাবু চেয়ারে হেলান দিলেন। চায়ের কাপ তখন নিঃশেষ হয়ে গেছে। মনেন্দ্রগড়ের বন-জঙ্গলের ঠাণ্ডা হাওয়া এসে গায়ে লাগছে। একটা বুনো নিশাচর পাখি মাথার উপর দিয়ে কর্কশ চীৎকার করতে করতে উড়ে গেল। চারিদিকে অন্ধকার। চারিদিকের গভীর অন্ধকারের মধ্যে অসমাপ্ত পুলটার ওপর একটা হাজার পাওয়ারের বাতি জ্বলছে। অসংখ্য পোকার ভিড় জমেছে আলোটার চারপাশে। কেমন যেন স্তিমিত হয়ে বসে ছিলেন লালবাবু। আমাদের দু'জনের মুখেই কথা বন্ধ হয়ে গেছে।

হঠাৎ আমি প্রশ্ন করলাম—ওই লেডী-ডাক্তারের সঙ্গে তো আপনি একটা কথাও বললেন না—

লালবাবু যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। কিন্তু এক মুহূর্তেই আবার বোধহয় নিজেকে সামলে নিয়েছেন। কিছু কথা বলতে গিয়েও যেন বললেন না।

বললাম—বোধহয় নতুন এসেছে এখানে, না ?

লালবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—না—

আবার জিজ্ঞেস করলাম—কতদিন হলো এখানে এসেছে ?

লালবাবু বললেন—আপনি হয়ত অবাক হয়ে গেছেন আবার ব্যবহার দেখে। অনেকেই অবাক হয়ে যায়। কথা ও-ও বলে না। আমিও বলি না। কথা বলবার কী-ই বা আছে। তবু তো আমরা কথা বলি। কোনও কথা বলবার না থাকলেও বলি। পাশের বাড়ির লোকের সঙ্গে বলি, রাস্তায় পরিচিত লোকের সঙ্গে বলি। সর্বত্রই বলি—কিন্তু···

বলতে গিয়ে থেমে গেলেন তিনি।

বললাম—ছ'বার দেখা হলো লেডী-ডাক্তারের সঙ্গে, ছ'বারই লক্ষ্য করলাম কিনা—তাই কেমন মনে হলো যেন—

লালবাবু মুখ নিচু করে রইলেন।

চাকর এসে চায়ের কাপ-ডিস নিয়ে চলে গেল। কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগলো আমার। কী কথা বলতে কী কথা বলে ফেললাম অজান্তে। হয়ত জিজ্ঞেস করা ঠিক হয়নি। হয়ত কৌতূহল প্রকাশ করা উচিত হয়নি। সঙ্কোচে দ্বিধায় আমিও চুপ করে রইলাম।

আর একটা পাখি মাথার ওপর দিয়ে ডাকতে ডাকতে এদিক থেকে অন্য দিকে উড়ে গেল। পুলের ওপর হাজার পাওয়ারের বাতিটা জ্বলছে। সমস্ত মনেন্দ্রগড়ে এই সন্ধ্যেবেলাই নিষুতি নেমে এসেছে। লালবাবুর বাড়ি অন্য সব বাড়ি থেকে দূরে। একটা উঁচু জায়গার ওপর। এখান থেকে সমস্ত শহরটা দেখা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে অন্ধকারের মধ্যে যে-কটা আলো টিকটিক করে জ্বলছিল তাও নিভে এল। কাল আবার ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই জেগে উঠবে, আবার বয়লার চলবে, ক্রেন চালু হবে—আবার কুলির দল সার বেঁধে পাথর বয়ে নিয়ে যাবে ঝুড়ি মাথায় করে।

লালবাবু হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলেন।

বললেন—অথচ দেখুন, আমি ওর জন্যে দায়ী নই মোটেই—

লালবাবুর মুখের কথা শুনে কিছুই বুঝতে পারলাম না। লালবাবু এ কী আবোল-তাবোল বকছেন!

লালবাবু বললেন—মানুষের জন্মের ওপর মানুষের নিজের হাত কতটা তা জানবার জন্যে কত চেষ্টা করেছি—সেই কথাই তো সেদিন আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু কোনও উত্তর পাইনি, কারো কাছ থেকেই পাইনি—কাল রাত্রে আপনার বইটা পড়তে পড়তে আবার সেই সব কথাই মনে হচ্ছিল—মনে হচ্ছিল—ভগবানকে এর জন্যে দায়ী করে তো লাভ নেই—

বলতে বলতে নিজেই আবার লালবাবু থেমে গেলেন।

বললাম—আপনি কি ভগবানে বিশ্বাস করেন?

লালবাবু বললেন—কথাটা আপনি এমন ভাবে বললেন যেন আপনি বিশ্বাস করেন না?

বললাম—বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের জীবনের কোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনা জড়িয়ে থাকে—তেমন কোনও ঘটনা আপনার জীবনে নিশ্চয়ই ঘটেছে, নইলে বিশ্বাস করতেন না আপনি।

লালবাবু যেন লাফিয়ে উঠলেন।

বললেন—ঠিক বলেছেন, ঠিকই বলেছেন আপনি—আমিও জানতাম না ও-সব! আজ আমাকে যা দেখছেন তা-ও আমি চিরকাল ছিলাম না। কেউ-ই চিরকাল অবশ্য সমান থাকে না। সবাই বদলায়। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে তাল রেখে আত্ম-রক্ষা করে চলতে গিয়ে সবাইকে বদলাতে হয়। কিন্তু এই যে আমি জঙ্গলে পড়ে আছি—এই-ই কি আমি কোনও দিন কল্পনা করেছিলুম! আর পাঁচজন বাঙালী যেমন চাকরি করে, ব্যবসা করে, তেমনি করেই তো থাকতে পারতাম! কিন্তু তা যে হলো না!

বলতে বলতে লালবাবু কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন।

বললাম—কালকে আপনার ঘুম হয়নি, আপনাকে খুব কষ্ট দিচ্ছি হয়ত—

লালবাবু হেসে বললেন—না না কষ্ট কি! বেশির ভাগ দিনই তো অন্য জাতের লোকের সঙ্গে দিন কাটে আমার। হয় সিন্ধী, নয় ভাটিয়া, নয় গুজরাটি! তাদের সঙ্গে কি মন খুলে কথা বলা যায়? অনেক দিন পরে বাঙালীর সঙ্গে কথা বলতে পারছি—কত যে ভালো লাগছে কী বলবো! কত কথা যে মনে পড়ছে! বিশেষ করে আপনার ওই কথামৃত! বইখানা পড়ে সব যেন গোলমাল হয়ে গেল একেবারে—

আমি কিছু কথা বললাম না। চুপ করে রইলাম।

লালবাবু বলতে লাগলেন—অথচ দেখুন ওই লেডী-ডাক্তার, ওর সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছি একদিন, এখানে যত লোক আছে, কারোর সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশবার সুযোগই হয়নি—আর ইচ্ছেও হয়নি—

অবাক হয়ে গেলাম!

বললাম—আপনি চিনতেন ওকে?

লালবাবু বললেন—শুধু চিনতাম না, ঘনিষ্ঠ ভাবেই চিনতাম। ওর বাবাকে চিনতাম, ওর মাকে চিনতাম, ওর দিদিকে চিনতাম—ওদের সকলকেই চিনতাম একদিন। দিনের পর দিন কেটেছে ওদেরই বাড়িতে—

একটু থেমে বললেন—আপনাকে আজ সেই গল্পটাই বলি—কী বলেন? আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না তো?

বললাম—সে কি! গল্প শুনতে আমার কোনও কালেই ক্লান্তি নেই—আপনি বলুন—

আরো অন্ধকার হয়ে এল চারিদিক। এবার মনেন্দ্রগড়ে নিবুতি হয়ে এসেছে কুলিদের ছাউনিগুলো। মনেন্দ্রগড়ের কাঁচা স্টেশনে

এতক্ষণ একটা ইঞ্জিন ফোঁস ফোঁস করে গর্জন করছিল, সেটা আবার বোধ হয় এতক্ষণ অনুপপুরের দিকে চলে গেল। যেটুকু শব্দ ছিল তা-ও থেমে গেল এক নিমেষে।

লালবাবু বললেন—জানি না আপনার ভালো লাগবে কিনা—কিন্তু আজ কুড়ি বছর হলো কলকাতা ছেড়েছি, কতদিন কত জায়গায় কত লোকের সঙ্গে মিশেছি, কত মেয়ের সঙ্গেও মিশেছি, বলতে গেলে জীবনকে যত রকম ভাবে দেখা যায়, তত রকম ভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু কলকাতায় সেই কটা বছরের জীবন আমাকে যেন কেমন করে ফেলেছে—আমি একলা পড়ে থাকি এখানে—কাজে ব্যস্ত থাকি সারাদিন, টাকা উপায় করি, কিন্তু আমার এইসব কাজ নিজের কাছেই তুচ্ছ মনে হয়, মনে হয় যা কিছু করছি সব যেন যান্ত্রিক গতিতে করছি—কোথাও কোন প্রাণের ছোঁয়া নেই—

জিজ্ঞেস করলাম—কুড়ি বছর বিদেশে আছেন?

লালবাবু বললেন—হ্যাঁ, কুড়ি বছরই হবে—কিংবা তার বেশিও হতে পারে—

বললাম—আর ওই লেডী-ডাক্তার?

লালবাবু বললেন—লেডী-ডাক্তার এসেছে এই পাঁচ বছর হলো!

উচ্চারণ করেই যেন লালবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। দেখলাম তিনি সোজা বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছেন। অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটলো। কিছু কথা বললাম না কেউ।

হঠাৎ লালবাবু বললেন—আমার স্বভাবটাই এমনি, জানেন—বড় মুষড়ে পড়ি একটুতেই। আপনি জানেন নিশ্চয়ই বউবাজারের গলিগুলো কত সরু। এক-একদিন রাত্রে সেই গলি দিয়ে আসতে আসতে মনটা খুব ভারি হয়ে উঠতো। সে-সব অনেক দিন আগের কথা। কুড়ি বছর কেটে গেছে। আমি এখন এখানকার ঠিকেদার।

টাকা-আনা-পয়সা আর গজ-ফুট-ইঞ্চি নিয়ে কারবার করি। রাস্তায় যেতে যেতে সেলাম পাই।—এ আমি সত্যিই যেন এক আলাদা মানুষ! কিন্তু স্বভাবটা আমার ঠিক তেমনিই আছে ভেতরে ভেতরে।

তাহলে আপনাকে গোড়া থেকেই বলি!

থাকতাম একটা মেসে। আর কলেজে পড়তাম। আর দশজন ছাত্রের মত কলেজের পর খেলা কি সিনেমা দেখার দিকে আমার মন ছিল না। সকাল বেলা ছাত্র পড়াতাম। তাতে আমার কলেজের মাইনে আর থাকা খাওয়ার খরচটা চলে যেত। আর দেশ থেকে কাকা টাকা পাঠাতো। সে টাকাও কাজে লাগতো।

জগদীশবাবু বলতেন—ও লালু, ঘড়িটা বন্ধ হয়ে রয়েছে, একটু দেখো তো বাবা—

আমি যেন ধন্য হয়ে যেতাম।

মাসীমা বলতেন—দেখ বাবা লালু, রাত হয়ে গেল, ইরা এখনও কলেজ থেকে ফিরছে না—

ঠিক সন্ধ্যেবেলাই গিয়ে হাজির হতাম মাসীমার বাড়িতে। লেখাপড়া? লেখাপড়াটা আমার রাত জেগে করতাম। কিন্তু সন্ধ্যেবেলাটা আমার মাসীমার বাড়িতে যাওয়া চাই-ই।

আমি হয়ত গিয়ে দরজায় কড়া নেড়েছি, মাসীমা দরজা খুলে দিতে দিতে বলেছে—এই বাবা তোমার কথাই ভাবছিলাম, ভাবলাম লালু তো এখনও এলো না—

মেসোমশাই বেশি কথা বলতেন না। চাকরি থেকে রিটায়ার করে পেনসন্ পেতেন। মাসের পয়লা তারিখে গিয়ে নিয়ে আসতে হতো পেনসন্টা। আর চুরোট খেতেন।

মাসীমা বলতেন—লালুর মতো ছেলে হয় না—

এক-একদিন বলতেন—কাল দুপুরবেলা একটু সকাল-সকাল আসতে পারবে বাবা, একটু মা-কালীকে দর্শন করে আসবো—

সেদিন আর আমার কলেজ যাওয়া হতো না। মাসীমাকে নিয়ে কালীঘাটে গিয়ে ফিরে আসতে আসতে একেবারে সন্ধ্যে হয়ে আসতো। বউবাজারের গলির ভেতর অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। মাসীমা চোখে ভাল দেখতে পেতেন না। হাত ধরে ধরে নিয়ে আসতাম বাড়িতে।

বাড়িতে পা দিয়ে মাসীমা বলতেন—এই লালু ছিল বলে তবু মা'কে একবার দর্শন করতে পারলাম। মেয়ে ছুটো যে একবার আমার একটু কাজ করবে, তা তো হবার নয়—

রান্নাঘরের পাশে আমি বসে বসে গল্প করতাম মাসীমার সঙ্গে। আর মাসীমা নিজে রান্না করতেন।

মাসীমা বলতেন—ওই তেলের বাটিটা একটু এগিয়ে দাও তো বাবা—

তারপর বলতেন—জানো লালু, যখন চোখ ছিল, তখন একলা সব করেছি, কাউকে কিছু করতে হয়নি আমার জন্যে—ওই তোমার মেসোমশাইকে দেখছো তো, উনি কেবল টাকাই এনে দিয়েছেন অফিস থেকে—নইলে কাপড় কাচা থেকে আরম্ভ করে ঘর ঝাঁট দেওয়া পর্যন্ত সব করেছি আমি নিজে—

দূর থেকে মেসোমশাই ডাকতেন—হ্যাঁগো, লালু এসেছে নাকি ?

মাসীমা বলতেন—ওই ডাক এসেছে, তোমার গলা পেয়েছেন—

তারপর চেঁচিয়ে বলতেন—তোমার আবার কী হলো, লালুকে ডাকছো কেন ?

মেসোমশাই বলতেন—না, সেই ঘড়িটা সারাতে দিয়েছিল লালু, সেটার কী হলো—

আমি বলতাম—শনিবার দিন দেবে বলেছে ওরা, আপনি কিছু ভাববেন না, আমি নিয়ে আসবো ঠিক—

মেসোমশাই বলতেন—ভুলো না কিন্তু—

মাসীমা বলতেন—দেখো, ওই রোজ একবার করে উনি তাগাদা দেবেন—ওই ওঁর স্বভাব—

বলতাম—তাতে কি হয়েছে, বুড়ো মানুষ !

মাসীমা রাঁধতে রাঁধতে হঠাৎ বলতেন—ওমা, এই দেখ, তেল ফুরিয়ে গেছে—এখন কী হবে ?

রাঁধতে রাঁধতে তেলই ফুরিয়ে যাক বা নুনই ফুরিয়ে যাক, আমি সব সময়েই তৈরি।

বলতাম—দিন না মাসীমা, আমি এখ্খুনি মোড়ের দোকান থেকে তেল এনে দিচ্ছি—

—দেখো তো বাবা, তোমার আবার কষ্ট !

বলতাম—কষ্ট কিসেব মাসীমা, এই তো এক মিনিটের পথ, যাবো আর আসবো—

সঙ্গে সঙ্গে তেলের টিনটা নিয়ে দোকান থেকে সরষের তেল কিনে আনতাম।

মাসীমা মহাখুশী।

বলতেন—দেখ বাবা, তুমি ছিলে তাই রান্না হলো, নইলে কেউ খেতেই পেত না আজ বাবা—

অথচ সম্পর্ক যে ওঁদের সঙ্গে আমার কী সেটাই ছিল এক গোলমেলে ব্যাপার: খুঁজলে কোনও সম্পর্কই পাওয়া যেত না। বহুদিন ধরে যেতে যেতে সম্পর্কের কথাটা আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। বলতে গেলে আমি প্রায় ও-বাড়িরই একজন হয়ে গিয়েছিলাম। ও বাড়ির ভাগ্যের সঙ্গেই আমার ভাগ্য একাত্ম হয়ে জড়িয়ে গিয়েছিল।

বহুদিন আগে ওই জগদীশবাবু রিক্শা থেকে পড়ে গিয়েছিলেন রাস্তায়। বুড়ো মানুষ। চিনতাম না তখন ওঁকে। কোথায় বাড়ি, কী নাম, কিছুই জানতাম না।

রাস্তায় ভিড় জমে গিয়েছিল।

আমি তখন কী একটা কাজে যাচ্ছিলাম সেখান দিয়ে। ব্যাপার দেখে আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম।

লোকজনরা তখন সবাই রিক্‌শাওয়ালাকে মারতে ব্যস্ত। বুড়ো-মানুষটাকে কেউ দেখছে না।

আমি ভদ্রলোককে তুললাম।

বললাম—চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি—

আর একখানা রিক্‌শা ডেকে, তাতে তুলে আমি পাশে বসলাম।

বললাম—আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে?

বৃদ্ধ বললেন—তুমি বাবা আমার বাড়িতে আমাকে পৌঁছে দিয়ে তবে যেও।

মনে আছে সেদিন মাসীমা আমার হাত দু'টো ধরে কত আশীর্বাদ করেছিলেন। দু'টি মাত্র মেয়ে আর দু'জন স্বামী-স্ত্রী!

বলেছিলেন—দেখছো তো বাবা, আমার ছেলে বলতে কেউ নেই, তুমি ছিলে তাই উনি রক্ষে পেলেন—

বললাম—তাতে কী, বেশী লাগেনি—আমি তো কাছেই থাকি, আমি কাল আবার এসে দেখে যাবো—

মাসীমা বললেন—আমার কথা তো উনি শুনবেন না—আমি যত বলি তোমার বেরোবার দরকার নেই, কলকাতার রাস্তা-ঘাট খারাপ, গাড়ি-ঘোড়ায় ভর্তি, তবু শুনবেন না—

বললাম—তা ওঁকে কেন বেরোতে দেন আপনারা, বুড়ো মানুষ—

মাসীমা বলেছিলেন—ওই কথাই তোমরা একটু বুঝিয়ে বলো তো বাবা, তুমি একটু বলো তো ওঁকে—আমি বলেছি, আমার মেয়েরা বলেছে—কিছুতেই শোনেন না!

মেয়েরা তখনও পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বড় বড় দু'টি মেয়ে। দু'এক বছরের ছোট বড়। দু'জনকেই প্রায় এক রকম দেখতে।

মাসীমা বললেন—আমি কি একলা বলেছি, এই মেয়েরাও বলেছে, উনি তবু কিছুতেই শুনবেন না—

মেয়ে দু'টি কিছু কথা বলছে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল। তাদের চোখে-মুখেও উদ্বেগ। মাসীমা বললেন—অথচ ঝি আছে ঠিকে, সেই-ই তো বাজার-হাট করে দেয়, ওঁর যাবার কোনও দরকার নেই।

মেসোমশাই এতক্ষণে কথা বললেন।

বললেন—তা সারাদিন বাড়ির মধ্যে বসে থাকা যায়?

মাসীমা বললেন—খুব বসে থাকা যায়। এই আমি কোথায় বেরোই, শুনি! আমি তো সারাদিন সংসার নিয়ে থাকি, কোথাও বেরোতে দেখেছ? আর বেরোবার সময়ই বা কোথায় বাবা। সংসারের ধকল সইতে-সইতেই সময় কেটে যায় আমার, তার আবার বেড়ানো! কোথা দিয়ে চন্দর-স্থর্য ওঠে তাই-ই বলে টের পাইনে—

তারপর মাসীমা আরো অনেক কথা বলে চললেন।

মেসোমশাইকে একটা ঘরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে বিছানার ওপর। তিনি চুপ করে পড়ে আছেন। দেখে দয়া হলো। বুঝতে পারলাম—এদের ছেলে নেই। দু'টি মাত্র মেয়ে। মেয়ে দু'টিও বড় হয়েছে। কিন্তু তখনকার দিনে ছেলে দিয়ে যে-কাজ হয়, মেয়েদের দিয়ে সে-কাজ তো হয় না। ঘরের ভেতরে ছোট একটা খাট। সেই ঘরেই মেসোমশাই একলা শোন। আর পাশের ঘরে একটা বিরাট বড় খাট। তার ওপর দু'তিন জনের বিছানা পাতা। সংসারের চেহারাটা স্বচ্ছল বলেই মনে হলো। মেয়েদের গায়েও গয়না রয়েছে দেখলাম। হঠাৎ মাসীমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললাম—আচ্ছা এখন আসি মাসীমা, কাল একবার দেখতে আসবো কেমন থাকেন উনি—

মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কোথায় থাকো বাবা?

বললাম—এই তো কাছেই, রাধানাথ মল্লিক লেনের মেসে—

মাসীমা বললেন—ওমা, তবে তো খুব কাছে, কাল এসো বাবা ঠিক—

সেই যে যাওয়া শুরু হলো ও-বাড়িতে, সে আর সহজে থামলো না।

মাসীমা বললেন—তুমি রোজ এসো বাবা, রোজ একবার করে এলে একটু ভরসা পাবেন মনে—

তারপর মেসোমশাই ভালো হয়ে গেলেন একদিন, কিন্তু আমার যাওয়া আর বন্ধ হলো না। ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে, তারই মধ্যে ভিজতে ভিজতে গিয়ে হাজির হয়েছি কতদিন !

মাসীমা বলতেন—ওমা, ভিজে যে একসা হয়ে গেছ একেবারে —ও ইরা, তোয়ালেটা দে তো মা লালুকে—মাথাটা ভালো করে মুছে নাও বাবা, আর গায়ের ভিজে জামাটা ছেড়ে ফেল—

তারপর থেকে একেবারে ঘরের লোক হয়ে গেলাম। ঘরের লোক যেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে তেমনি ঠিক। মেসোমশাই-এর চশমা তৈরি করতে হবে—ডাক্তারের কাছে কে নিয়ে যাবে? না লালু আছে। ইরার কলেজের পরীক্ষা কবে থেকে আরম্ভ জেনে আসতে হবে লালুকে। ইরার শাড়ি কিনতে হবে—সঙ্গে যাবে কে? না লালু যাক। মীরার অসুখ হয়েছে—ডাক্তার ডাকবে কে? না লালু আছে।

বলতে গেলে আমিই তখন সংসারের একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়ালাম। আমার যাওয়ার কোনও নিয়ম-কানুন আর রইল না। সময়-অসময় রইল না। ছুটির দিনও মাসীমার কাছে গিয়ে গল্প করি।

মাসীমা বলেন—রাজসাহীতে যখন ছিলাম বাবা, সেখানে চার পয়সা মুলোর সের, জানো একটা লোহার হাতা কিনেছিলাম এক পয়সায়—কলকাতায় সব জিনিসই আগুন—

মেসোমশাই-এর ছিল বদলির চাকরি। আজ ঢাকা, কাল মৈমনসিং, পরশু চব্বিশ-পরগণা। সারা জীবনই এমনি করে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে মাসীমাকে। বলতেন—ঢাকায় যখন ছিলাম, তখন নিজেদের বাসায় বাগান করেছিলাম মস্ত, একবার আমার বাগানে একটা লাউগাছে তিরাশিটা লাউ ধরেছিল—তা নিজেরা অত লাউ খাবো কী করে, পাড়াসুদ্ধ লোককে বিলিয়ে দিলাম—

সকাল বেলা মাসীমার বাড়িতে গেছি। রান্নাঘরে মাসীমা রান্না করছেন—আর আমি পাশে বসে এটা-ওটা এগিয়ে দিচ্ছি।

বললাম—আজ এত তাড়াতাড়ি করছেন কেন মাসীমা, আজ তো ওদের কলেজ ছুটি—

মাসীমা বললেন—কলেজ ছুটি হলে কী হবে, ইরার কোথায় আবার কী আছে, সকাল-সকাল ভাত চাই—

জিজ্ঞেস করলাম—কী আছে?

মাসীমা বললেন—কী জানি বাবা, কী আছে! দু'টো মেয়ে রয়েছে সংসারে, কিন্তু আমার তো কোনও সাশ্রয় নেই, ওদের লেখাপড়া করিয়ে আমি তো স্বর্গে যাবো—

মেসোমশাই ঘর থেকে বললেন—ওগো শুনছো?

মাসীমা বললেন—কী? তোমার আবার কী চাই?

মেসোমশাই বললেন—আমার ওষুধটা ফুরিয়ে গিয়েছে—

মাসীমা বললেন—দেখছো তো বাবা, কত দিকে নজর রাখতে হবে আমাকে—উনি না হয় বুড়ো মানুষ। মেয়েদেরও যদি একটু জ্ঞান বুদ্ধি থাকে—

সান্ত্বনা দিয়ে বলতাম—না মাসীমা, জ্ঞান হবে বৈ কি! বয়েস হলেই জ্ঞান হবে—সংসারের চাপ পড়লেই জ্ঞান হবে—জ্ঞান কি ছোটবেলা থেকেই হয় কারো?

ইরা শুনতে পেয়ে বলতো—তোমার আর উপদেশ ঝাড়তে হবে না লালুদা—

মাসীমা ধমক দিতেন :

বলতেন—হ্যাঁরে ইরা, লালুদা না তোর থেকে বড়, ওই রকম করে কথা বলতে হয় বড়দের সঙ্গে! কলেজে বুঝি এই সব শিক্ষা দেয় তোদের ?

ইরা হেসে গড়িয়ে পড়তো।

বলতো—না মা, কলেজে আমাদের কেবল ছোটদের উপদেশ ঝাড়তে শেখানো হয়—

—শুনলে বাবা মেয়ের কথা! কোথায় বড়দের দেখলে ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে, না ওই রকম কথা শিখছে কেবল! চা, লালুদা'র কাছে ক্ষমা চা তুই।

আমি বলতাম—থাক্ মাসীমা, ছোট বয়েসে ও রকম একটু চঞ্চল-স্বভাব হয়েই থাকে, বড় হলে সব শুধরে যাবে—

মাসীমা বলতেন—আর কবে শুধরোবে বাবা, আমি তো ওদের শিখিয়ে শিখিয়ে পারলাম না! উনি তো কিছু বলবেন না মেয়েদের—আমার কথায় কি মেয়েরা কান দেয়!

ইরা সেজেগুজে বেরোবার সময় বললে—মা, লালুদা'কে বলো না, আসবার সময় লালুদা আমায় নিয়ে আসবে—

—কেন রে? রাত হবে বুঝি?

ইরা বললে—বেশি রাত নয়, আটটা হবে—

আমি বললাম—ঠিক আছে মাসীমা, আমি নিয়ে আসবো'খন—

তারপরে ইরার দিকে চেয়ে বললাম—কোথায় থাকবে তুমি?

ঠিক হলো স্টার থিয়েটারের দরজার সামনে আমি দাঁড়িয়ে থাকবো আটটার সময়। এ-রকম অনেক দিন আনতে হয়েছে মেয়েদের।

রাত্রিবেলা একপাল মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। আমার মত অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। এ-রকম আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। মাসীমার রান্নার কাজে যেমন সাহায্য করতাম,

মেয়েদেরও নানান্ টুকি-টাকি কাজে সাহায্য করতে হতো। এতে আর কারো সঙ্কোচ ছিল না।

বাসে উঠে ইরা বলতো—তোমাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে দিয়েছি লালুদা—

বলতাম—তাতে কী হয়েছে—

ইরা বলতো—জানো, সবাই জিজ্ঞেস করছিল তুমি আমার কে হও—তোমাকে অনেক দিন ধরে দেখছে কিনা ওরা—

জিজ্ঞেস করতাম—তুমি কী বললে?

ইরা বলতো—আমি কিছু বলিনি—ওরা বুঝতে পেরেছে—

—কী বুঝতে পেরেছে?

ইরা বললে—তোমার সঙ্গে যে আমার কোনও আত্মীয়তা নেই—সেটা ওরা বুঝতে পেরেছে!

বললাম—তোমার সঙ্গে আমার আত্মীয়তা নেই বুঝি?

ইরা বললে—কিসের আত্মীয়তা আছে তোমার সঙ্গে শুনি?

বললাম—বা রে, এতদিন একসঙ্গে কাটাতে কাটাতেও তো একটা আত্মীয়তা হয়ে যায়!

ইরা বললে—ওমা, তোমার সঙ্গে আবার একসঙ্গে কবে কাটালাম! তুমি তো আমাদের বাড়িতে সেই যে আসতে শুরু করেছ, আর ছাড়লে না—

বললাম—তুমি কি চাও আমি তোমাদের বাড়ি আর না আসি?

ইরা বললে—আমি কি তাই বললাম নাকি! না বাপু, তোমার সঙ্গে আমি কথায় আর পারবো না—

বাড়িতে এসে মাসীমাকে বললাম—জানেন মাসীমা, ইরাকে ওর ক্লাসের মেয়েরা জিজ্ঞেস করেছে আমি ওর কে হই—ও কী বলেছে জানেন, ও বলেছে আমি ওর কেউ হই না—

মাসীমা বললেন—ওমা, সে কী কথা—হ্যাঁ রে ইরা, এই বুঝি

তোর বুদ্ধি হচ্ছে দিন দিন—আজকালকার মেয়েদের লেখাপড়া শিখে এই রকম বুদ্ধি হচ্ছে বুঝি সব !

বললাম—সত্যি মাসীমা, আজকাল মেয়েদের লেখাপড়া কিছুই হচ্ছে না, কেবল শাড়ি ব্লাউজ আর চালিয়াতি শিখছে দিন দিন—

মাসীমা বললেন—যাকগে, আমি আর ক'দিন, শেষে ওই-ই কষ্ট পাবে, তখন বুঝবে আমি ওর ভালোর জন্যেই বলতাম সব—

বললাম—বাপ মায়ের কথা না শুনলে কষ্ট তো পাবেই—

মাসীমা বলতেন—কষ্ট পেলে আমি আর কী করবো বাবা, আমাদের কর্তব্য আমরা করে গেলাম, এখন ওদের ভাগ্য ! ভাগ্য তো কেউ খণ্ডাতে পারে না কারো !

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছি অনেক রাত্রে।

মাসীমা বললেন—ওরে ইরা, সদর দরজাটা বন্ধ করে দে তো মা, লালু বেরিয়ে যাচ্ছে।

দরজার কাছটায় অন্ধকার।

বাড়ির বাইরে পা দিতেই ইরা ডাকলে—লালুদা—

ফিরে দাঁড়ালাম।

ইরা বললে—তুমি কী বলো তো ? তোমার কি কোনও জ্ঞানগম্যি নেই ?

বললাম—কেন ? কী করলাম ?

ইরা বললে—কেন তুমি মাকে ও-সব কথা বলতে গেলে ? মা কী ভাবলে বলো তো ?

বললাম—কই ? কী বলেছি আমি মাসীমাকে ?

ইরা বললে—আমি যদি আর কখনও তোমাকে কোনও কথা বলি তো কী বলেছি !

বললাম—মার বুঝি একলারই দোষ ? আর তোমাদের সব মেয়েদের কাছে যে আমাকে ছোট করেছ তুমি, তার বেলায় ?

ইরা বললে—তোমাকে ছোট করেছি আমি কে বললে ?

বললাম—আমি তোমার কেউ নই বলোনি তাদের ?

ইরা মুখ নিচু করলো।

বললে—সেই কথাটাই কেবল মনে রেখে দিয়েছ তুমি—আর আরো কত কথা বলেছি সেটা তো তুমি জানো না—

বললাম—আমার আড়ালে আমার নিন্দে করলে আমি কী করে জানতে পারবো, বলো ?

ইরা বললে—আমি তোমার নিন্দে করে বেড়াই এ-কথা কী করে ভাবতে পারলে তুমি, শুনি ?

বললাম—নিন্দে করেছ কী প্রশংসা করেছ তা তো শুনতে যাই নি আমি !

হঠাৎ কী যে হলো ! মনে হলো ইরার মুখটা যেন গম্ভীর হয়ে এল এক মুহূর্তে। বললে—তোমার নিন্দে করাই উচিত ছিল আমার, আমার ভুল হয়েছে—বলে হঠাৎ আর কোনও কথা না বলে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। আমি দরজার বাইরে সেই অন্ধকার গলিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর কোথা দিয়ে বৌবাজারের সেই অন্ধকার গলিটা পার হয়ে নিজের মেসে এসে খেয়েছি, বিছানায় শুয়েছি, কিছুই জ্ঞান ছিল না। সারারাত সেদিন আমার চোখে আর ঘুমই আসেনি।

পরের দিন আবার যথারীতি মাসীমাদের বাড়িতে গিয়েছি। যথারীতি মাসীমার রান্নাঘরে বসে গল্প করেছি।

একবার জিজ্ঞেস করলাম—ইরা কোথায় মাসীমা ?

মাসীমা বললেন—কোথায় আবার, পড়ছে। কী জানি মেয়ের কী হয়েছে, সারা দিন বই মুখে দিয়ে আছেন কেবল !

বললাম—ভালোই তো—

মাসীমা বললেন—ভালো খারাপ কে জানে বাবা, এতগুলো টাকা ওদের পেছনে খরচ হচ্ছে, কেবল ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে !

বললাম—না মাসীমা, দেখবেন ইরা খুব ভালো করে পাশ করবে!

মাসীমা বললেন—পাশ করে আমার মাথা কিনবেন!

মনে হলো ইরার সঙ্গে দেখা হলে যেন ভালো হোত। আগের দিনের রাত্রের কথাটা তখনও আমার মনের মধ্যে গুনগুন করছে! কিছুতেই আর মন থেকে দূর করতে পারছি না কথাগুলো। কিন্তু কেমন যেন লজ্জা করতে লাগলো। অনেকক্ষণ মাসীমার কাছে বসে রইলাম। অনেক গল্প করলাম। কিন্তু একবারও সেখানে এল না ইরা। ক্রমে রাত হলো।

একটু চীৎকার করেই বললাম—রাত হলো, আজ যাই মাসীমা—

—এসো বাবা!

তারপর যথারীতি মাসীমা চীৎকার করে বললেন—ওরে ইরা, সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যা, লালু চলে যাচ্ছে—

ভাবলাম আজকে দরজার কাছে এলেই কালকের কথাটা পাড়বো ইরার কাছে। দরজার বাইরে গিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েও রইলাম সেই জন্যে। কিন্তু দরজা বন্ধ করতে এল মীরা, ইরা নয়।

মীরা বললে—কী হলো, দাঁড়িয়ে আছো যে লালুদা?

বললাম—না, এমনি!

মীরা বললে—ভাবলে বুঝি দিদি আসবে দরজা বন্ধ করতে!

বলে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসলো একটু!

আমার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না।

বললাম—তুমি খুব ফাজিল হচ্ছ দেখছি, মাসীমাকে বলতে হবে—

মীরা আরও হাসলো।

বললে—বা রে, আমি কী করবো, আমি তো আসছিলাম না, দিদিই তো পাঠালে আমাকে দরজা বন্ধ করতে—

সেদিন কলেজ থেকে আসার পথে ইরাকে দেখলাম বাড়ি ফিরছে। আমিই কাছে এগিয়ে গেলাম।

বললাম—কদিন বাড়িতে গিয়ে তোমার দেখা পাচ্ছি না, কী হয়েছে তোমার শুনি ?

ইরা হেসে মুখ নিচু করলো।

বললে—তুমি বুঝি তাই আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ ?

বললাম—সত্যি কথা বললে তো তুমি বিশ্বাস করবে না !

ইরা বললে—আমি বুঝি তোমার কথা কেবল অবিশ্বাসই করি লালুদা ?

বললাম—তবে বলো, এ ক'দিন আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছো কেন ?

ইরা বললে—সত্যি কথা বললে কি তুমিই বিশ্বাস করবে লালুদা ?

বললাম—তোমার কথা বিশ্বাস করবো না, এমন ধারণা হলো তোমার কেমন করে ? এতদিন দেখেও বুঝি আমাকে চিনতে পারনি তুমি ?

ইরা বললে—বাইরের চেহারাটাই বুঝি সব ? আর তাছাড়া তুমিই কি চিনতে পেরেছ আমাকে !

বললাম—খুব চিনেছি, তোমাকে আর চিনতে শেখাতে হবে না !

ইরা বললে—ইচ্ছে করে যারা চোখে ঠুলি দিয়ে থাকে তাদের কী বলে জানো তো ?

বললাম—কী ?

ইরা হাসলো।

বললে—না, সে আমি বলবো না, শুনলে তুমি যদি রাগ করো !

বললাম—বলো না, রাগ না হয় করলামই, তাতে তোমার কী ক্ষতি ?

ইরা বললে—ক্ষতি নয় ? তা হলে বাবার অসুখে ডাক্তার

ডাকবে কে? মা'র সঙ্গে রান্নাঘরে বসে গল্প করবে কে? আমাকে রাত্তির বেলা কে পাহারা দিয়ে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেবে?

বললাম—খুব খোঁটা দিয়ে কথা বলতে শিখেছ তো? কলেজে বুঝি তোমাদের এই সব শেখাচ্ছে আজকাল? মাসীমাকে বলবো গিয়ে এই সব!

ইরা বললে—ওই একটা মুরোদই তো তোমার আছে!

কথার কোনও জবাব না দিয়ে চুপ করে চলতে লাগলাম পাশা-পাশি।

ইরা আমার দিকে চেয়ে বললে—কী চুপ করে রইলে যে?

বললাম—আর বেশি দিন তোমাদের জ্বালাবো না—

ইরা হাসলো।

বললে—ওমা সেকি! ওম্‌নি বুঝি অভিমান হলো! আমি ঠাট্টা করে বললাম, আর ওম্‌নি···

বললাম—না, না, অভিমান নয়। তুমি সত্যি কথাই বলেছ, অকারণে রোজ রোজ তোমাদের বাড়ি যাওয়াটা ভালো দেখায় না—তা ছাড়া, আমি তো আর বেশিদিন এখানে থাকছিও না—

ইরা অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কি? কোথায় যাচ্ছো তুমি?

বললাম—মাসীমাকে জিজ্ঞেস কোরো—মাসীমা জানেন—

ইরা বললে—তুমিই না-হয় বললে!—

আমি আর দাঁড়ালাম না। কথার উত্তর না দিয়েই চলে গেলাম।

ইরা বললে—চললে যে, আমাদের বাড়ি যাবে না?

যেতে যেতে বললাম—তুমি এখন একলাই যাও—নইলে আবার ভুল বুঝবে তুমি!

সন্ধ্যেবেলা কিন্তু যথারীতি গেলাম মাসীমার বাড়িতে। মাসীমা কিন্তু তখন রান্নাঘরে ছিলেন না। দেখি মেসোমশাই-এর ঘরে

মাসীমা বসে আছেন দু'জনে কী কথা হচ্ছে আমাকে দেখেই থেমে গেলেন।

মাসীমা বললেন—এসো লালু—

মেসোমশাই বললেন—তুমি চাকরি পেয়েছ শুনলাম—তাহলে তোমার পড়াশুনোর কী হবে?

বললাম—কিন্তু চাকরি পেয়ে ছাড়া কি উচিত হবে?

মাসীমা বললেন—তা তো ঠিক কথা বাবা, তুমি এ ক'দিন আসছো, তবু একটা ভরসা ছিল, কোথায় বিদেশে চলে যাবে, আর দেখাই হবে না হয়ত—

বললাম—আসবো বই কি মাঝে মাঝে মাসীমা—

মেসোমশাই হঠাৎ বললেন—তোমার কাকার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কেমন?

হঠাৎ এ-প্রশ্নে আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—বাবা আমার জন্যে টাকা রেখে গিয়েছিলেন, সেই টাকা থেকেই আমার পড়াশুনো চলেছে—আর কীসের সম্পর্ক, মাঝে মাঝে গরমের ছুটিতে দেশে যাই, এই পর্যন্ত—

মেসোমশাই বললেন—কিন্তু তোমার কোনও কাজে-কর্মে তাঁদের তো পরামর্শ নিতে হবে—

বললাম—কীসের পরামর্শ?

মেসোমশাই বললেন—এই ধরো যদি বিয়ে-থা করো তো তাঁদের অনুমতি তো দরকার—

আমি কথা বলতে যাচ্ছিলাম, মাসীমা বাধা দিয়ে বললেন—তা তো নিতেই হবে, মাথার ওপর যখন রয়েছেন তাঁরা, অবশ্য যেখানে চাকরি করবে, সেখানেই সংসার পাততে হবে, দেশে তো আর বউ নিয়ে যাবে না—

কেমন যেন রোমাঞ্চ হলো সমস্ত শরীরে। আমি কিছু কথা বলতে পারলাম না। মাথা নিচু করে রইলাম।

মাসীমা বললেন—নিজের মেয়ে বলে বলছি না, এতদিন তো দেখে আসছি বাবা, ও মেয়ে যার ঘরে যাবে তারই ঘর আলো করবে—

সেদিন তাড়াতাড়ি চলে এলাম। সমস্ত শরীর মন কেমন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে রইল সমস্তক্ষণ। মনে হলো জীবনের সব পাওয়া যেন আমার সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আর কিছু পাবার বাসনাও নেই। আমি এক মুহূর্তে সব কিছু পেয়ে গেছি।

পরের দিন মাসীমার বাড়ি যেতে গিয়ে সমস্ত মন যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। অথচ যেতেও যেন পা আটকে যাচ্ছে। এই ইচ্ছে আর অনিচ্ছের দোলায় আবার তারপর দিন গিয়ে হাজির হলাম মাসীমার বাড়ি।

গিয়ে কড়া নাড়লাম যথারীতি।

কিন্তু দরজা খুলতে যেন অন্য দিনের চেয়ে একটু দেরি হচ্ছে।

অনেকক্ষণ পরে মাসীমা এসে দরজা খুলে দিলেন। কিন্তু তার মুখের চেহারা দেখে কেমন যেন অবাক হয়ে গেলাম। একটা কথাও বললেন না। দরজাটা খুলে দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন সোজা।

আমিও তাঁর পেছন-পেছন রান্নাঘরের কাছে গেলাম।

যেন আমাকে দেখতে পাননি এমনি ভাবেই মাসীমা রান্না করতে লাগলেন আমার দিকে পেছন ফিরে।

বললাম—মাসীমা—!

মাসীমা পেছন ফিরেই বললেন—বলো—

বললাম—অসুখ করেছে নাকি আপনার ?

মাসীমা রান্না করতে করতেই বললেন—না—

কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। এতদিন এ-বাড়িতে আসছি, এ-রকম ব্যবহার তো কখনও পাইনি।

একবার মেসোমশাই-এর ঘরের দিকে চেয়ে দেখলাম। তিনি

যেমন বিছানায় হেলান দিয়ে থাকেন, তেমনি হেলান দিয়ে রয়েছেন। কিন্তু মনে হলো—আমার এই অনুপস্থিতির মধ্যেই যেন একটা বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেছে এ-বাড়িতে। কোথাও কোনও ব্যতিক্রম হয়েছে।

আমার ভয় হলো! তবে কি আমার জন্যেই এই বিপর্যয়! আমিই কি এই বিপর্যয়ের কারণ! তবে কি ইরার আপত্তি আছে এ-বিয়েতে! যদি আপত্তি থাকেই তো তাকে দোষ দেওয়া বৃথা। আর আমারই বা কী দোষ! আমি তো ওর জন্যে দায়ী হতে পারি না। মাসীমাই তো এ-বিয়ের প্রস্তাব করেছেন। তাতে মেসোমশাই-এরও সমর্থন আছে! কিন্তু ইরাই তো আসল। তার মতটাই তো আগে নেওয়া উচিত ছিল!

মনের মধ্যে অসংখ্য ভয় ফণা তুলে দংশন করতে এল আমাকে! কী করি আমি! কার কাছে গিয়ে দাঁড়াই! এতদিন ধরে এ-বাড়িতে আসছি, কখনও এ-বাড়িকে পর মনে হয়নি। নিজের বাড়ির মত এ-বাড়িতে এসেছি গিয়েছি। আজ এই পরিস্থিতিতে নিজেকে যেন হঠাৎ অনাহুত মনে হলো! ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জার কথা। হয়ত ইরা ভেবেছে আমিই নিজে থেকে এ-প্রস্তাবটা করেছি।

মনে পড়লো কতদিন ইরাকে রাত্রে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়ে নিজের দুর্বলতায় নিজেই লজ্জিত হয়েছি। কেন আমার এই লোভ! কেন আমার এই অবাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষা! নিজের মনকে শাসন করেছি কতবার। নিজের চোখকে তিরস্কার করেছি কতবার!

ইরা বলতো—এ কি, তোমার হাত কাঁপছে কেন লালুদা?

বলতাম—শীত পড়েছে, দেখতে পাচ্ছো না?

—শীতে বুঝি কেউ ঘামে, তুমি যে ঘেমে নেয়ে গেছ দেখছি একেবারে!

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে আত্মসচেতন হয়ে নিতাম।

ইরা বলতো—আমার সঙ্গে থাকলে তুমি যেন কেমন হয়ে যাও লালুদা, আমি বুঝতে পারি !

বলতাম—কী বুঝতে পারো ?

ইরা হাসতো !

জিজ্ঞেস করতাম—কী বুঝতে পারো তুমি বলো না !

ইরা বলতো—আমি দেখেছি কি না, আমার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে পারলে তোমার ভালো লাগে !

বলতাম—ভালো লাগা বুঝি দোষের ?

ইরা আরো হাসতো।

বলতো—আমি কি বলেছি দোষের ! কিন্তু মুখ ফুটে বলতে বুঝি তোমার বাধে ?

বলতাম—তোমার মুখের দিকে চাইলেই যে আমার ভয় করে !

ইরা বলতো—আমি বাঘ না ভাল্লুক !

বলতাম—তুমি যদি সবই বোঝ তা হলে তুমিই বা বলো না কেন ?

ইরা হাসতো। হাসতে হাসতে আমার কাছ থেকে একটু দূরে সরে যেতো।

আমি কাছে গিয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করলে ইরা বলতো—কাছে এসো না লালুদা—

বলতাম—কেন ?

বলতো—দেখছো না বাড়ি এসে গেছে—

বলে এক মুহূর্তে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তো।

কাছে গিয়ে দরজা বন্ধ করবার আগেই বলতাম—কই, আমাকে তো কালকে আসতে বললে না—

ইরা বলতো—ও বাবা, একেই না-বলতে রোজ আসছো, তার ওপর আসতে বললে আর কিছু বাকী রাখবে নাকি তুমি— ?

বলেই সদর দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিত ইরা। আর

আমি অভিভূতের মতন নির্বোধের মতন সেই অন্ধকারে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম। তারপর আবার গিয়ে ঢুকতাম নিজের মেসের ময়লা ঘরটাতে।

এমনি করেই এতদিন কাটছিল। হঠাৎ মাসীমার কথায় কেমন আশান্বিত হয়ে উঠেছিলাম। সারা রাত মেসের বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে পারিনি। এতদিন যে-মেসটাতে আরামেই কেটেছে সেই মেসটাকেই যেন বড় নোংরা মনে হয়েছিল হঠাৎ। নিজেকে আর ইরাকে একসঙ্গে কল্পনা করে সেই রাত্রেই যে কত স্বপ্নের জাল বুনলাম তা কেবল আমিই জানি। আর কারো তা জানবার কথা নয়।

কিন্তু মাসীমার মুখের ভাব দেখে সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। তবে কি আপত্তিটা এসেছে ইরার কাছ থেকে?

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। মাসীমাও বসতে বলছেন না অন্য দিনকার মতন। অন্যদিন ভাঁড়ার ঘর থেকে নুন তেল মসলা ফুরিয়ে গেলে এনে দিতাম।

মাসীমা বলতেন—বাবা, এই বাটিটাতে তেল এনে দাও তো—

কিংবা—বাবা, দু'টো হাত এঁটো, ঘটি করে একটু জল ঢেলে দাও তো আমার হাতে—

আজ কিন্তু নিজেই সব করছেন আমার দিকে পেছন ফিরে!

শেষকালে সাহস করে বললাম—ইরা কোথায় মাসীমা?

মাসীমার যেন কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

খানিক পরে বললেন—জানি না কোথায় গেছে—

অবাক হয়ে গেলাম। এমন উত্তর তো কখনও শুনিনি মাসীমার মুখে।

বললাম—আর মীরা?

মাসীমা বললেন—ওই দেখ, ঘরে কোথাও আছে—

এতক্ষণ যেন একটা আশ্রয় পেলাম। ঘরের ভেতর গিয়ে দেখলাম মীরা বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে আছে।

বললাম—মীরা—

মীরা মুখ তুললো না।

ডাকলাম—কী হলো তোমার মীরা! তোমাদের সব কী হলো আজ?

তবু মীরা তেমনি মুখ গুঁজে পড়ে রইল।

বললাম—ইরা কোথায় গেল? তাকে যে দেখছি না?

মীরা এবার মুখ তুললো। দেখি চোখ দু'টো তার অস্বাভাবিক রকম তীক্ষ্ণ হয়ে রয়েছে।

বললাম—ইরা কোথায়? তোমাদের কী হয়েছে বাড়িতে?

মীরা চীৎকার করে উঠলো—দিদি কোথায় তা আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন?

—কেন? জিজ্ঞেস করতে দোষ কী? তুমিও তো এ-বাড়ির মেয়ে!

—না, আমি কেউ নই, আমি এ-বাড়ির কেউ নই! আমাকে সবাই বকতে পারে আর আমি কিছু বললেই দোষ হয়ে যায়।

হঠাৎ তার এই কথায় চম্‌কে উঠলাম। এমন করে তো মীরা কথা বলে না। এমন ভাবে তো হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে না। কী হলো হঠাৎ এই ক'ঘণ্টার মধ্যে এ-বাড়িতে।

বললাম—কী হলো কী, তোমার?

মীরা বললে—কেন, আমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছ কেন, মা'কে জিজ্ঞেস করতে পারো না?

বললাম—মাসীমাই যদি বলবেন তাহলে আর তোমার কাছে এসেছি কেন? কী হলো তাই বলো না!

মীরা বললে—আমি কিছু জানি না—

—কেন, তুমি বাড়িতে রয়েছ অথচ জানো না কেন?

মীরা বললে—কেবল আমিই কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি বাড়িতে—আর কেউ নেই?

বললাম—আর কাকে জিজ্ঞেস করবো বলো!

মীরা বললে—জীবনে অনেক পাপ করলে তবে এ-বাড়িতে মেয়ে হয়ে জন্মায় লোকে—

বলে হাউ হাউ করে আবার মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলো মীরা।

বললাম—বা রে, আমি কী এমন বলেছি যে কাঁদতে বসলে এমন করে?

মীরা কাঁদতে কাঁদতেই বলতে লাগলো—তুমি চলে যাও এখান থেকে লালুদা—তোমার দুটি পায়ে পড়ছি—তুমি চলে যাও—

গোলমাল শুনে মাসীমা এসে হাজির।

আমার দিকে না চেয়েই বলতে লাগলেন—আমার যেমন কপাল, দু'টি মেয়ে, তাও একসঙ্গে চুলোচুলি না করে একদণ্ড থাকতে পারে না—নিজে দোষ করে আবার কান্না হচ্ছে। লজ্জাও করে না—

মীরা হঠাৎ মুখ তুললে।

চীৎকার করে বলতে লাগলো—তুমি আমার নামে মিছামিছি দোষ দিতে পারবে না মা—আমি তোমার কী করেছি যে এমনি করে আমায় বকছো?

মাসীমাও গলা চড়িয়ে দিলেন।

বললেন—কেন, কেন তুই ইরাকে অমন করে বললি বল্ তো! ও তোর দিদি হয় না?

মীরা বললে—আমাকে কেন ও অমন করে বলতে আসে। আমি যার সঙ্গে খুশী মিশবো, তাতে ওর কী! ও কেন আমায় বলতে আসে? ও কে? ও এ-বাড়ির কে শুনি? ও কে এ-বাড়ির?

মাসীমার মুখটা দেখলাম হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে এল।

মাসীমা কোনও কথা না বলে হঠাৎ রান্নাঘরে চলে গেলেন।

আমিও পেছন-পেছন মাসীমার সঙ্গে রান্নাঘরে চলে এলাম।

বললাম—কী হয়েছে আপনাদের বলুন না মাসীমা, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না—

মাসীমা বললেন—আমার আর কিছু ভালো লাগে না বাবা—মনে হয় যেদিকে দু'চোখ যায় বেরিয়ে পড়ি—সংসার কার জন্যে করা। ওই বুড়োমানুষের জন্যেই ভাবনা হয় !···

বলতে বলতে তাঁর চোখ দু'টো ছলছল করে এল।

বললাম—কেন, মীরা অমন করছেই বা কেন ?

মাসীমা বললেন—ইরার সঙ্গে ঝগড়া করেছে—

বললাম—ইরা কোথায় ?

মাসীমা বললেন—ইরা সেই যে বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে আর আসেনি—

বললাম—সে কি ? কোথায় গেছে ?

মাসীমা বললেন—কী জানি, দুই বোনে ঝগড়া হবার পর সেই যে ইরা রাগ করে বেরিয়ে গেছে, খেলে না দেলে না, কোথায় গিয়ে রয়েছে তাও জানি না, বাড়ি ফিরে আসবে কি না তাও জানি না—

আমি আরো অবাক হয়ে গেলাম। দুই বোনে ঝগড়া করেছে তাতে আর এমন কী সর্বনাশ হয়েছে। এমন তো ভাই-বোনে সব বাড়িতেই হয়। ঝগড়াও হয়, আবার ভাবও হয়। তা বলে বাড়ি থেকে চলে যাওয়া !

বললাম—কেন ঝগড়া হলো ?

মাসীমা বললেন—ওই মীরা বুঝি যার-তার সঙ্গে মেশে, কাল বুঝি ইরা মীরার সঙ্গে কয়েকটা বখাটে ছেলেকে মিশতে দেখে আজ একটু ধমক দিয়েছিল। তা বড় বোন তো ও-রকম বকেই থাকে !

বললাম—নিজের মায়ের পেটের বড় বোন যদি বকেই থাকে তো কী হয়েছে তাতে ? আর সে তো মীরার ভালোর জন্যেই বলেছে—

মাসীমা বললেন—বলো তো বাবা, কী এমন অন্যায় করেছে সে ?

সকালবেলার ঘটনাটা মাসীমার মুখে সমস্ত শুনলাম।

ইরা বলেছিল—কাল কাদের সঙ্গে মিশেছিলি রে তুই মীরা? বাসে যেতে যেতে দেখলাম—

মীরা বলেছিল—কাদের সঙ্গে আবার মিশবো, আমার বন্ধু ওরা—

ইরা বলেছিল—মানে? তোদের সঙ্গে পড়ে?

মীরা বলেছিল—না পড়লে বুঝি বন্ধু হতে নেই?

ইরা বলেছিল—বন্ধু হতে নেই কেন, কিন্তু চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল বখাটে ছেলে সব—

মীরা বললে—খবরদার বলছি, অমন করে আমার বন্ধুদের সম্বন্ধে বোলো না!

ইরা বললে—বলবো না মানে! একশোবার বলবো, হাজার বার বলবো, আমাদের বংশের নাম ডোবাবে তুমি, আর কিছু বলতে পারবো না আমরা!

মীরা বললে—তা হলে আমিও বলতে পারি, লালুদা'র সঙ্গে কোথায় যাও?

ইরা বললে—মুখ সামলে কথা বলবি মীরা, কাকে কী বলতে হয় এখনও শেখনি—

তারপর তুমুল ঝগড়া।

ইরা বললে—সেদিন কারা তোমায় সিনেমায় নিয়ে গিয়েছিল, এখন বুঝতে পারছি—অথচ তখন বললে ক্লাশের মেয়েদের সঙ্গে গেছ—

মীরা বললে—যার সঙ্গেই সিনেমায় যাই, তোমার কী? তুমি আমায় বলবার কে!

মাসীমা বললেন—সে দু'জনে কী ঝগড়া বাবা, আমি মীরাকে খুব বকেছি, তাই মেয়ের কী কান্না, সকাল থেকে ভাত খায়নি—

বললাম—আর ইরা?

মাসীমা বললেন—সেই যে রেগে মেগে বেরিয়ে গেল, এখন পর্যন্ত এল না—কী ভাবনায় যে পড়েছি—

রাত তখন আটটা। তখনও এল না ইরা।

মাসীমা বললেন—ওই বুড়োমানুষ এখনও কিছু শোনেন নি। শুনলে ওঁর অসুখ আবার বেড়ে যাবে—

বললাম—কোথায়ই বা সে যাবে? রাত্তির বেলা কি আর বাইরে থাকবে একলা! নিশ্চয়ই আসবে, দেখবেন!

ক্রমে রাত অনেক হলো। কারো যাওয়া হলো না।

মাসীমা মীরাকে বললেন—ওরে, খেয়ে নিবি আয়, রাত হয়েছে—

মীরা উঠলো না, খেলেও না!

মেসোমশাই একলাই খেয়ে নিলেন। বললেন—আমার ওষুধটা আনতে বোলো লালুকে, যেন ভুলো না—

মাসীমা বললেন—উনি নিজের ওষুধের কথাই ভাবছেন—দেখছো তো বাবা, কার ওপর ভরসা করে সংসার করছি—

আমিও মীরাকে গিয়ে অনুরোধ করলাম।

বললাম—মীরা, ওঠো, খেয়ে নাও—

মীরা তেমনি বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে রইল।

মাসীমা বললেন—তুমি আর কতক্ষণ বসে থাকবে বাবা, তুমি বাড়ি যাও—রাত হলো ঢের—

বললাম—কিন্তু ইরা তো কই এল না এখনও—

মাসীমা কিছু কথা বললেন না।

বললাম—আপনি বরং খেয়ে নিন্ মাসীমা—

মাসীমা কাঁদতে লাগলেন। বললেন—সে খেলে না, আমার মুখে কিছু রুচবে না বাবা, তুমি আর রাত বাড়িও না, তুমি যাও—

বললাম—কিন্তু ইরা যদি রাত্তিরে না আসে?

মাসীমা বললেন—সে আর আমি কী করবো বাবা, মা হয়েছি,

কষ্ট সহ্য করতেই হবে আমাকে, কিন্তু তুমি কেন কষ্ট করতে যাবে বাবা—

মেসে ফিরে গিয়ে সারা রাত যে কেমন করে কাটলো আমার, তা আমিই জানি।

ভোর না হতেই আমি আবার মাসীমার বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছি।

দেখি জানলা দিয়ে বাইরের রাস্তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মাসীমা।

বললাম—ইরা আসেনি মাসীমা?

মাসীমা মাথা নাড়লেন—না—

বললাম—থানায় একবার খবর দেব?

মাসীমা কিছু কথা বললেন না।

বললাম—কিন্তু কোথায়ই বা যেতে পারে? আর কোনও দিন এরকম বাইরে রাত কাটিয়েছে আগে?

মাসীমা বললেন—না বাবা—

—কোনও বন্ধু-বান্ধবের বাড়িও তো যেতে পারে! হয়ত ক্লাশের কোনও বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে রয়েছে, আমি খবর নেব?

মাসীমা কিছুই কথা বললেন না।

বললাম—আর কখনও এমন ভাবে কারো বাড়ি গিয়েছে শুনেছেন?

মাসীমা বললেন—আমাকে কখনও না-বলে কোথাও যায়নি সে। আর তার কখনও কোথাও বেড়ানোও স্বভাব নয়। কেবল কলেজে গেছে আর বাড়িতে এসেছে, দেখেছ তো, একটু রাত হলে একলা কখনও আসতো না, তুমিই তো কতদিন সঙ্গে করে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে গিয়েছ—

তাহলে! চিন্তায় পড়লাম। যে-মেয়ে কখনও কোথাও থাকে না, সে এমন করে সারারাত কোথায় কাটাবে! কী ভাবে কাটাবে!

বললাম—তাহলে পুলিশে একবার খবর দিয়ে আসি. কী বলেন ?

মাসীমা বললেন—না, তার দরকার হবে না—

বললাম—কেন, ও-কথা বলছেন কেন ?

মাসীমা একটু থেমে বললেন—না, আমি জানি সে আর আসবে না—

বললাম—সে কি ! রাগ করে চলে গেছে, রাগ পড়ে গেলেই আবার আসবে—

মাসীমা কিছু কথা বললেন না। মীরা তার নিজের ঘরে ছিল।

জিজ্ঞেস করলাম—মীরা কাল রাত্রে কিছু খায়নি শেষ পর্যন্ত ?

মাসীমা মাথা নাড়লেন।

বুঝলাম মাসীমাও উপোস করে আছেন কাল থেকে।

বললাম—কিন্তু এমন করে না-খেয়েই বা আপনারা ক'দিন থাকবেন। না-খেলেই কি সে ফিরে আসবে ! আপনারা কিছু খান ! আর মেসোমশাই ? তিনি শুনেছেন ?

মাসীমা বললেম—ও-মানুষ শুনলে মিছিমিছি কষ্ট পাবেন—মীরাকে বকবেন শুধু-শুধু ! তাই কিছুই বলিনি ওঁকে !

কী যে করবো আমি বুঝতে পারলাম না। সংসারটার সমস্ত দায়িত্ব এমন ভাবে আমার ওপর পড়েছিল যে মনে হলো আমিও যেন ওদের একজন। আমারও তো একটা কর্তব্য আছে। এত বড় কলকাতা শহরের কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই ইরা আছে। তাকে খুঁজে এনে মা'র কাছে তুলে দেওয়াও তো আমার উচিত। নিজের কথা আর বলবো না। এ-বাড়িতে এলে ইরাকে দেখতে পাবো না এটা কল্পনা করতেও যেন ভয় পেলাম। সে কেমন করে সহ্য করবো। বিদেশে চাকরির কথা ভেবেছিলাম, চাকরির দরখাস্তও করেছিলাম। কিন্তু সত্যিই কি বিদেশে গিয়ে একলা থাকতে

পারতাম! মনে হতো রোজ একবার ও-বাড়ির ওই পরিবেশের মধ্যে যেতে না পারলে যেন বেঁচে থাকাই বৃথা। কবে একদিন ঘটনাচক্রে ও-বাড়িতে গিয়ে পড়েছিলাম, তারপর থেকে প্রতিদিনের চেনাশোনায় ওদের সবাই আমার পরমাত্মীয় হয়ে উঠেছিল নিঃশব্দে। এতদিন বুঝিনি, সেদিন প্রথম বুঝতে পারলাম আমার আকর্ষণের মূল কোথায় গিয়ে ঠেকেছে।

সেদিন কোথা দিয়ে কেটে গেল সকালটা। সমস্ত নিয়ম-কানুন যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে সংসারের।

মেসোমশাই আমাকে দেখতে পেয়ে একবার বললেন—আমার ওষুধটা নিয়ে আসতে ভুলো না লালুবাবু!

মাসীমা চুপ করে শুনলেন। তিনি রান্না করছিলেন। কেউ খাক্ আর না-খাক্ রান্না তাঁকে করতেই হবে। দৈনন্দিন সংসারের কাজ-কর্ম কারো জন্যে প্রতীক্ষা করবে না তা সে যত বিপর্যয়ই ঘটুক আর যত বড় বিপদই ঘনাক।

তখন দুপুর ভালো করে হয়ও নি। বেলা বোধহয় বারোটা।

হঠাৎ দরজার কড়াটা নড়ে উঠলো।

আমিই গিয়ে দরজা খুলে দিলাম!

দরজা খুলতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছি।

ইরা! ইরার এ কী চেহারা হয়েছে।

বললাম—কাল কোথায় ছিলে তুমি, আমরা সবই ভাবছি—

ইরা আমার কথার কোনও উত্তর দিলে না। তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল।

মাসীমা বোধহয় ইরার আসার খবর টের পেয়েছিলেন।

ইরা পেছনে গিয়ে বললে—আমি এসেছি—

মাসীমা আর নিজেকে সামলে নিতে পারলেন না। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললেন—এসেছিস মা তুই, আমি সারারাত ঘুমোতে পারিনি তোর জন্যে—

বলতে বলতে ইরাকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন।

কিন্তু ইরা সরে দাঁড়াল। মুখটা তার গম্ভীর।

বললে—আমি থাকতে আসিনি তোমাদের এখানে—আমি বলতে এসেছি এখানে আর আমি থাকবো না—

মাসীমা মেয়ের দিকে চেয়ে যেন হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর চোখ তুটো ছলছল করে উঠলো। কিছুই যেন তাঁর বলবার নেই।

তারপর আস্তে আস্তে সোজা মেসোমশাই-এর ঘরের দিকে গেল ইরা।

আমি একবার ডাকতে গেলাম—ইরা—

ইরা আমার দিকে চাইলে।

বললাম—এমন কী হয়েছে যার জন্যে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে তুমি? বোনের সঙ্গে ঝগড়া হয় না কারো?

ইরা বললে—তুমি চুপ করো লালুদা,—

বলে মেসোমশাই-এর ঘরে গিয়ে দাঁড়ালো।

মেসোমশাই শুয়ে ছিলেন। উঠে বসলেন।

বললেন—কে? ইরা? আজকে কলেজ নেই?

ইরা বললে—আমি চলে যাচ্ছি—

—কোথায়? কলেজে?

মেসোমশাই ঠিক বুঝতে পারলেন না যেন।

বললেন—যাও না, কলেজে যাবে তো যাও, আসতে যেন দেরি কোরো না আবার, তোমার মা আবার বড় ভাবেন!

ইরা বললে—না, আমি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

মেসোমশাই তখনও কিছু বুঝতে পারলেন না। ইরার দিকে চেয়ে যেন কিছু বোঝার চেষ্টা করলেন।

আমি বললাম—মীরার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে যাচ্ছে ইরা, দেখুন না মেসোমশাই—

ইরা কিছু বললে না।

মেসোমশাই বললে—ঝগড়া করেছে ? কেন ?

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই ইরা বললে—আপনি আগে আমাকে জানান নি কেন ! আপনি বলুন, আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই—

মেসোমশাই বিচলিত হয়ে উঠলেন। কেমন যেন বিব্রত ভাব। বললেন—কী শুনতে চাও বলো মা—বলো—

ইরা বললে—বলুন, আমি এ বাড়ির কে ? কে আমার মা ? কে আমার বাবা ?

মেসোমশাই স্থির হয়ে ইরার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না।

ইরা আবার বললে—বলুন, বলুন—কোথা থেকে আমাকে নিয়ে এসেছেন এ-বাড়িতে ? আমার আসল পরিচয় কী ? কেন আমাকে জানাননি এতদিন ? আমার সব পরিচয়টাই কি মিথ্যে ? বলুন আপনি, আমি শুনে তবে যাবো—

মেসোমশাই আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর যেন বাক্‌রোধ হয়েছে। একটা কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না।

ইরা বললে—কাল সমস্তটা দিন আমি কিছু খাইনি, কাল সমস্ত রাত আমি ঘুমোইনি—আমাকে বলুন আপনি আমি কী করবো ! মীরা যা বললে সব তাহলে সত্যি ? এক বর্ণও মিথ্যে নয় ? বলুন, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি চুপ করে থাকবেন না—

মাসীমা এসে দাঁড়ালেন পেছনে। কাপড়ের আঁচল দিয়ে হু'চোখ মুছছেন।

ডাকলেন—ইরা !

ইরা পেছন ফিরলো।

মাসীমা বললেন—বুড়ো অসুস্থ মানুষ, ওঁকে আর যন্ত্রণা দিস্‌নে মা, তুই বড় হয়েছিস, তোকে লেখাপড়া শিখিয়েছি, একটু মায়া-দয়া নেই তোর শরীরে—

ইরা বললে—তা তোমরাই কি মায়া-দয়া করেছ আমার ওপর!

মাসীমা বললেন—তা এতদিন পরে তুই এই কথা বলতে পারলি? ছোটবেলা থেকে তোকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি, তখন কোথায় থাকতিস্ তুই, যদি আমরা না বুকে তুলে নিতাম?

ইরা বললে—কিন্তু কেন তোমরা জানালে না আমাকে—বলো, তোমাকে বলতেই হবে, কে আমার মা, কে আমার বাবা, কেন তোমরা আমাকে মানুষ করলে—! জানো আমার জীবন নষ্ট করে দিয়েছ তোমরা—সারা রাত শুধু কেঁদেছি আমি—

মাসীমা কাছে এগিয়ে গিয়ে ইরার পিঠে হাত দিলেন—লক্ষ্মীটি মা আমার, রাগ করিস নে মা—

ইরা সরে দাঁড়ালো।

বললে—আজ আর তোমার আদর শুনবো না—কেন তোমরা জানাওনি আগে, তাই বলো—

মাসীমা বললেন—হ্যাঁরে, জন্মটাই কি তোর বড় হলো? আমরা, যারা তোকে মানুষ করেছি দু'বছর বয়স থেকে তারা কেউ-ই নই? ওই যে বুড়ো মানুষটার অসুখ হয়েছে, চোখে দেখতে পান না—তোদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে রক্তপাত করে পয়সা খরচ করেছেন—আমি নিজের হাতে রান্না করে সারাজীবন খাইয়েছি—সংসারের একটা কাজ পর্যন্ত করতে দিই না পাছে তোদের লেখা-পড়ার ক্ষতি হয়—সেটা কি বলতে চাস্ কিছুই না—তার কি কোনও দামই নেই?

ইরা বললে—ওসব শুনতে চাই না আমি, আমি যদি ছোট-লোকের মেয়ে, নীচু ঘরে আমার জন্ম, তবে কেন আমাকে তোমরা মানুষ করলে? দু'বছরের মেয়েটাকে সেদিন গলা টিপে মারতে পারলে না?

মাসীমা কাঁদতে লাগলেন। তাঁর চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়তে লাগলো।

ইরা বললে—বলো তুমি। আমার কথার জবাব দাও—ও-রকম করে কাঁদলে চলবে না—

আমি হঠাৎ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। আমার কী-ই বা বলবার ছিল! কেমন করে কে-ই বা জানালো? কী করে জানতে পারলো ইরা সে এ-বাড়ির মেয়ে নয় তাই-ই তো বুঝতে পারছিলাম না।

মনে আছে কী ভীষণ সেই সব মুহূর্তগুলো।

পরে মাসীমার কাছে শুনেছিলাম সবটা। যখন ঝড়-ঝাপটা থেমে গেছে। ইরা চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে।

যাবার সময় ইরা বলেছিল—তোমরা তোমাদের পেটের মেয়েকে নিয়েই থাকো—আমি চললাম, আমি তো পর—আমি এ-বাড়ির কেউ-ই নই—

মাসীমা বলেছিলেন—তা তুই কি আমার পেটের মেয়ের চেয়ে কিছু কম রে?

ইরা বলেছিল—কম না হলে এমন ব্যবহার করতে পারতে আমার সঙ্গে?

মাসীমা বলেছিলেন—তোর সঙ্গে আমরা খারাপ ব্যবহার করেছি এই কথা তুই বলতে পারলি? তোর গায়ের কানের গয়না, যা পরে আছিস, সব তো আমাদেরই দেওয়া, তুই মেয়েকে সমান করে দিয়েছি পাছে কেউ কিছু মনে করে—

ইরা বললে—গয়না দিয়েই বুঝি তোমরা আমাকে ভোলাতে চেয়েছ? আর গয়নাই যদি তোমাদের কাছে এত দামী জিনিস হয় তো এই নাও সব খুলে দিচ্ছি—এই নাও—

বলে কানের দুল দুটো, হাতের ক'গাছা চুড়ি সব খুলে টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছিল ইরা।

মেসোমশাই এতক্ষণ সব দেখছিলেন। কিছুই বলেন নি।

শেষকালে বললেন—গয়না তো দিয়ে গেলে, এখন যাবে

কোথায় শুনি? থাকবে কোথায়? খাবে কী? আর আমাদের কথাও একবার ভাববে না! তুমি চলে গেলে আমরা বাঁচবো কি মরবো তা-ও বুঝি দেখবার দরকার নেই তোমার? এই তোমার বুদ্ধি হয়েছে? এই তুমি লেখাপড়া শিখেছ?

এতক্ষণে ইরাও কেঁদে ফেললে।

কাঁদতে কাঁদতে বললে—কিন্তু আমি যে এ-বাড়ির কেউ নই! আমার যে কেউ নেই!—

মেসোমশাই বললেন—কে বললে কেউ নেই? তাহলে আমরা কে?

ইরা বললে—তাহলে এতদিন কেন ভুলিয়ে রেখেছিলেন আপনারা? পর কখনও আপন নয়? তাই কখনও হয়েছে?

মেসোমশাই বললেন—এত লেখাপড়া শিখে এই তোমার শিক্ষা হয়েছে বুঝি?

ইরা বললে—শিক্ষা, শুধু আমারই দেখলেন আপনারা—আপনাদের মেয়ের শিক্ষাটা তো দেখলেন না?

মাসীমা বললেন—তুই তো ওকে কেবল আমাদের আদর দিতেই দেখিস—ওকে কত বকেছি কাল—কাল সারা রাত মীরা কেঁদেছে জানিস—সারা দিন কিছু খায়নি—

সমস্ত সংসারটা যেন একদিনে হঠাৎ ছন্নছাড়া হয়ে গেল। যে সংসারে প্রতিদিন যেতাম, প্রতিদিনের পরিচয়ে যে-সংসারটা আমার চোখে অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, এক মুহূর্তেই তা যেন আমার কাছে অপরিচিত ঠেকলো। মনে হলো এইটেই বোধহয় সংসারের নিয়ম। এই চেনার মধ্যেই অচেনা লুকিয়ে থাকে। ইরাও যেন আমার চোখে সুদূর ঠেকলো এক নিমেষে। যে-ইরা বাবা-মার সঙ্গে তর্ক করলো, ঝগড়া করলো, মনোমালিন্য করলো সেই ইরা এত ঘনিষ্ঠ হয়েও যেন পরম অপরিচিত হয়ে উঠলো এক মুহূর্তে।

মাসীমা বললেন—তুই কেন ও-কথা বলতে গেলি মীরা?

মীরা বললে—বেশ করেছি। আমায় কেন ও-রকম কয়ে ও ?

—কী করেছিল তোর শুনি ?

মীরা বললে—এক বছরের বড় বলে কি আমায় যখন-তখন যা-তা বলবে !

মেসোমশাই বললেন—তা মীরাই বা জানতে পারলে কেমন করে ? তোমাকে আমি পই পই করে বলেছিলাম না কাউকে বোলো না—

মাসীমা বললেন—ওমা, তোমার আবার সব উল্টো কথা, আমি বলতে যাবো কেন ! তোমার মেয়েই বাক্সপ্যাটরা খুলে দেখে ফেলেছে চিঠিপত্র। বড় হয়েছে এখন, কত দিন চেপে রাখতে পারবে ! আমি তো তখনই বলেছিলাম ইরাকে খুলে বলাই ভালো, তুমিই বারণ করেছিলে—

রাস্তায় বেরিয়ে যাবার সময় আমি পেছন-পেছন গেলাম।

পেছন থেকে ডাকলাম।

বললাম—ইরা, শোন—

ইরা দাঁড়াল। কাছে গিয়ে বললাম—আমি কী দোষ করলাম তোমার ?

ইরা প্রথমে কিছু কথা বললে না।

তারপর বললে—দোষ তো কাউকে দিইনি আমি—আমারই ভাগ্যের দোষ।

—জন্মটাকেই বড় করে ধরলে আজ ইরা, আর এতদিন যারা তোমাকে মানুষ করলে ভালোবাসলে তারাই পর হয়ে গেল ?

ইরা বললে—অত কথার উত্তর দেবার মত মনের অবস্থা নয় আজ আমার, নইলে উত্তর দিতাম। কিন্তু জন্মের সময় থেকে যার ভাগ্য খারাপ, তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না-ই বা রাখলে তুমি !

বললাম—এ তোমার অভিমানের কথা ইরা।

ইরা বললে—অভিমান বলেই কি সেটা তুচ্ছ? নিজেকে আমার অবস্থায় একবার বসিয়ে কল্পনা করো দিকিনি!

একটু চুপ করে থেকে বললাম—এখন কোথায় যাবে?

ইরা বললে—কাল যেখানে ছিলাম।

বললাম—কাল কোথায় ছিলে?

ইরা বললে—মেয়েদের হোস্টেলে।

বললাম—কিন্তু তারপর?

ইরা বললে—তারপর মানে? টাকার কথা বলছো? একটা 'টো টিউশনি যোগাড় করে নিলেই চলবে—

বললাম—কিন্তু যখন পাশ করে যাবে, তখন? তখন কি হোস্টেলে থাকতে দেবে?

ইরা বললে—ভবিষ্যতের কথা ভাববো না আর, আমার অতীত যেমন নেই, ভবিষ্যৎও নেই—

বললাম—আর কখনও দেখা হবে না তোমার সঙ্গে?

ইরা বললে—দেখা করতে চেষ্টা কোরো না আমার সঙ্গে—

বললাম—কেন ইরা? আমি তোমার কী করেছি?

ইরা বললে—বললাম তো, দোষ কারোর নেই, দোষ আমার ভাগ্যের। আমার ভাগ্যের সঙ্গে আর কারো ভাগ্য জড়াবো না ঠিক করেছি—

বললাম—আমাকেও তুমি এই কথা বলবে?

ইরা বললে—তুমি জানো না তাই এই কথা বলছো। জানলে আমার সঙ্গে কথা বলতে না—

বললাম—তা হলে তুমি এতদিন আমাকে ভুল চিনেছ—

ইরা রাস্তার মধ্যে থমকে দাঁড়ালো। তার চোখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেলাম।

ইরা বললে—তবে শোন, আমার মা পাপ-ব্যবসা করতো—

আমি চমকে উঠলাম।

ইরা চলতে চলতে বললে—এর পরেও আর শুনতে চাও ?

আমি কী বলবো বুঝতে পারলাম না।

ইরা বললে—যদি আরো শুনতে চাও, আরো বলতে পারি—আমার মা কলেরায় মারা যায়, তখন এঁরা পুলিশের কাছে চিঠি লিখে আমার ভার নেন, এঁদের তখন কোনও সন্তান হয়নি,—এর পরেও আমার সঙ্গে তুমি সম্পর্ক রাখতে চাইবে ?

মুখ দিয়ে আমার কোনও কথা বেরোল না। ঘটনার চক্রে আমি যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।

ইরা বললে—হয়ত আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না—যদি বিশ্বাস না-ই হয় তো মীরাকে জিজ্ঞেস কোরো, সে সব জানে, আর তাতেও যদি বিশ্বাস না হয় তো মীরাই তোমাকে কাগজপত্র দেখাবে—পুলিশের সঙ্গে যে চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছিল সব একটা ট্রাঙ্কের মধ্যে আছে- --

বলে ইরা চুপচাপ চলতে লাগলো।

তারপর এক সময়ে বললে---তুমি আর আমার সঙ্গে এসো না—আমি চলি—

বলে ইরা চলে গেল। আমি সেখানেই রাস্তার ওপর হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম ইরা হয়ত একবার পেছন ফিরবে। কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও আর পেছন ফিরতে দেখলাম না তাকে। সোজা চলতে লাগলো সে। তারপর লোকের ভিড়ের মধ্যে একাকার হয়ে গেল।

তারপরেও যেতাম মাসীমাদের বাড়িতে। যাওয়াটা প্রায় নেশার মত হয়ে গিয়েছিল বলেই হয়ত যেতাম।

গিয়ে দেখতাম মাসীমা সেই একরকম ভাবে রাঁধছেন। আমি পাশে গিয়ে বসতাম খানিক। বেশি কথা বলতেন না আগেকার মতন। যন্ত্রের মত কাজ করে যেতেন।

মাসীমা এক-একদিন জিজ্ঞেস করতেন—আর দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে ?

বুঝতাম কার কথা বলছেন মাসীমা।

বলতাম—না তো মাসীমা !

দেখা যে করতে চেষ্টা করতাম না, তা নয়। অনেক দিন রাত্রে মাসীমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শ্যামবাজারের দিকে চলে যেতাম। মেয়েদের হোস্টেলটার সামনের রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতাম। হয়ত জানলায় ইরাকে দেখা যাবে সেই আশায় হাঁ করে চেয়ে থাকতাম সেই দিকে। দূর থেকে কাউকে চেনা যেত না। আবছা আলোয় জানালায় হয়ত ইরার মত কাউকে দেখতাম। ভাবতাম হয়ত চিনতে পারবে আমাকে। চিনে নিচে দেখা করতেও আসতে পারে। কিন্তু এক সময় ঘরেব আলোটা নিভে আসতো। আমি আস্তে আস্তে আবার মেসের দিকে চলে আসতাম।

মাসীমা বলতেন—কী খাচ্ছে সেখানে কে জানে! ছোটবেলায় আমি খাইয়ে দিলে তবে খেত জানো, মীরার মত নয়, আমার কথা বড় শুনতো সে।—বড় লক্ষ্মী মেয়ে ছিল আমার সে—

তারপর একটু থেমে বলতেন—যাক্ গে, বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, এখন আমাদের কথা শুনবে কেন, এখন আর আমাদের কথা তার ভাবার কী দরকার—আমরা তার কে—

মেসোমশাই বলতেন—আমি আর ওষুধ খাবো না কাল থেকে, আমার জন্যে ওষুধ আনতে হবে না—

মাসীমা বলতেন—কেন, তোমার আবার কী হলো ?

মেসোমশাই বলতেন—না, খবরদার, আমার ওষুধ খেয়েও দরকার নেই, আমার বেঁচেও দরকার নেই—

মাসীমা নিজে কাঁদতেন আর বলতেন—ওঁরই বেশি মনে লেগেছে, জানো বাবা, প্রথম সন্তান তো—প্রথম সন্তানের মতই বড় আবদার করতো সে ওঁর ওপর—

মেসোমশাই নিজের মনেই নানারকম কথা বলতেন।

মাসীমা কিছু বুঝতে পারতেন না।

বলতেন—কী বলছো তুমি? কাকে বলছো? ডাকছো আমাকে?

মেসোমশাই রেগে যেতেন—জানিনে যাও—কাউকে কিছু বলছিনে আমি—কাউকে আমার দরকার নেই—

তিনি যেন দিন দিন কেমন খিটখিটে মেজাজের হয়ে গেলেন। কারো সঙ্গে কথা বলেন না। কথা বললেও উত্তর দেন না।

মাসীমা বলতেন—জানো বাবা, দু'টো মেয়ে আমার। অনেকে ওদের দেখে ভাবতো যমজ বোন—সবাই জিজ্ঞেস করতো—মেয়ে দু'টি বুঝি যমজ আপনার?

মাসীমা আবার বলতেন—তা যমজ মেয়েই বটে—ছোটবেলা থেকেই তো দু'জনে ঝগড়া, এর সিল্কের ফ্রক হলো তো ওরও চাই—না হলেই কান্নাকাটি এক্‌সা—

দু'টি মেয়ে সংসারে। মেসোমশাই দোকানে গিয়ে বলতেন—দু'টো জামা যেন একই রকম হয় মশাই, দেখবেন, ভালো করে দেখে মিলিয়ে দেবেন। নইলে বাড়িতে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধাবে মেয়েরা—

ছোট বয়সের সব গল্প।

মাসীমা দু'হাতে দু'টো ভাতের থালা এনে দিতেন এক সঙ্গে দু'জনের সামনে। একজনকে আগে দিলেই আর একজন কেঁদে কেটে অস্থির।

ইরা একপাশে শুতো, আর একপাশে শুতো মীরা। মধ্যিখানে মাসীমা।

দু'জনে ঝগড়া।

ইরা বলতো—তুমি আমার দিকে পাশ ফিরে শোও মা—

মীরা বলতো—না মা, তুমি আমার দিকে পাশ ফিরে শোও—

মাসীমা বলতেন—আমি তোদের দু'জনেরই মা যে রে—তবে তোরা এত ঝগড়া করিস কেন ?

ইরা বলতো—না, তুমি আমার একলার মা—

মীরা বলতো—না, সে হবে না, তুমি আমার একলার মা—দিদির মা নও—

শেষে মীরা ঝগড়া করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লে মাসীমা ইরার দিকে পাশ ফিরে শুতেন।

বলতেন—দেখলি তো, ও ছোট্ট বোন হয় তোর—ওর ওপর হিংসে করা ভালো ?

ইরা বলতো—হোক ছোট বোন, তুমি আমার একলার মা—

বলে রাত্রে মাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতো ইরা। কেউ যেন তার মা'র ওপর ভাগ বসাতে না পারে!

তখন কি মাসীমা জানতেন আবার তাঁর সন্তান হবে! বহুদিন সন্তান হয়নি তাঁর। তখন রাজসাহীতে থাকতেন। পুলিশ অফিসার ছিল জগদীশবাবুর বন্ধু। বস্তীতে কলেরা হচ্ছিল খুব। একদিন পুলিশ অফিসার রামহরিবাবু বললেন—আপনার তো ছেলেমেয়ে নেই—দত্তক নেবেন জগদাশবাবু ?

কথাটা হাসতে হাসতে বলেছিলেন।

তেমন কোনও গুরুত্বই দেননি কথাটার ওপর তিনি।

পুলিশের থানায় তখন সদ্য দু'বছরের মেয়েটাকে এনে রেখেছেন ওঁরা। থানার মধ্যেই খেলা করছিল। ফুটফুটে মেয়েটি। ডাক্তার এসে তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ইন্‌জেকশন দিয়ে গিয়েছে।

জগদীশবাবুর দেখে খুব মায়া হলো।

রামহরিবাবু বললেন—গায়ে কি আর নাম লেখা থাকবে মশাই! আর আপনি তো দু'দিন পরেই বদলি হয়ে যাচ্ছেন—। ছেলেমেয়ে না থাকলে সংসার মানায় না। যাক্, গিন্নীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আমাকে জানাবেন—

সত্যিই তখন আর দু'চার দিনের মধ্যেই বদলি হয়ে ঢাকায় চলে যাবার কথা। সেখানে গেলে আর কারো জানবার কথা নয়।

মাসীমাকেও দেখানো হলো। তারপর রাজসাহী থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে চাটগাঁ, চাটগাঁ থেকে বীরভূম। এমনি অনেক জায়গা ঘুরে ঘুরে শেষ-জীবনে কলকাতায়। ঢাকাতে গিয়েই সেখানে মীরা হলো।

পুরনো গল্প করতে করতে মাসীমা বলতেন—যাক্ গে, এখন বড় হয়েছে ওরা, ওদের ভালো মন্দ ওরাই বুঝতে পেরেছে—আমার আর ভাবতে হবে না—

মেসোমশাইকে বলতেন—তুমি অত ভাবো কেন বলো দিকিনি—কই, আমি তো কিছু ভাবি না, যা হয়েছে ভালোই হয়েছে—

মেসোমশাই বলতেন—আমার ভাবতে বয়ে গিয়েছে—আমি যেন দিনরাত সেই কথাই ভাবছি—তুমিও যেমন—

মীরা যেন আরো গম্ভীর হয়ে গেছে। আমাকে দেখলে পাশ কাটিয়ে সরে যায়। কথা বলে না। আবছা অন্ধকারে হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন ইরা। যেন ইরা দাঁড়িয়ে আছে। বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। তারপরেই নিজের ভুল বুঝতে পারি। চোখ ফিরিয়ে নেই।

মনে হয় সমস্ত সংসারটা যেন ছারখার হয়ে গেছে। যেন সবই আছে, অথচ কিছুই যেন নেই।

মাসীমা রাঁধতে রাঁধতে বলেন—জানো লালু, পটলভাজা খেতে ইরা বড় ভালবাসতো—মুগের ডাল আর পটলভাজা দিলে সব ভাত উঠে যেত—

তারপরেই বলতেন—যাক্ গে, তার ভালো সে-ই ভালো করে বুঝছে, আমরা আর ক'দিনই বা বাঁচবো—

তারপর হঠাৎ থেমে বলতেন—আর দেখা হয়েছিল নাকি তার সঙ্গে ?

বললাম—দেখা হয়েছিল ইরার সঙ্গে মাসীমা !

মাসীমা হাতের রান্নাটা রেখে আমার দিকে তাকালেন।

বললেন—দেখা হয়েছিল? কী বললে? শরীরটা ভালো আছে?

সত্যিই একদিন হঠাৎ দেখা হয়েছিল ইরার সঙ্গে। অনেক দিন হোস্টেলটার সামনে দিয়ে গেছি। হয়ত দেখা হয়ে যেতে পারে এই আশায়। দিনে দুপুরে রাত্রেও গেছি। কাজ না থাকলেও গিয়েছি। কিন্তু কখনও দেখা হয়নি।

হঠাৎ একদিন দেখি বাসের মধ্যেই রয়েছে ইরা।

কাছে গিয়ে ডাকলাম—ইরা—

ইরা চাইলে। দেখলাম চেহারাটা শুকনো, একটু রোগা হয়ে গিয়েছে যেন।

বললাম—কোথায় যাচ্ছো ?

ইরা বললে—একটা কাজ আছে এদিকে—

বললাম—গেজেটে দেখলাম তুমি ফার্স্ট ডিভিশনে আই-এস্-সি পাশ করেছো—মাসীমা খুব খুশী হয়েছেন—কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছেন—

ইরা কোনও উচ্চবাচ্য করলে না।

আমি আরো কথা বলতে যাচ্ছিলাম।

ইরা হঠাৎ উঠলো। বললে—চলি—

বলে নেমে গেল বাস থেকে। বুঝলাম আমাকে এড়াবার জন্যে নেমে পড়লো মাঝপথে।

এরপর আমারও আর কলকাতায় বেশিদিন থাকা হয়নি। কলকাতায় মেসের বাসা আমার তুলে দেবার সময় হলো। লেখা-পড়া আর বেশিদিন চালানো গেল না। কারণ কাকাও হঠাৎ মারা গেলেন। দেশ থেকে খুড়তুতো ভাইরা টেলিগ্রাম করলে।

যাবার আগে মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

মাসীমা বললেন—একটা কথা তোমায় বলবো বাবা, তুমি তো ইরাকে বিয়ে করতেই চেয়েছিলে, তা সে তো আমাদের কপালে নেই—

বলে চোখের জল মুছলেন।

বললাম—সে-সব কথা থাক মাসীমা—

মাসীমা বললেন—ওঁরও বহুদিনের সাধ, উনিও বলছিলেন—তা মীরা আমার মেয়ে হিসেবে খারাপ নয় বাবা, বাইরে থেকে যা দেখো, তেমন নয়, মনটা বড্ড নরম, দেখো না, দিদি যাবার পর থেকে মনে বড় দুঃখ পেয়েছে, একেবারে কথাটি মুখে নেই—

আমি কিছু বললাম না। সেদিন সে-কথার উত্তর না দিয়েই চলে এসেছিলাম। আর তা ছাড়া কী উত্তরই বা আমার দেবার ছিল। হয়ত মাসীমার প্রস্তাব গ্রহণ করলে ওঁদের সংসারের সাশ্রয় হতো, ওঁদের দুশ্চিন্তা কমতো। ওঁদের নিশ্চিন্ত নির্ভয় করা যেত। দিনের পর দিন দু'টি প্রাণী যে-দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন তা থেকে তাঁদের মুক্তি দেওয়া যেত। মেসোমশাই-এর স্বাস্থ্য ফিরতো। বুঝতে পারতাম সবই। ভাগ্যের যে অমোঘ আকর্ষণে আমি ওঁদের সংসারে জড়িয়ে পড়েছিলাম তার জন্যে আমার সমস্ত স্বীকার করাই হয়ত উচিত ছিল। মেসোমশাই-এর পেনশনের টাকা-কটার ওপর ভরসা করে সংসার চালানো যে কী কষ্টকর তার পরিচয় আমি জানতাম। হয়ত স্ত্রী হিসেবে ওঁদের মেয়ে খারাপ হতো না। যে-অহঙ্কার মীরার হাবে-ভাবে ফুটে উঠতো সেটা হয়ত বয়েসের সঙ্গে সঙ্গেই বাস্তব ঘটনার চাপে পড়ে কমে আসতো, দিনকতক পরে হয়ত সবই স্বাভাবিক হয়ে আসতো। কিন্তু তবু পারলাম না। পারলাম না বলে নিজের মনে যে ধিক্কার ছিল না তা নয়। কিন্তু সে ধিক্কার চোখ কান বুজে স্বীকার করে দূরে সরে গেলাম—এড়িয়ে গেলাম আমার দায়িত্বকে।

এরপর দেশে গিয়েছি। কাকার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান সেরে যখন কলকাতায় আবার ফিরে এলাম তখন অনেকটা সামলে নিয়েছি নিজেকে। আত্মস্থ হয়েছি অনেকটা। যে মানসিক নিগ্রহের মধ্যে দিন যাপন করছিলাম তার খানিকটা যেন লাঘব হয়েছে মনে হলো। মনে হলো, আর প্রয়োজন নেই। কোনও কিছুরই আর প্রয়োজন নেই আমার। জীবনের দীর্ঘ চলাচলের ফাঁকে এমন অনেক ঘটনা আরো ঘটবে, আরো বিপর্যয় আসবে—তার জন্যে আত্মনিগ্রহে কোনও লাভ নেই, আর প্রয়োজনও নেই। আমি স্বাধীন। আমি মুক্ত। এবার থেকে জীবনে আর কোথাও নিজেকে এমন করে বিলিয়ে না দিলেই হলো!

মাসীমা বলতেন—তুমি এলে, একটু তবু ভরসা পেলাম বাবা—

ক'দিন ধরে গিয়েও মীরার দেখা না পেয়ে কেমন যেন সন্দেহ হলো।

জিজ্ঞেস করলাম—মীরাকে দেখছি না যে, মীরা কোথায় মাসীমা?

মাসীমা কেঁদে ফেললেন।

বললেন—সে-ও নেই—

বললাম—সে কি? তার আবার কী হলো?

মাসীমা বললেন—তুমি তখন ছিলে না বাবা, সেই সময়ে রাগারাগি করে চলে গেছে—

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এ কী হলো এ-সংসারে! কার দোষ, কী দোষ, সে কথা আমার মনে এল না। শুধু মনে হলো এ সংসারের চলবে কী করে! কোন্ নির্ভরতায় এরা বাঁচবে? কোন্ নির্ভরতায় এরা সুস্থ হবে? কোন্ আশ্রয়ে এরা নিশ্চিন্ত হবে!

বললাম—কিন্তু মীরা তো তেমন ছিল না—

মাসীমা বললেন—ইরাই কি তেমন মেয়ে ছিল আমার!

আমার কপাল মন্দ বাবা! কত টাকা খরচ করেছি ওদের মানুষ করবার জন্যে, কত রাত্তির আমার ভেবে ভেবে কেটেছে—ওদের অসুখ-বিসুখে আমরা দু'জনে কত দুর্ভাবনাতেই যে কাটিয়েছি, সে-কথা আমরা জানি আর মাথার ওপর যিনি আছেন তিনিই জানেন—ওরা তা বুঝবে কী করে!

বললাম—শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল? কেন গেল সে?

মাসীমা বললেন—ওই মানুষকে তুমি জানো তো বাবা, রেগে গেলে যা তা বলেন—উনিই একদিন রাগের মাথায় মীরাকে বকেছিলেন—

বললাম—তা বাপ-মা তো বকেই থাকে। বাবা-মা যদি না বকে তো কে বকবে—

মাসীমা বললেন—তুমিই বলো তো বাবা, বকি যে, সে তো ওদের ভালোর জন্যেই! ওঁর তো আজকাল মাথার তেমন ঠিক নেই, ইরা যাবার পর থেকেই কেমন হয়ে গেছে ওঁর, রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় না—আমাকেই কত বকেন, তা আমি চুপ করে থাকি, আজ না হয় বুড়ো হয়েছেন—কিন্তু ওদের তো বোঝা উচিত, ওই মানুষটা আছে বলেই তোমরা লেখাপড়া শিখতে পারছো, দুটো খেতে পরতে পারছো—

তা-ও তেমন কিছু বলেন নি মেসোমশাই।

বলেছিলেন—তোমার স্বভাবটা একটু শোধরাবার চেষ্টা করো না—স্বভাবটার জন্যে কষ্ট পেতে হবে তোমাদের—

মীরা বলেছিল—আপনারা কেবল আমারই দোষ দেখলেন—

মেসোমশাই বলেছিলেন—তোমার ভালোর জন্যেই বলি আমরা, তোমার ভালোই তো চাই আমরা—নিজের ছেলেমেয়ে হলে তখন বুঝবে সন্তান-স্নেহ কী জিনিস! তোমরা তো লেখাপড়া শিখেছ, তোমাদের তো বেশি বলার দরকার হয় না—ওই দেখ না তোমার মা, তোমাদের জন্যে কী খাটাটা না খাটেন দিনরাত—দেখতে পাও না তুমি?

মীরা বলেছিল—কী বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন—

মেসোমশাই বললেন—তোমার মা'কে একটু সংসারের কাজে সাহায্য করতেও তো পারো—কেবল সেজেগুজে কলেজে গেলেই কি শিক্ষা হয়? সংসারের কাজও তো দেখবে একটু—

মীরা বললে—তার চেয়ে বলুন না লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে রান্না করতে বসি—

মেসোমশাই বললেন—লেখাপড়া ছাড়তে তো বলিনি তোমাকে মা, কিন্তু যে লেখাপড়া করে সে কি আর সংসারের কাজ করে না, না সংসারের কাজ করলে লেখাপড়া বন্ধ করে দেয় সবাই—?

মাসীমা কথার মধ্যে এসে শুধু বলেছিলেন—কেন তুমি ও-সব কথা বলছো বলো তো, আমি খেটে খেটে মরে যাই, তাতে ওদের কী! তুমি ওসব কথা ওদের বলতে যেও না—

এই কথাতেই মীরা ক্ষেপে উঠলো।

বললে—তাহ'লে সেই কথাই খুলে বলো না যে আমি এ বাড়ি থেকে চলে গেলেই তোমরা আরামে থাকো—তা ছাড়া আমিই তো যত নষ্টের মূল, আমিই তো দিদিকে তাড়িয়েছি—তার জন্যেই তো আমাকে এত কথা শুনতে হচ্ছে—ভাবছো আমি কিছু বুঝি না, না?

তারপরেই কী যে হলো, সেই দিনই সন্ধ্যেবেলা মেয়ে কলেজ থেকে এসে বইপত্তোর নিয়ে একটা রিক্সায় গিয়ে উঠলো।

মাসীমা বললেন—আমি খাবার করে রেখেছিলাম ওর জন্যে, ভেবেছিলাম কলেজ থেকে এসে খাবে—তা না, ওইভাবে চলে যেতে দেখে বাইরে গিয়ে বললাম—কী রে, কোথায় যাচ্ছিস? খাবি না?

তা মেয়ে বললে কী জানো বাবা? মেয়ে বললে—আমার জন্যেই যখন এত অশান্তি তখন আমিই চলে যাচ্ছি। আমি চলে গেলেই তোমার আদরের বড় মেয়ে এসে থাকবে তোমাদের কাছে।

তখন তাকে প্রাণ ভরে খাইও দাইও—যা খুশী করো—কেউ বিরক্ত করতে আসবে না—

মাসীমা কথা বলতে বলতে কাঁদতে লাগলেন।

একটু থেমে আবার বললেন—শুনলে তো মেয়ের কথা! ও বরাবরই ওই রকম! ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি কি না—কিছুতেই দু'জনে দু'জনকে সইতে পারে না। এ যে-জিনিসটি চাইবে ওরও সেই জিনিসটি চাই। না দিলেই কান্না—

বললাম—অদ্ভুত তো!

মাসীমা বললেন—ছোটবেলা থেকেই ওই রকম। হিংসে। বিশেষ করে আমার ছোট মেয়ে। বড় মেয়েকে যদি ভালো জামা কিনে দিয়েছি তো ছোট মেয়ের সহ্য হবে না। ছোট মেয়েকে যদি ভালো জুতো কিনে দিয়েছি তো বড় মেয়ের সহ্য হবে না। এই রকম!

তারপর বললেন—তোমার মত যদি একটা ছেলে থাকতো আমার তো কীসের ভাবনা বাবা—

বলে রান্না করতে লাগলেন আবার একমনে।

মেসোমশাই ঘর থেকে চীৎকার করেন—আমার ওষুধ আবার কে আনলে?

মাসীমা কোনও উত্তর দিতেন না।

আরো জোরে চীৎকার করতেন মেসোমশাই।

বলতেন—বলি, শুনতে পাচ্ছো না, না কি? আমার ওষুধ আবার কে কিনে আনলে শুনি?

মাসীমা রান্না ছেড়ে উঠতেন।

বলতেন—ওই, উনিও সময় বুঝে ক্ষেপে গেছেন—বুড়ো মানুষ নিয়ে আমার হয়েছে জ্বালা—যাই শুনে আসি আবার কী বলছেন!

বলে মাসীমা মেসোমশাই-এর ঘরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বললেন—তোমার জন্যে কি রান্না-বান্না সব বন্ধ করে দেব—কী বলছিলে, বলো। চেঁচাচ্ছিলে কেন?

মেসোমশাই বললেন—রান্না কা'র জন্যে করছো শুনি? কে আছে বাড়িতে যে খাবে?

মাসীমা বললেন—তা যতক্ষণ শ্বাস আছে ততক্ষণ তো খেতে হবে? না তা-ও চাও না তুমি?

মেসোমশাই বললে—আর খেয়ে কী হবে? এখনও তোমার বাঁচতে সাধ? এখনও তোমার সাধ মিটলো না?

মাসীমা বললেন—সাধ মেটেনি আবার! খুব মিটেছে। প্রাণ ভরে সাধ মিটেছে! তুমিই তো যত গণ্ডগোলের মূল! বড় যে সাধ করে বাজার করে আনতে নিজের হাতে। বলতে—ইরা ভেটকি মাছ খেতে ভালোবাসে, ওর জন্যে এনেছি—! তুমিই তো সন্দেশ বিস্কুট আম কাঁটাল এনে এনে মেয়েদের খাইয়েছ—কই—তখন মনে পড়েনি!

মেসোমশাই চুপ করে যেতেন।

মাসীমা কিন্তু ছাড়তেন না তবু।

বলতেন—কী, কথা বলছো না যে! ভাল ভাল মাছ, ভালো ভালো অসময়ের আম, সব তো এনে দিতে মেয়েদের, কই তারা তোমার অসুখের সময় তো কেউ দেখলো না! দেখবার বেলায় তো সেই আমিই—সেই আমাকেই বার বার ডাকতে হয়! কেন, এখন ডাকো তোমার মেয়েদের—আসুক তারা, এসে সেবা করুক তোমার—

কোনও উচ্চবাচ্য নেই মেসোমশাই-এর মুখে। মেসোমশাই যেন হঠাৎ বোবা হয়ে গেছেন একেবারে।

মাসীমা বললেন—যাক্ গে, ডাকছিলে কেন, বলো!

মেসোমশাই কিছু কথা বললেন না তবু।

মাসীমা বললেন—এই দেখ, আমার রান্না পুড়ে যাচ্ছে, আর তোমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকলে আমার চলবে? কী বলছিলে, বলো না। শুনে চলে যাই—

মেসোমশাই এতক্ষণে কথা বললেন।

বললেন—আমি যে আমার ওষুধ আনতে বারণ করেছিলাম, আবার কে আনলে ?

মাসীমা বললেন—কেন, ওষুধ না খেয়ে কি মারা যাবে নাকি ! তুমি আমাকে ফেলে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবে, তাই চাও নাকি ?

মেসোমশাই বললেন—ও ওষুধ আমি খাবো না—

মাসীমা বললেন—তা তুমি কি কচি খোকা হয়ে গেলে নাকি ? তোমাকেও কি হাত-পা ধরে ওষুধ গিলিয়ে দিতে হবে ? বলো তো তাই-ই করি। আমার কপালে আর সুখ কেন থাকে !

মেসোমশাই বললেন—আমি ও কিছুতেই খাবো না—জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বাইরের নর্দমায় ফেলে দাও—ও আমি কিছুতেই খাবো না—

মাসীমা বললেন—তা খাবে কেন ? ওষুধ কিনতে তো টাকা লাগে না—

মেসোমশাই বললেন—টাকা নষ্ট হবে, আমার টাকা নষ্ট হবে—আমি যা বলছি তাই করো—

মাসীমা এর কী উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না।

খানিকক্ষণ পরে ঘর থেকে চলে আসতে আসতে বললেন—তোমারও ভীমরতি হয়েছে—তোমার সঙ্গে কথা বলাই পাপ দেখছি—

বলে আবার রান্নাঘরে এসে বসেন।

আমার মেসের বন্ধুরা এতদিন নানা-মন্তব্য করতো। বোধহয় খানিকটা ঈর্ষাও করতো মনে মনে। কিন্তু ঘটনাগুলো তাদের কাছেও আর বেশি দিন চাপা রইল না। তাদের মধ্যেও যেন উল্লাসের আভাস দেখতে পেলাম। তারা যেন খুশীই হয়েছে মনে মনে বুঝতে পারলাম। যতক্ষণ পারতাম বাইরে বাইরে

থাকতাম। মাসীমাদের বাড়িতেও আর বেশিক্ষণ থাকতে ভালো লাগতো না, মেসেও থাকতে পারতাম না। আমার অবস্থাই সবচেয়ে মর্মান্তিক হয়ে উঠলো। কোথায় যাবো, কার কাছে গিয়ে দু'দণ্ড শান্তি পাবো, খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। এক-কথায় ঘরে-বাইরে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। সমস্ত কলকাতাটাই যেন আমার কাছে বিস্বাদ বিষাক্ত হয়ে উঠলো। মনে হলো সব জায়গাতেই, সকলের কাছেই আমি অনাহুত।

মেসের ভবতোষবাবু বললে—কী মশাই, কত টাকা আপনার খসলো শেষ পর্যন্ত ?

আমি কথাটার উত্তর দিলাম না।

হরিসাধনবাবু বললেন—আজকাল কলকাতায় অমন অনেক ফ্যামিলি আছে, যাদের সংসারই চলে বাইরের লোকের পয়সায়। আমার খুব জানা আছে—

ভবতোষবাবু বললে—পয়সা খরচ করতে রাজী, তার বদলে যদি কিছু পাই, মুফত্ কিছু দিতে রাজী নই বাবা লালুবাবুর মত—

সাধারণত এ-সব প্রসঙ্গ উঠলেই আমি সেখান থেকে সরে যেতাম। যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়তো, অনেক রাত্রে আমি চুপি চুপি ঠাকুরকে ডেকে মেসে ঢুকতাম। তারপর চুপি চুপি নিজের সিঙল্-সিটেড রুমটায় গিয়ে শুয়ে পড়তাম।

হঠাৎ আবার একদিন বাসে ইরার সঙ্গে দেখা। মনটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। অনেকক্ষণ ভাবলাম দেখা করবো কি না। আমি পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাকে তখনও দেখতে পায়নি। বেশ পরিষ্কার সাজ-গোজ। চমৎকার একটা রঙিন সাড়ি পরেছে। মাথার খোঁপাটা মস্ত বড় করে ফুলিয়ে বেঁধেছে। হাতে গোটা কতক মোটা-মোটা বই।

ভাবলাম কাছে গিয়ে কথা বলবো।

কিন্তু কী কথা বলবো !

যদি আবার সেদিনকার মত ভালো করে কথা না বলেই হঠাৎ বাস থেকে নেমে যায়! কিন্তু আমার কী অপরাধ! আমার কী দোষ! আমি কী অন্যায় করেছি!

অনেকক্ষণ ধরে দ্বিধা করতে লাগলাম। কাছে যাবো কি যাবো না!

দেখলাম চেহারাটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে। হয়ত মেসের খাওয়া তেমন সুবিধের হচ্ছে না। মাসীমার মত কে কলেজ থেকে আসতে-না-আসতে মুখের কাছে খাবার যোগাবে! হয়ত ভোরবেলা উঠতে হয়। উঠেই দৌড়তে হয় টিউশানি করতে। ভালো করে খাওয়া হয় না, ভালো করে নাওয়া হয় না। ভালো করে ঘুমও হয় না হয়ত।

নিজের কাপড়, নিজের জামার হিসেব রাখতে হয় নিজেকেই। ড্রাইংক্লিনিং-এ দিয়ে আসতে হয়। নিয়েও আসতে হয়। কিম্বা হয়ত পয়সা বাঁচাবার জন্যে নিজেই সাবান দিয়ে কাপড় কাচে। কাপড় কেচে মাড় দিয়ে রোদে শুকিয়ে বিছানার তলায় ভাঁজ করে রাখতে হয়। মাসীমার মত কে আর আদর করে চুল বেঁধে দেবে পেছনে বসে। নিজেই হয়ত চুল বাঁধে, বিনুনি করে, খোঁপা বাঁধে।

কেমন যেন মায়া হলো ইরার দিকে চেয়ে চেয়ে।

বাইরে তো বেশ পরিপাটি করে সেজে-গুজে আছে। কিন্তু হয়ত মনে মনে টাকার হিসেব করছে। টাকা-আনা-পাই মিলিয়ে খরচ করতে হয়। নইলে চলবে কী করে! খরচ যে অনেক! একলা থাকার খরচ কি কম? তারপর হঠাৎ যদি একটা অসুখ বিসুখ হয়, তখন? তখন যে অনেক টাকা খরচ! ডাক্তার ওষুধ পথ্য—খরচের শেষ থাকবে না তখন। সে-সব কথাও ভাবতে হবে বৈ কি!

মনে মনে ভেবে নিলাম—কী কথা বলবো প্রথমে।

বলবো—কেমন আছো?

গলা শুনেই হয়ত আমার দিকে চাইবে! একটু হয়ত বিরক্ত হবে।

ভাবলাম বিরক্তই হোক আর যাই করুক কথা বলতেই হবে।

আবার বলবো—কেমন আছো ইরা?

ইরা হয়ত বলবে—ভালো—

হয়ত কথাটা বলেই মুখ ফিরিয়ে নেবে।

বলবো—এদিকে কোথায় চলেছ?

ইরা হয়ত বিরক্ত হয়ে বলবে—একটা কাজ আছে এদিকে!

কথাটা বলে সেদিনকার মত আবার যদি হঠাৎ বাস থেকে নেমে যায়? ঠিক করলাম আমিও সঙ্গে সঙ্গে নেমে যাবো। যেদিকে যাবে, আমিও সেইদিকে যাবো।

ইরা হয়ত রাগ করবে।

বলবে—কেন তুমি আসো শুধু শুধু আমার সঙ্গে?

বলবো—তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

ইরা হয়ত বলবে—কী কথা?

বলবো—চলো না, কোথাও গিয়ে বসি—

ইরা কী বলবে তা আর ভাবা হলো না। তার আগেই ইরার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। ভাবছিলাম একবার আমার দিকে ফিরলেই কথা বলবো। বুকটা দুর দুর করতে লাগলো।

কাছে গিয়ে ডাকলাম—ইরা—

ইরা মুখ ফেরাতেই অবাক হয়ে গেছি। কী যেন সন্দেহ হলো। আর একটু ভালো করে দেখলাম। তবু যেন সন্দেহ গেল না। ঠিক তো ইরারই মতন! কোন সন্দেহ নেই! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই খোঁপা।

কিন্তু হঠাৎ যেন সামনে সাপ দেখে চমকে উঠেছি।

ইরা নয়, মীরা!

এক মুহূর্তে সরে এসেছি। মীরাও মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে

নিলে। মনে হলো আমার মুখে 'ইরা' ডাক শুনে যেন চেহারাটা নিমেষে বিষিয়ে উঠলো।

আমি তারপরে আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালাম না। বাসটা থামতেই মাঝপথে নেমে পড়লাম।

এর পর আর কলকাতা ভালো লাগলো না। চাকরির একটা দরখাস্ত আগেই করা ছিল। চিঠি এসে যেতেই সোজা চলে এলাম এখানে। এই কয়লাখনির দেশে। মনে হলো আর কখনো কলকাতায় ফিরবো না। সারা জীবন এখানেই কাটিয়ে দেব। স্বেচ্ছায় নির্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করলাম।

প্রথমেই এলাম এই চিরিমিরি কোলিয়ারিতে। চারদিকে উঁচু উঁচু খনি। বন-জঙ্গল, ঝরনা আর জংলী লোক। কোলিয়ারি তখন সবে আরম্ভ হয়েছে। কয়লা উঠছে একটু একটু।

সেখানেই প্রথম ম্যাক্‌ফার্সন সাহেবের নজরে পড়ে গেলাম। ছোট একটা ঘরও পেয়ে গেলাম। তখনও ভালো-ভালো কোয়ার্টার তৈরি হয়নি সেখানে। সপ্তাহে একদিন হাট। একদিন সারা সপ্তাহের বাজার করে রাখতে হয়। বাজার করার হ্যাঙ্গাম নেই। সারাদিন কাজের চাপে কলকাতার কথা, ইরার কথা, কিছুই আর মনে পড়ে না। মাসীমার কথা, মেসোমশাই-এর কথা, সব ভুলে গেলাম।

অদ্ভুত এক নতুন আস্বাদ পেলাম জীবনে। বৃষ্টি যখন আসে, সব মাঠ-ঘাট-জঙ্গল বৃষ্টিতে যখন ঢেকে যায়, তখন অবশ্য মাঝে মাঝে মনে পড়তো না, তা নয়।

মনে হতো—ভালোই হয়েছে।

সব বন্ধন যে ছিঁড়তে পেরেছি, সব শৃঙ্খল যে ভাঙতে পেরেছি, তার জন্যে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতাম। মনে হতো—এই-ই ভালো। চেষ্টা করলে যে কলকাতায় একটা চাকরি পেতাম না, তা নয়। কিন্তু কলকাতার আকর্ষণ আমার কাছে কীসের? কার

জন্যে কলকাতায় থাকবো? কেন থাকবো, বিশেষ করে সেই মেসটা ছাড়বার জন্যে আমি যে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।

আসবার দিন ভবতোষবাবু বলেছিল—খুব বেঁচে গেলেন আপনি, কলকাতা ছাড়লেন রাক্ষুসীদের হাত থেকে বেঁচে গেলেন—

হরিসাধনবাবু বললেন—গিয়ে চিঠি-টিঠি দিও ভাই—

ভবতোষবাবু বলেছিল—বলা যায় না, রাক্ষুসীরা সেখানে গিয়েও হানা দিতে পারে—

হরিসাধনবাবু বললেন—না না, সে-ভয় নেই—গাড়িভাড়াতে মজুরি পোষাবে না তাদের—

ভবতোষবাবু বলেছিল—দয়া করে যেন কারো বাড়িতে আর পেয়িং-গেস্ট হবেন না—ওতে একূলও যায় ওকূলও যায়—লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে নেয়—

মাসীমা কেঁদেছিলেন খুব।

বলেছিলেন—যাবে, বৈ কি বাবা, যাবে বৈ কি! তোমার নিজের উন্নতি তো দেখতে হবে আগে—ভালো ভাবে থেকো, বিদেশ-বিভুঁই, অচেনা জায়গা, শরীরটার দিকে নজর রেখো—

তারপর মাসীমা আর মেসোমশাই দু'জনেরই পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়েছিলাম।

মাসীমা বললেন—অনেক সাধ ছিল বাবা মনে, কিছুই হলো না—

বললাম—দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাববেন না কিছু—বিপদ-আপদ হলেই একটা টেলিগ্রাফ করে দেবেন আমার কাছে, আমি চলে আসবো—

মেসোমশাই বললেন—মন দিয়ে চাকরি কোরো, বেয়াল্লিশ বছর চাকরি করেছি আমি—চাকরির সুখও বুঝেছি, চাকরির জ্বালাও বুঝেছি—

মাসীমা বললেন—ওঁর কথা আর বোলো না বাবা, উনি সারা

জীবন কেবল চাকরিই করে গেছেন চোখ বুঁজে—তার ফল তো এই হলো !

বললাম—কলকাতায় এলেই আপনাদের এখানে আসবো—

মেসোমশাই বললেন—আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না—তবে তোমার মাসীমাকে দেখো তুমি বাবা—

মাসীমা বললেন—বেশ বলেছ, বলে নিজের পেটের মেয়েই দেখলে না, আর ও তো হলো গিয়ে পরের ছেলে—

মেসোমশাই বললেন—পরের ছেলে হোক আর যা-ই হোক, ও যা করেছে আমার, তোমার পেটের মেয়েও তা করেনি—

মাসীমা বললেন—যখন প্রথম বদলি হয়ে কলকাতায় এলাম, ভাবলাম নতুন জায়গা, কে কী রকম লোক হবে, কেমন করে থাকবো ! ভয় পেয়েছিলাম খুব ! তা ভগবান তোমাকেই পাঠিয়ে দিলেন—

মেসোমশাই বললেন—ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। যা হোক, বড়বাবুর মন জুগিয়ে চলবে, বড়বাবুর কথাই বেদবাক্য বলে মেনে নেবে। তিনি ভুল বললেও ঠিক বলে মনে করবে। তার নামই চাকরি। আমরা সেই রকম করেই চাকরি করেছি বিয়াল্লিশ বছর—

কপালক্রমে সেই রকম বড়সাহেব জুটে গেল আমার।

ম্যাক্‌ফার্সন সাহেব আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভাগ্য ফিরে গেল। সকালবেলা উঠে সেই যে কাজে যেতাম, মাঝখানে আমার খাবার যেত অফিসে। তারপরে সেই এক টেবিলে বসেই রাত সাতটা-আটটা পর্যন্ত আমার কাজ চলতো।

এক-একদিন অফিসের মধ্যে আর কেউ নেই—আমি একলা বসে বসে কাজ-কর্ম দেখছি।

হঠাৎ ম্যাক্‌ফার্সন সাহেব কোথা থেকে এসে হাজির !

বললে—ব্যানার্জি, তুমি এখনও কাজ করছো ?

সাহেব সন্ধ্যেবেলা ডিনারের পর বেড়াতে বেরিয়ে অফিসের ভেতরে আলো জ্বলছে দেখে ঢুকে পড়েছিল।

সাহেব বললে—যাও, যাও, বাড়ি যাও—কাল থেকে একটা টাইগার বেরিয়েছে, দু'জন কুলিকে নিয়ে গেছে শোন নি ?

এই-ই হলো সূত্রপাত।

তারপর থেকেই ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে লাগলাম! মাইনে বাড়লো। প্রতিষ্ঠা বাড়লো। প্রতিপত্তি বাড়লো। ছোট কোয়ার্টার ছেড়ে বড় কোয়ার্টার পেলাম। বাগানের মালি পেলাম। বাড়ির চাকর আর্দালী পেলাম। চাকরি দেবার মালিক হলাম। অনেক ক্ষমতা এল হাতে। আমি দিল্লী যাই, বোম্বাই যাই, অফিসের কাজে আমার দায়িত্ব অপরিহার্য হয়ে উঠলো।

রাস্তায় লোকজন গেলে আমাকে সেলাম করে। আমিও মাথাটা হেলাই। আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে দয়ামায়ার ওপর লোকের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়! আমি মানেই ম্যাক্‌ফার্সন সাহেব। ম্যাক্‌ফার্সন মানেই আমি। আমার অপ্রতিহত প্রভাব ক্রমে ক্রমে সমস্ত কোলিয়ারির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

তখন মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। খবরের কাগজে সব খবর পড়ি—আর ভাবি এ-সময়ে এ-আন্দোলনের কী সার্থকতা! নিজের উন্নতির সময়ে পরের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভাবতে কার ভালো লাগে! অবশ্য এখানে তার আন্দোলনের ঢেউ আসবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সস্তার দেশ, চাকর, ঠাকুর, কুলি কামীন সবই সস্তা! প্রচুর টাকাও জমে গেছে হাতে। ম্যাক্‌ফার্সন সাহেব বললে—আমি দেশে চলে যাবো ব্যানার্জি—

বললে—ইণ্ডিয়াতে অনেক দিন কাটলো, আমার ছেলেমেয়ে নেই, এবার সেখানেই গিয়ে থাকবো—

তারপর জিজ্ঞেস করলে সাহেব, কত টাকা জমিয়েছি, কে আছে আমার বাড়িতে, কে আমার আত্মীয়-স্বজন।

সব শুনে বললে—কনট্রাকটরি করবে তুমি? আমি চলে যাবার আগে তোমাকে কাজ দিতে পারি—যদি তুমি চাও, কিছু হাতে আছে এখন—

বললাম—আমি তো ওকাজের কিছুই জানি না—

সাহেব বললে—শিখে নেবে। শিখলে সব কাজই সহজ হয়ে যাবে—

তা সেই সাহেবই প্রথমে আমায় ঠিকেদারির ছোট কাজ দিলে একটা।

সাহেব বলেছিল—এ-কাজের খুব প্রসপেক্ট আছে—এখানে রেলওয়ে লাইন হবে—অনুপপুর থেকে এই চিরিমিরি পর্যন্ত ব্রডগেজ লাইন হবার প্ল্যান আছে—এখন থেকে কনট্রাক্ট থাকলে, পরে সেই কাজের ভারও পেতে পারো—

নিজের হাতে শেখানো বিদ্যে! লোকসান হবার কথা নয়। লোকসান হলোও না। লোকসান দূরের কথা, লাভ হলো প্রচুর। ফুলে ফেঁপে উঠলাম।

মানুষের ভাগ্য যেমন ওঠে, তেমনি আবার পড়েও তো! যে তাকে ওঠায় সে-ই আবার তাকে একদিন ফেলে দেয়। এই-ই হয়তো নিয়ম।

বেশ চলছিল। ক'টা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল টের পাইনি। টাকায়, স্বাস্থ্যে, শান্তিতে একেবারে উপচে পড়েছি তখন! দু'হাতে তখন টাকা, সারা বুকে তখন শান্তি, সারা দেহে তখন স্বাস্থ্য! তখন আর কারো কথা মনে থাকবার কথা নয়। মেসের সেই ভবতোষবাবু, হরিসাধনবাবুদের তখন কৃপা করি। তখন বৌবাজারের অন্ধকার গলিটা আমার চোখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ইরা মীরা, মাসীমা মেসোমশাই তখন আমার কাছে মৃত। তারা আমার কেউ নয়—তারা আমার কেউ ছিলও না কোনওদিন।

এমন সময় সেই কাণ্ডটা ঘটল।

বিপর্যয়ের কথা সাধারণত মানুষ ভাবে না। তখন আমার আনন্দে আত্মহারা হয়ে থাকবারই কথা। আশেপাশে চাইবার সময়ও নেই, ইচ্ছেও নেই।

একদিন সকালবেলা আমার খানসামা এসে রোজকার মত চিঠি দিয়ে গেল হাতে। অনেকগুলো চিঠি ছিল। কিন্তু একখানা চিঠির ওপরে নিজের নাম আর হাতের লেখা দেখে কেমন যেন অবাক হয়ে গেলাম। অফিসের কাজের ভিড়ে অবশ্য সেদিন কোনও দিকে নজর দেবার সময় ছিল না। ভেবেছিলাম অফিসে গিয়ে চিঠিগুলো খুলবো। কিন্তু একবার অফিসে ঢুকলে আর কোনও কথা মনে থাকে না।

রাত্রে হঠাৎ মনে পড়লো। চিঠিগুলো বার করলাম। জামার পকেটেই চিঠিগুলো ছিল।

বেশির ভাগই বাজে চিঠি। জামা-কাপড়ের বিল, মোটরের তেলের রসিদ, ইনসিওরেন্সের রিমাইণ্ডার—এমনি আরো কত কী! শেষ চিঠিখানা খুলতেই দেখি বাঙলায় লেখা সেখানা।

লিখেছে ইরা!

শরীরের সমস্ত রক্ত-চলাচল যেন এক মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল।

লিখেছে—

লালুদা,

অনেক দিন পরে আমার চিঠি পেয়ে তুমি নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাবে। তুমি এখন অনেক বড় হয়েছ। অনেক কষ্টে তোমার ঠিকানা যোগাড় করে তোমাকে এই চিঠি লিখছি! যত অবিচার আমি নিজে সহ্য করেছি, তত অবিচার আমি করেছি পরের ওপর। তোমার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া আমার বিশেষ দরকার। আমি এ-বছরে ডাক্তারি পাশ করেছি। তোমার চিঠির অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি—

তোমার ইরা

চিঠিটা বার বার পড়লাম। বার বার পড়েও যেন তৃপ্তি হলো না। শেষ পর্যন্ত এমন হবে যেন ভাবতে পারিনি। কোথায় কত দূরে টাকা-আনা-পয়সার মধ্যে ডুবে রয়েছি, হঠাৎ কে যেন আমার সমস্ত গোলমাল করে দিলে। এক মুহূর্তে যেন আবার বৌবাজারের গলির মধ্যে সেই দিনগুলোর মধ্যে ফিরে গেলাম। মনে হলো— এখনও যেন সময় আছে, এখনও যেন বেশি দেরি হয়নি।

সেই রাত্রেই ইরাকে একটা চিঠি লিখে দিলাম। চিরিমিরির কোলিয়ারির সেই রাত্রের অন্ধকারে কোথা থেকে যেন একরাশ আবেগ আমার মনে ভিড় করে এল। আমি লিখলাম— আমার সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষ করে দিলাম আমার চিঠির মধ্যে। আমার সমস্ত জমানো কান্না যেন কলমের মুখে এসে অবিশ্রান্ত ধারায় নিঃসারিত হয়ে গেল। আমি চিঠি লিখতে লিখতেই কাঁদলাম। দরজা বন্ধ ঘরের মধ্যে গভীর রাত পর্যন্ত আমার চোখে বিনিদ্র কান্না গুমরে গুমরে উঠতে লাগলো। আর আমার কান্নায় চিরিমিরির সমস্ত অন্ধকার যেন এক নিমেষে আলোয় রূপান্তরিত হয়ে গেল। আমি কাঁদলাম—আর আমার কান্নায় আমার সমস্ত বিগত জীবন এক নতুন অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে এল। আমি কাঁদলাম—আর আমার কান্নায় মনের সমস্ত অভিযোগ সমস্ত অভিমান নিঃশেষে নিরুত্তাপ হয়ে এল। আমি কাঁদলাম—আমি ক্ষমা করলাম—আমি পুনর্জন্ম পেলাম।

ইরা আবার লিখলে—আমি যাচ্ছি—

সে' কদিন কী উদগ্রীব প্রতীক্ষা! প্রতীক্ষায় শুনেছি কারো কারো ক্লান্তি আসে। আমি যত প্রতীক্ষা করি তত উদ্বেগ বাড়ে। প্রতিদিন সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন নতুন করে প্রাণ পাই। আমি যেন নিজেকে আরো বেশি করে অনুভব করতে পারি। আমি যেন বেশি করে বাঁচি, বেশি করে ক্ষমা করি—বেশি করে ভালবাসি। আমার সমস্ত অনুভূতি যেন বেশি করে সজাগ হয়ে ওঠে। আমি

যেন আরো সজীব হই। আমার বয়েস যেন আরো কমে যায়। আমি যেন নতুন করে নিঃশ্বাস গ্রহণ করি!

সেদিন ছুটি নিলাম।

এত বছরের মধ্যে আমাকে কেউ বিশ্রাম নিতে দেখেনি কখনও। আমার কখনও ছুটি নেবার দরকার হয়নি। আমার কখনও নিঃশ্বাস ফেলবারই সুযোগ হয়নি।

সবাই অবাক হয়ে গেল। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

সকলের মুখেই এক কথা। কুলি-কামীন, লোডার, লিফট্‌ম্যান, ফোরম্যান, ইঞ্জিনীয়র, প্রত্যেকের মুখে এক কথা! লালবাবু ছুটি নিয়েছেন!

লালবাবুর ছুটি নেওয়াটাও যেন সকলের চোখে বিস্ময়। যে লোক প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাত পর্যন্ত কাজের ঘূর্ণির মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে তৃপ্তি পেত, তারও বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন হয়,তাহলে? তারও তাহলে ক্লান্তি আছে? তারও তাহলে ছুটির দরকার থাকে?

চাকর-বাকর, খানসামা, বয়, আর্দালী কারোর সেদিন আর বিশ্রাম হলো না।

সকাল থেকে তাদের অনেক কাজ! মালিকে বাগান নিখুঁত করে পরিষ্কার করতে হলো। সামনের বাগানের দিকে কখনও চেয়ে দেখিনি আগে—সেদিন প্রথম চেয়ে দেখলাম। ইরাকে কেমন মানাবে এখানে, কেমন করে দু'জনে দু'খানা চেয়ার নিয়ে বাগানের মাধবীলতার ঝাড়টার তলায় বসবো তাই-ই কল্পনা করে নিলাম। শোবার ঘরের জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যায় অনেক দূর পর্যন্ত, সেইখানে এসে দাঁড়ালাম। আকাশের সূর্য যখন সোনালি-লালে পূব দিকে উঠবে, তখন এই বিছানায় ইরাকে কেমন মানাবে, তাই-ই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। দেখলাম বাড়িটার চারপাশে ঘুরে ঘুরে। নতুন কোয়ার্টার।

চিরিমিরির সবচেয়ে ভালো কোয়ার্টার আমার। ম্যাক্‌ফার্সন্‌ সাহেব আমার কোয়ার্টারটা স্পেশাল টাইপের করে তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। সামনের বারান্দায় দাঁড়ালে অনেক দূরে নিচের সমতল জায়গাটা সমস্ত দেখা যায়—সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলাম।

সমস্ত আয়োজন নিখুঁত হয়েছে, সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে।

সন্ধ্যেবেলা অনুপপুর স্টেশনে এসে ট্রেন থামবে। সেখান থেকে অফিসের গাড়ি করে ইরাকে নিয়ে আসতে হবে।

এদিককার সব ব্যবস্থা দেখে শুনে আমি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

অনুপপুর স্টেশনের প্ল্যাটফরমের ওপর ট্রেনটা যেন আর আসে না! মনে হলো সন্ধ্যে যেন আর হবে না পৃথিবীতে।

আমার আর্দালী এসে জানালে—ট্রেন এক ঘণ্টা লেট—

ওয়েটিং রুমের ভেতরে বসে বসে এতক্ষণে যেন আমার প্রথম ক্লান্তি এল!

আরো এক ঘণ্টা! আরো এক শতাব্দী! আরো এক কল্পকাল!

ইরা আসছে! ইরা আসছে!! ইরা আসছে!!!

এক ঘণ্টাই হোক আর এক শতাব্দীই হোক, কিম্বা এক কল্পকালই হোক, ইরা তো আসছে! ইরা তো এসে পৌঁছোচ্ছে! ইরা তো এসে গেল বলে! তারপরে সত্যি-সত্যিই এক সময়ে ট্রেন এল! অন্ধকার প্ল্যাটফরমে ততক্ষণে তেলের বাতিগুলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। টিমটিমে অন্ধকার ভেদ করে বিরাট একটা ইঞ্জিন অনেকদূর থেকে যেন ইরাকে টেনে আমার সামনে এনে দিলে।

এক মুহূর্তে আমি ভুলে গেলাম সব। আমার চোখের সামনে থেকে সেই গোলমাল, সেই স্টেশন, সেই জনতা সব যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

ইরা ট্রেন থেকে নামতে যেতেই আমি তার হাত ধরে প্ল্যাটফরমে নামিয়ে দিলাম।

ইরা বললে—প্ল্যাটফরমটা কী নিচু লালুদা—

বললাম—তাই তো তোমাকে ধরলাম—

ইরা বললে—বড্ড অন্ধকার তো চারদিকে—

বললাম—সকালের গাড়িতে এলে না কেন ?

ইরা বললে—আমি জানতাম না—তা ছাড়া তখন আর সময়ও ছিল না—

বললাম—ট্রেনে তোমার কষ্ট হয়নি তো ?

ইরা বললে—না—

বললাম—এখান থেকে আরো চল্লিশ মাইল যেতে হবে—

ইরা বললে—কী করে যাবো ?

বললাম—আমি যেমন করে যাবো, তুমিও তেমনি ভাবেই যাবে ! তুমি কি ভাবছো তোমাকে ফেলে চলে যাবো আমি ?

আমি হাসলাম। ইরাও হাসতে লাগলো।

তারপর সেই জঙ্গলের রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ি চলতে লাগলো। সামনে ফ্লাড-লাইট জ্বলছে। সামনের সীটে ড্রাইভার আর আমার আর্দালী।

আর পেছনের সীটে আমি আর আমার পাশে ইরা !

বললাম—রাস্তাটা খুব খারাপ, তোমার খুব কষ্ট হবে ইরা—

ইরা বললে—এতদিন তো খুব কষ্ট সহ্য করেছি, না-হয় আর একটু কষ্টই হলো—

বললাম—তবু আমার এখানে এসে তুমি কষ্ট পাবে, এটা আমার ভালো লাগে না ভাবতে—

ইরা বললে—তোমাকেও তো অনেক কষ্ট দিয়েছি আমি এক সময়ে—আজ না-হয় তুমিই একটু কষ্ট দিলে আমাকে! না-হয় শোধবোধই হয়ে যাক—

বললাম—সে-কথা এখন না-ই বা তুললে !

ইরা বললে—কিন্তু পুরোন কথাগুলোই যে আজকে আমার বেশি করে মনে পড়ছে লালুদা—

বললাম—তুমি তো এত সেন্টিমেণ্টাল ছিলে না আগে!

ইরা বললে—আগেকার আমার সঙ্গে এখনকার আমার তুলনা কোরো না তুমি—

বললাম—অন্ধকারে ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না তোমাকে, কিন্তু যেটুকু দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হয় তোমার চেহারা অনেক বদলে গেছে—

ইরা হাসলো।

বললে—চেহারাটা বাইরে থেকে দেখা যায় বলেই তাই তোমার অমন মনে হচ্ছে—

বললাম—চেহারার সুবিধেও তাই, অসুবিধেটাও যে তাই—

ইরা বললে—তুমি শুধু আমার চেহারাটাই দেখলে লালুদা—

বললাম—কী করবো বলো, চেহারাটাই চোখে দেখা যায়, আর কিছু তো চোখে দেখা যায় না—

হঠাৎ গাড়িটা একটু ঝাঁকুনি দিতেই সবাই লাফিয়ে উঠেছি। ইরা টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল আমার গায়ের ওপর, আমি সেই মুহূর্তে তাকে ধরে সামলে নিয়েছি।

ইরা বললে—কী রাস্তা তোমাদের এখানে লালুদা—গায়ে ব্যথা হয়ে গেল!

বললাম—আর বেশিদিন কষ্ট করতে হবে না—এখানে রেল-লাইন হবার কথা হচ্ছে—

ইরা হাসলো।

বললে—ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না লালুদা—আমি বুড়ো হয়ে যাবো—

আমিও হাসলাম।

বললাম—তুমি বুড়ো হলে, আমারই কি বয়েস বাড়বে না বলতে চাও? আমিও তো বুড়ো হয়ে যাবো ইরা—

ইরা বললে—মনে পড়ে লালুদা সেই সব দিনের কথা?

বললাম—তোমার ?

ইরা বললে—মনে পড়ে বলেই তো এসেছি, নইলে চিঠি লিখে যেচে আসতুম নাকি ?

বললাম—একদিন কী কাণ্ড হয়েছিল জানো ?

ইরা বললে—কী ?

বললাম—একদিন বাসে যাচ্ছিলাম, দেখি তুমি যাচ্ছো সেই একই বাসে। তোমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে এগিয়ে গিয়ে যেই তোমার নাম ধরে ডেকেছি তোমাকে, দেখি তুমি নও—মীরা—

ইরা বললে—ছোটবেলায় লোকে আমাদের যমজ-বোন মনে করতো—

বললাম—দেখো, এতদিন স্বপ্ন বিশ্বাস করতাম না—

ইরা আমার দিকে মুখ ফেরালে।

বললে—এখন ?

বললাম—এখন করি। তোমার চিঠি পাবার আগের দিন রাত্রে তোমাকে স্বপ্ন দেখেছিলাম—শুনেছি শেষ রাত্রের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়—দেখ, স্বপ্ন সত্যি হলো তো শেষ পর্যন্ত !

ইরা আবার হাসলো।

বললে—খারাপ স্বপ্নগুলোই সত্যি হয়, ভালো স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না। আমিও অনেক স্বপ্ন দেখতাম—

বললাম—আমাকে ?

ইরা হাসলো।

বললে—বলবো না তো !

বললাম—তোমার বুঝি ভয় করছে ইরা ? এখনও বিশ্বাস করতে পারছো না বুঝি ?

ইরা বললে—সত্যিই ভয় ছিল আমার—শুনেছিলাম তুমি নাকি খুব বড়লোক হয়েছ, হয়ত আমার সঙ্গে আর তেমন করে কথা বলবে না ভেবেছিলাম—

বললাম—এখন ?

ইরা বলে যেতে লাগলো—কিন্তু কত কষ্ট করে যে তোমার ঠিকানা যোগাড় করেছি তা যদি জানতে ! এমন জায়গায় চাকরি নিয়েছ তুমি, যে কেউ বলতে পারে না তোমার ঠিকানা—

বললাম—একদিন তোমার ঠিকানা বার করতেও আমার খুব কষ্ট করতে হয়েছিল—এখন শোধবোধ !

ইরা হাসতে লাগলো।

অনেক পাহাড় পেরিয়ে, অনেক জঙ্গল, নদী, সাঁকো অতিক্রম করে চিরিমিরিতে পৌঁছলাম।

তখন অনেক রাত। চারদিকে পাহাড়ের বেষ্টনী। কোলিয়ারীর আলোগুলো ওপর নিচেয় হীরের মত অন্ধকারের বুকে জ্বলছে। মাথার ওপর খোলা আকাশ। আকাশেও তারার ঝকমকানি। এ এক বিচিত্র জগৎ। বিশেষ করে নতুন লোকের পক্ষে।

ইরা চারদিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। অপলক চোখে দেখতে লাগলো সব। দেখা যেন আর শেষ হয় না।

বললে—তুমি এখানে থাকো লালুদা ?

বললাম—কেন ?

ইরা বললে—এত চমৎকার জায়গা !

তারপর আমার কোয়ার্টার্সের ভেতর এসে চারদিকে চেয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো ইরা। যা দেখে তাতেই অবাক হয়ে যায়।

বললে—এ কি, বাড়িতে আর কেউ নেই ?

বললাম—কেন ? আর কে থাকবে ?

ইরা বললে—তুমি একলা এত বড় বাড়িতে থাকো ?

বললাম—কী করবো বলো, কেউ তো থাকতে চায়নি আমার কাছে !

ইরা আমার মুখের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসল।

তারপর বললে—এ তোমার বাগান ?

বললাম—আমার নয়তো কার ?

ইরা আমার শোবার ঘরে ঢুকে বললে—তুমি এত চমৎকার করে সাজিয়ে রেখেছ তোমার ঘর ?

তারপর পাশের ঘরে গিয়ে বললে—আর এ-ঘরটা ? এ-বিছানায় কে শোয় ?

বললাম—কেউ শোয় না।

ইরা বললে—তা হলে বিছানাটা কার জন্যে ?

বললাম—তোমার জন্যে !

ইরা হাসলো। আমিও হাসলাম।

বললাম—পাশেই তোমার বাথরুম, দেখ, তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক রাখিনি।

ইরা বললে—সম্পর্ক রাখতে ভয় করে বুঝি ?

বললাম—আমার ভয় নয়, তোমার ভয়ের জন্যেই বলছি—

ইরা বললে—তুমি দেখছি সেই সব পুরনো কথা এখনো মনে করে রেখে দিয়েছ—

বললাম—মনের ওপরে তো মানুষের হাত নেই—

খানিক থেমে বললাম—যাক্‌গে, আর কথা কয়ে লাভ নেই—অনেক রাত হয়ে গেছে—এবার তুমি নিশ্চয় ক্লান্ত খুব—

খাওয়া-দাওয়ার পর ইরাকে তার শোবার ঘরে নিয়ে গেলাম।

বললাম—নতুন জায়গায় তোমার ঘুমোতে হয়ত অসুবিধে হবে—

ইরা বললে—জায়গাটা নতুন হোক, কিন্তু তুমি তো পাশের ঘরেই থাকবে। তাহলে আমার ভয় কীসের !

বললাম—তবু যদি দরকার বোঝ তো এই বোতামটা টিপো—কেউ-না-কেউ হাজির হবেই—

ইরা শুতে গেল।

বললাম—এই টর্চটা রেখে দাও বালিশের নিচেয়—দরকার হলে হয়ত সুইচ খুঁজে পাবে না !

তারপর আমি আমার নিজের ঘরে চলে এলাম।

সে-রাত্রে আমি কি ঘুমিয়েছিলাম ? আজো এক-একবার মনে সন্দেহ হয়, আমি কি ঘুমিয়েছিলাম সে-রাত্রে ? ঘুম মানে যদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিশ্রাম হয় তো আমি মোটেই ঘুমোই নি সে-রাত্রে! কেবল মনে হয়েছে---ইরা আমার পাশের ঘরেই রয়েছে। এক ছাদের তলায়, এক বাড়ির আওতার মধ্যে, একই জায়গায় একই আবহাওয়ার সীমার ভেতরে। অথচ ডেকেও যার সাড়া পাইনি একদিন, না-ডাকতেই সে কেন এল! তবে কি সেদিন আমি ভুল বুঝেছিলাম!

মনে আছে কলকাতা ছাড়ার পর থেকে আমি আর কোনও সম্পর্কই রাখিনি মাসীমাদের সঙ্গে। রাখবার ইচ্ছে হয়ত প্রথম প্রথম হয়েছিল। প্রথম-প্রথম হয়ত একটু মন কেমন করতো। একটু ফিরে যেতে ইচ্ছে করতো কলকাতায়। কলকাতায় মানে ইরার কাছে। কিন্তু কাজের নেশায় ডুবলাম প্রথমে, তারপর টাকার নেশায়। টাকার নেশাই ভয়ানক নেশা। সব ভুলিয়ে দেয় মানুষকে। প্রতিদিনের হিসেব মেলাতে গিয়ে প্রথম-প্রথম চমকে উঠতাম। আর শুধু তো টাকা নয়। কলকাতায় যে-অবহেলা, যে-তাচ্ছিল্য, যে-অবজ্ঞা পেয়েছি তারপর হঠাৎ এখানে এসে এত প্রীতি, এত প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি—সব যেন আমাকে অন্যমানুষ করে দিলে।

সত্যিই আমি অন্যমানুষ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার কলকাতার কথা মনে পড়লেই মনে পড়তো আমার দারিদ্র্যের কথা, আমার অসহায়তার কথা। আর কে-ই বা ছিল কলকাতায় যার জন্যে বিচ্ছেদ অনুভব করবো। যাদের চেয়েছিলাম একান্ত করে, তারাই তো আমাকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। তারাই তো আমাকে পর করে দিয়েছিল।

ভোরের দিকে বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ জেগে উঠে দেখি বেশ বেলা হয়ে গেছে।

ইরা সকালবেলাই উঠেছে। বাইরে আসতেই বললে—এ কি, এত দেরি করে ঘুম থেকে ওঠো নাকি?

বললাম—রাত্রে মোটে ঘুম হয়নি!

ইরা হাসলো।

বললে—দেখছি, তোমার কাছেই নতুন জায়গা হয়ে উঠলো!

বললাম—তুমি এলে তাই সবই নতুন ঠেকছে আমার কাছে—

ইরার চেহারাটা দিনের আলোয় অন্য রকম ঠেকলো। অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম ইরার মুখের দিকে।

ইরা দেখতে পেয়ে বললে—কী দেখছো অমন করে?

বললাম—তোমাকে যেন অন্যরকম দেখাচ্ছে ইরা—

ইরা হেসে গড়িয়ে পড়লো।

বললে—তুমি অবাক করলে লালুদা, তুমি কি আজ আমাকে নতুন দেখছো?

বললাম—না, তা নয়—বোধহয় অনেকদিন পরে দেখছি বলে এই মনে হচ্ছে—

ইরা বললে—কাল সন্ধ্যেবেলা থেকে তো দেখছো আমায়—

বললাম—অন্ধকারে তো ভালো করে দেখা যায়নি তোমায়!

ইরা বললে—তা নয়—

জিজ্ঞেস করলাম—তবে কীসের জন্যে বলো তো?

ইরা হেসে বললে—তোমার চোখই অন্যরকম হয়ে গেছে!

ততক্ষণে চা দিয়ে গেছে টেব্‌লে।

ইরা চা ঢালতে ঢালতে বললে—আজকে অফিস নেই তোমার?

বললাম—তুমি এলে এখানে আর আমি অফিসে যাবো?

ইরা বললে—ছুটি নিয়েছ বুঝি?

বললাম—জীবনে এই প্রথম ছুটি নিলাম—এখানকার সবাই অবাক হয়ে গেছে আমার ছুটি নেওয়া দেখে—তারা তো জানে না…

ইরা যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল হঠাৎ। বাইরের বাগান আর নিচের সমতলের দিকে চেয়ে উদাস হয়ে গেছে।

বললাম—কী হলো তোমার!

ইরা বললে—সত্যি, জায়গাটা বড় চমৎকার লাগছে—ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না—

বললাম—ফিরে যাবার জন্যেই এতদূরে এলে বুঝি?

ইরার মুখে ম্লান হাসি দেখা গেল।

আবার বললাম—ফিরেই যদি যাবে তো এলে কেন তাহলে?

ইরা একটুখানি চুপ করে থেকে বললে—শেষকালে যদি তোমার খারাপ লাগে?

বললাম—খারাপ লাগবার দায়িত্ব আমার—তোমার ভালো লাগবে না তাই বলো।

ইরা বললে—যখন ছোট ছিলাম, কিছুই বুঝতাম না। অনেক অবিচার করেছি অত্যাচার করেছি সকলকে—তখন না-বুঝেই করেছি—এখন ভাবলে কষ্ট হয়—

চোখ দু'টো ছলছল করে এল ইরার।

তাড়াতাড়ি সে-প্রসঙ্গ ঢাকবার জন্যে বললাম—তৈরি হয়ে নাও—বেড়াতে যেতে হবে—

মনে আছে কী ঘোরাটাই না ঘুরেছিলাম ক'দিন। চিরিমিরি পেরিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটে চললো সেদিন। কেবল আমি আর ইরা। সঙ্গে কেউ নেই। অফিসের নতুন গাড়ি। শাল আর মহুয়ার জঙ্গল পেরিয়ে একটা ঝরনার ধারে গিয়ে বসি দু'জনে। আবার সেখান থেকে উঠে পড়ি, আবার চলি। মাঠ-ঘাট পেরিয়ে আবার এক পাহাড়ের তলায় গিয়ে বসি। গাছের তলায় শুয়ে পড়ি। আবার যখন দু'চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে তখন ফিরি কোয়ার্টারে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত যেন ঝড়ের বেগে উড়িয়ে চলি। আর আমাদের ঘোরা যেন ঝড়কেও অতিক্রম করে চলে।

ইরা বলতো—আমি এখানে এসে তোমার কাজের ক্ষতি করে দিচ্ছি কেবল—

বলতাম—একটু ক্ষতি হওয়া ভালো ইরা, তাতে লাভের মর্যাদা বাড়ে—

ইরা বলতো—কিন্তু পরে তো আমাকেই দোষ দেবে ?

আমি বলতাম—ক্ষতি কী ! এতদিন যে কষ্ট দিয়েছ তার জন্যে না-হয় একটু প্রায়শ্চিত্তই করলে !

ইরা বলতো—তুমি কি আমাকে এখনও ক্ষমা করোনি ?

তারপর চলতো মান অভিমানের পালা। ইরা ঝরনার ধারে বসে বসে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতো জলের ওপর—আর আমি দেখতাম।

শেষে একদিন চিরিমিরি শহরে সবাই জেনে গেল লালবাবু এতদিন পরে বিয়ে করছে। খবরটা বিদ্যুতের গতিতে ছড়িয়ে পড়লো কোলিয়ারি মহলে। বিয়ে করার পর লম্বা ছুটি নেবো। তাতে তাদের আশ্বস্ত হবারই কথা।

আমি বলতাম—তোমার ডাক্তারি পাশ করা সব ভস্মে ঘি ঢালা হয়ে গেল ইরা—

ইরা বললে—তা হোক, পাশ করেছি বলে যে ডাক্তারিই করবো তার কি মানে আছে !

বললাম—লোকে বলবে লালবাবু বিয়ে করে বউকে ঘরে বন্দী করে রেখে দিয়েছে—

ইরা বললে—লোকে তো বন্দী হবার সুখটা জানে না—

বললাম—চলো তা হলে কলকাতায় যাই—

ইরা যেন ভয় পেয়ে গেল।

বললে—কেন ?

বললাম—এই জঙ্গলের মধ্যে তেমন জাঁক-জমক হয়ত হবে না—

ইরা বললে—জাঁকজমক না হোক, তোমাকে তো পাবো—

বললাম—কিন্তু সেখানে মাসীমা আছেন, মেসোমশাই আছেন, তাঁরাও দেখে খুব খুশী হতেন—

ইরা বললে—তুমি আমাকে পাবে, আমি তোমাকে পাবো—এর চেয়ে বড়-পাওয়া আর কী আছে?

বললাম—আর তা ছাড়া, দোকান-পাট হোটেল সিনেমা—কিছুই যে নেই এখানে—

ইরা বললে—না-ই বা রইল কিছু—তুমি তো আমার রইলে।

শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো। আয়োজন অনুষ্ঠানে কিছুই কমতি হলো না। কাটনি থেকে ফুল এল, বিলাসপুর থেকে মাছ এল, পাশের গ্রাম থেকে পুরুত এল। অনাহূত রবাহূত সকলের আদর অভ্যর্থনা হলো। চিরিমিরির লালবাবু বিয়ে করছে—এ-খবর পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত রটে গেল। বিরাট উৎসব হলো চিরিমিরিতে। সেদিন চিরিমিরির সমস্ত লোকজন এসে তাদের লালবাবুকে আর লালবাবুর স্ত্রীকে নতুন এক রূপে দেখতে পেলে।

মানুষের জীবনে এইখানেই হয়ত পূর্ণচ্ছেদ পড়ে। গল্প-উপন্যাসেরও সাধারণ পরিসমাপ্তি হয়ত এইখানেই ঘটে। কিন্তু এমন জীবনও আছে যা এর ব্যতিক্রম। এমন গল্প-উপন্যাসও আছে যা এর বিপরীত। আমি তখন নতুন এক জীবনের আস্বাদে বিভোর হয়ে আছি। আমার দিন-রাত্রি তখন নতুন সম্ভাবনায় উদ্বেল। আমি অফিসে যাই, কাজ করি, বিশ্রাম করি, সমস্ত যেন এক নতুন জীবনের প্রস্তুতি! আমি বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পেয়েছি। টাকা উপায় করার নতুন প্রয়োজন আবিষ্কার করেছি।

রাত্রে অন্ধকার বিছানায় শুয়ে ডাকি—ইরা—

ইরা উত্তর দেয়—উঁ—

আবার ডাকি—ইরা—

ইরা আবার উত্তর দেয়—উঁ—

বার বার ডেকে বার বার সাড়া পেয়েও যেন তৃপ্তি পাই না। মনে হয় অন্ধকারে ইরার গলার স্বর না শুনলে যেন নিঃসঙ্গ হয়ে যাবো—নিরুদ্দেশ হয়ে যাবো।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙবার আগে ডাকি—ইরা—

ইরার চোখে তখনও ঘুমের ঘোর।

বলে—উঁ—

সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে কাজ-কর্ম সেরে এসে চায়ের টেব্‌লে বসে ডাকি—ইরা—

ইরা মুখ তুলে চায়।

বলে—উঁ—

একদিন বললে—তুমি আমাকে অত নাম ধরে ডাকো কেন বার বার ?

বললাম—তোমার নামটা উচ্চারণ করে সুখ পাই—

ইরা বলে—আমার চেয়ে আমার নামটাই বড় হলো ?

বললাম—তোমার নামের সঙ্গে তুমি যে জড়িয়ে গেছ ইরা—

ইরা বলে—ইরা নামটা কি এতই ভালো ?

আমি বলি—ওর চেয়ে মিষ্টি নাম আর হয় না—

ইরা বলে—আমার নামটা আমার নিজের কিন্তু ভালো লাগে না—তুমি বদ্‌লে দাও আমার নাম, নতুন করে তুমি আমার একটা নাম রাখো—

বললাম—কেন ?

ইরা বললে—আমি যে নতুন !

বললাম—কী নামে ডাকবো বলো ?

ইরা বললে—আমাকে তুমি মীরা বলে ডেকো—

হেসে ফেললাম। ইরাও হাসলো।

বললাম—এত নাম থাকতে তোমাকে মীরা বলে ডাকবো কেন, শুনি ?

ইরা বললে—জানো, মীরা তোমায় সত্যি খুব ভালোবাসতো !

অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম —বলছো কি তুমি ?

ইরা বললে—সত্যিই বলছি, আমার ওপর সেই জন্মেই ওর অত হিংসে ছিল—সেই জন্মেই আমাকে ও বাড়ি থেকে তাড়িয়েছিল—

বললাম—সত্যিই বলছো ? কিন্তু আমি তো কোনওদিন টের পাইনি—

ইরা বললে—ও যে খুব চাপা মেয়ে, আমার মতন তো নয়—

বললাম—তুমি আমায় অবাক করে দিলে আজ ইরা—

ইরা বললে—ছোটবেলা থেকেই ওর হিংসে ছিল আমার ওপর, আমার যে রকম জামা হবে, ওরও সেই রকম জামা হওয়া চাই—দু'জনে তো এক বছরের ছোট বড় !

জিজ্ঞেস করলাম—মীরা এখন কী করছে জানো ?

ইরা বললে—সে আবার বাড়িতে ফিরে গেছে। বাবা-মাকে এখন সে-ই তো দেখছে—

বললাম—ভালো করেছে !

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি আর ওঁদের কখনও চিঠিপত্র দাওনি ?

ইরা বললে—আমি চিঠি দেবার কে বলো না, ওঁরা আমার কে ! আমার সঙ্গে ওঁদের কীসের সম্পর্ক, আমি তো ও-বাড়ির কেউ নই—

বলতে বলতে ইরার চোখ দু'টো আবার ছলছল করে উঠলো। আমি থেমে গেলাম।

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা আর্দালী এসে যাবতীয় চিঠি আমার চায়ের টেব্‌লে এসে দিয়ে যায়। ইরাই খোলে সে-গুলো বরাবর।

বলে—আমি খুলে দিচ্ছি, তোমাকে খুলতে হবে না—তুমি বরং চা খাও—

প্রত্যেকদিনই ওটা ওরই ডিউটি। চিঠিগুলো এক-এক করে খুলে দেখে নেয়। তারপর খোলা চিঠিগুলো আমার হাতে তুলে দেয়।

সেদিন বোধ হয় অনুপপুরের ট্রেন লেট ছিল। চিঠি এল দেরিতে।

চিঠি আসতেই ডাকলাম—ইরা—

ইরা তখন বাথরুমে। তার স্নান করার শব্দ পাচ্ছি বাইরে থেকে। চা খেতে খেতে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে দেখলাম। মনে হলো—অন্ধকারটা যেন অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশী গাঢ়। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। অন্ধকারের ওই গাঢ় রূপ আমার ভালো লাগে না। মনে হয় যেন আমার দম আটকে দেবে ও।

টেব্‌ল ল্যাম্পটার নিচে চিঠিগুলো পড়ে ছিল।

চায়ের কাপটা সরিয়ে রেখে চিঠিগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলাম।

হঠাৎ একটা চিঠির ওপরের লেখাটা যেন কেমন চেনা মনে হলো।

নিজেই খুললাম চিঠিখানা। খুলে চিঠিটার ওপর এক-নজর দিতেই আমার সমস্ত হৃদ্‌পিণ্ড যেন অসাড় হয়ে এল।

চিঠিটা লিখেছেন মাসীমা।

লিখেছেন—

বহুকাল পরে তোমার ঠিকানা পাইয়াছি। তুমি তো আমাদের একেবারেই ভুলিয়া গেছ। গত শনিবার তোমার মেসোমশাই গত হইয়াছেন। এই দুঃসময়ে একমাত্র ভরসা ইরা। ইরা ছিল বলিয়াই তিনি কতকটা শান্তিতে যাইতে পারিয়াছেন। এই সময়ে ইরা না থাকিলে আমি অনাথ হইতাম। সে শেষ-সময়ে ওঁর যথাসাধ্য সেবা করিয়াছে। অর্থ দিয়া সামর্থ্য দিয়া সাহায্য করিয়াছে। ইরা না থাকিলে যে কি হইত তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। মীরার আর

কোনও সংবাদ নাই। তাহাকেও সংবাদ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল—কিন্তু সে ডাক্তারি পাশ করিয়া নাকি কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কেহ তাহার সন্ধান দিতে পারিল না…

লালবাবু হঠাৎ থামলেন।

বললাম—তারপর?

লালবাবু বললেন—তারপর আর কী! তারপর কোথায় রইল আমার কোলিয়ারী, কোথায় রইল চিরিমিরি—আমার এই ব্যবসাটা ছিলই আগে থেকে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই ঠিকেদারিই করছি সেই থেকে—

জিজ্ঞেস করলাম—আর মীরা?

লালবাবু বললেন—তাকে তো দেখলেন, ওই যে রাস্তায় দেখলেন লেডী ডাক্তার! এই এখানেই লেডী-ডাক্তারের চাকরি নিয়ে আছে—আমিও কথা বলি না, ও-ও কথা বলে না—

তারপর হঠাৎ যেন খেয়াল হলো।

চীৎকার করে উঠলেন—ওরে, কোথায় গেলি রে বেটারা—রাত হলো যে, খাবার দিবি না—? কাল আবার ভোরবেলা উঠতে হবে আমাকে, তবে আজকে আর আপনার কথামৃতটা পড়বো না মশাই, ওটা পড়লে আর ঘুম আসবে না আমার!—কই রে—

ইরার কথা বললাম। এবার সবিতার কথা বলি।

চুঁচড়োর একটা মাদ্রাসায় সভা হয়েছিল। বক্তৃতা জলযোগ সেরে যখন ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি হঠাৎ এক মহিলা আমার রাস্তা আটকে দাঁড়ালেন।

বললেন—নমস্কার, আপনি হয়ত চিনতে পারবেন না আমাকে—

সত্যিই চিনতে পারলাম না।

বললাম—কোথায় দেখেছি বলুন তো ?

মহিলাটি বললেন—থাক, আমায় আর আপনার চিনে দরকার নেই,—লাভও নেই কিছু—

তারপর একটু থেমে বললেন—কিন্তু আমি আপনাকে ঠিক চিনেছি, তবে আপনার যে ছুটো নাম আছে তা আজ প্রথম জানলাম।

ছুটো নাম! কিন্তু আমার তো একটাই নাম। বাঁপ মায়ের দেওয়া নামটাই তো সর্বত্র ব্যবহার করি। ইস্কুল ইউনিভার্সিটিতে, মাসিক-সাপ্তাহিকে, কিংবা বইতে সেই নামটাই তো লিখি। আর আমার তো কোনও ছদ্মনামও নেই যে সে-নামেও লোকে চিনতে পারবে।

মহিলাটি বললেন—আজকে আপনি হয়ত ভুলেই গেছেন সে-সব দিনের কথা! ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক—

বিব্রত হলাম একটু, বললাম—অন্ধকারে হয়ত ঠিক চিনতে পারছি না—

মহিলাটি বললেন—চিনতে না পারলেই তো আপনার সুবিধে আজ—

সভার গেটের কাছে আশে-পাশে কিছু লোকজন আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল এইভাবে কথা বলতে। আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম রাস্তার দিকে। সভার উদ্যোক্তারা সঙ্গে সঙ্গে চলছিলেন। তাঁদের সঙ্গেই কথা বলে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলাম। এখানকার গণ্যমান্য ব্যক্তি আমি, দশজনের সামনে হয়ত মহিলাটি কী বলতে কী বলে ফেলবেন কে জানে! চোখের একপাশ দিয়ে লক্ষ্য করলাম মহিলাটি তখনও সঙ্গ ত্যাগ করেননি। মুখ নিচু করে আমাদের সঙ্গেই চলেছেন।

দু-একজন ছেলে-মেয়ে অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। সেই অন্ধকারেই তাদের খাতায় কিছু কিছু লিখে দিচ্ছি আর একটু একটু করে এগোচ্ছি।

এখান থেকে পাশের এক ভদ্রলোকের বাড়িতে জলযোগের আয়োজন হয়েছে! সেখানে গিয়ে কিছুক্ষণ বসলাম। জলযোগের সময় অনেকে ঘিরে দাঁড়ালো। কেউ কেউ এই সুযোগে সেই পুরনো প্রশ্নটাই করলে—আপনার 'সাহেব বিবি গোলামে'র ঘটনাটা কি সত্যি?

একজন জিজ্ঞাসা করলে—ভূতনাথ কি এখনও বেঁচে আছে?

আর একজন বললে—আসলে কোন্ বাড়িটার গল্প আপনি লিখেছেন? বাড়িটা কোন্ রাস্তায়—

লক্ষ লক্ষ বার এ-সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। চিঠির জবাবেও লিখে জানিয়েছি। কিন্তু এখনও যে আরো কত দিন ধরে কত লোককে এর জবাবদিহি করতে হবে কে জানে। ভেবেছিলাম এতক্ষণে বোধহয় মহিলাটিকে এড়াতে পারবো। কিন্তু রসগোল্লাটা মুখে পুরতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়লো এককোণে তিনি তখনও দাঁড়িয়ে আছেন।

চোখের দৃষ্টি দেখে ভয় পেলাম। যেন চোখ দিয়ে বলতে চাইছেন—আপনার যে দুটো নাম আছে তা আগে বলেননি কেন?

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালাম। সকলকে বললাম—চলুন—

নিজে বুঝতে পারলাম না কেন এত ভয় করতে লাগলো। অচেনা মহিলা। কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়লো না। ভালো ভালো কথা ভালো করে বলেছি। কোথাও কেউ গোলমাল করেনি। মন দিয়ে শুনেছে সবাই। তবু একজনের জন্যে, একজন মহিলার জন্যে কেমন যেন আতঙ্ক হতে লাগলো। কে এই মহিলা! আমাকে চিনলেন কী করে! কোনওদিন কোনও সূত্রে তো এঁকে

দেখেছি বলে মনে পড়লো না। সারা জীবন তো মহিলাদের সঙ্গ এড়িয়েই চলেছি। অনেক মহিলা দেখা করতে চিঠি দিয়েছেন, অনুরোধ জানিয়েছেন পরিচয় করতে, কিন্তু কোনওদিন তো রাজী হইনি। বার বার সে-অনুরোধ নানা ছুতোয় এড়িয়েই তো গিয়েছি! তবে?

জীবনের নানা অবস্থায় আমাকে নানা চরিত্রের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। আমার কোনও খুঁত নেই, আমার কোনও কলঙ্ক নেই, এমন কথা জোর গলায় বলতে পারার জোর অবশ্য নেই আজ। কিন্তু ঠিক জীবনের এই পর্যায়ে সে-খুঁত সে-কলঙ্ক কেউ জানুক এও আমি আর চাই না। যারা আমাকে আগে দেখেছে, অনেক আগে, যখন আমি অখ্যাত অবজ্ঞাত ছিলাম, অবাধে যেখানে সেখানে বিচরণ করতাম,—তাদের সঙ্গে আজ দেখা হয় এটা আমার ইচ্ছে নয়। আমার আগেকার অবস্থার কথা ভুলে যাক সবাই, আমার বর্তমান অবস্থাটাই সত্যি হোক, এই-ই আমি চেয়েছি। পুরনো অতীতের সমস্ত জীবনটার ওপর আমি তো বার বার যবনিকাই টানতে চেয়েছি!

সঙ্গীর দল সঙ্গেই ছিল। আমাকে ঘিরে ছিল তারা। তাদের আবরণের মধ্যে নিজেকে আড়াল করেই চলছিলাম। একলা থাকতে সত্যিই যেন ভয় করছিল। কিন্তু হঠাৎ চোখটা ফেরাতেই আবার দেখি সেই মহিলাটি! আমার দিকেই চেয়ে আছেন।

একজনকে আড়ালে ডেকে কানে কানে জিজ্ঞেস করলাম—উনি কে? চেনেন ওঁকে?

ছেলেটি তার দিকে দেখে বললে—উনি তো এখানেই থাকেন—সিনেমা হাউসটার পাশের বস্তিতে—

—কিন্তু উনি আমাদের সঙ্গে চলেছেন কেন?

ছেলেটি বললে—ওঁর অবস্থা বড় খারাপ হয়ে গেছে আজকাল—

ছেলেটি আর কিছু বলবার আগেই রাস্তায় এসে পড়লাম। গাড়ি তৈরি। এই গাড়িতেই সোজা কলকাতায় পৌঁছে দেবে

আমাকে। থমকে দাঁড়ালাম। আবার যেন ভয় করতে লাগলো। মনে হলো এদের সকলকে চারদিকে রেখে যেন গাড়িতে উঠে ভালোয় ভালোয় দরজাটা বন্ধ করে দিতে পারি। তারপর একবার গাড়িটা চলতে আরম্ভ করলে আর ভয় নেই!

কিন্তু হঠাৎ মহিলাটি এবার সকলকে সরিয়ে দিয়ে একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। মনে করতে চেষ্টা করলাম কবে নিজের আসল নাম ভাঁড়িয়ে চুঁচড়োর সিনেমা হাউসের পাশের বস্তির মধ্যে এসেছি। হয়ত আমারই মত চেহারার অন্য কেউ। অন্য কাউকে হয়ত ঠিক আমারই মত দেখতে। সে হয়ত কোনও ভাবে ঠকিয়ে গেছে এঁকে। ভুল নাম ভুল ঠিকানা বলে কোনও সুবিধে আদায় করেছে অন্যায় ভাবে। কিন্তু তবু আমার ভয় করতে লাগলো কেন? আমার মনে যদি কোনও পাপ না থাকে তো কেন আমি ভয় পেলাম এমন করে? এই এতগুলো ছেলের সামনে কি আজ সত্যিই বে-ইজ্জৎ হয়ে যাবো? ছি ছি রব উঠবে সারা দেশময়?

মহিলাটি হঠাৎ বললেন—পালিয়ে যাবেন না—বলুন—জবাব দিন, আপনার কটা নাম?

সমস্ত আশে-পাশের লোক হাঁ হাঁ করে উঠেছে। এক মুহূর্তে যেন একটা প্রলয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেল। কিন্তু সেই একটি মুহূর্তেই যেন আমি বিশ্ব-পরিক্রমা করে নিলাম।

একটি মুহূর্ত বটে! কিন্তু ওই গলার শব্দ যেন আমার জীবনের সমস্ত অতীত মুহূর্ত-সমষ্টিকে একেবারে ম্লান করে দিলে। মনে হলো আমার খ্যাতি নেই, আমার অর্থ নেই, নিতান্ত অবজ্ঞাত অবহেলিত একজন মানুষ একটি সামান্য মেয়ের কৃপাপ্রার্থী হয়ে এই চুঁচড়োর মাদ্রাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার গলায় ফুলের

মালা, আমার এই ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় সব যেন মিথ্যে! আমি প্রতারক, আমি ভণ্ড! আমার সব মনে পড়ে গেল।

অনেক দিন আগে!

অনেক দিন আগের কথা কি এমনি করেই মনে পড়তে হয় আর এই এমনি অবস্থায়!

তখন কি জানতাম একদিন এমনি করে আমার কাছে কেউ জবাবদিহি চাইবে! এমনি করে এত লোকের সামনে আবার সে-অপকীর্তির জবাবদিহিও করতে হবে! আর তা জানলে কি এখানে, এই চুঁচড়োর মাদ্রাসাতে সভা করতে আসার মত্ই দিতাম। কেই বা জানতো এত জায়গা থাকতে বিপিনবাবুর মেয়ে এই চুঁচড়োতে এসে উঠেছে! এই চুঁচড়োর সিনেমা হাউসের পাশের বস্তিতে!

বিপিনবাবুকে আমি চিনতাম না।

আমিও চিনতাম না, বলাইও চিনতো না। কোথায় তাঁর বাড়ি, কেমন বাড়ি, কী তাঁদের অবস্থা—তাও জানতাম না। চিনতো নিকুঞ্জ। নিকুঞ্জই এসে নানারকম খবরাখবর দিতো।

তখন আমরা শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের একটা মেসে থাকি। আমি, বলাই আর নিকুঞ্জ। তিনজনে একটি ঘরের মধ্যে তিনটে তক্তপোষে শুই। বলাই বেশি রাত জাগতে পারে না। রাত দশটা বাজতে না বাজতেই ঘুমিয়ে পড়ে।

নিকুঞ্জ মাঝরাতে হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে ডাকে—দাদা, ঘুমোলেন নাকি?

নিকুঞ্জ জানতো আমার ঘুম আসতে দেরি হয়। নিকুঞ্জ আর আমি শুয়ে শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত আকাশ-পাতাল এলোপাথাড়ি ভাবি। তখন মনটাও খুব চঞ্চল ছিল। লেখক হবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু লেখা আসতো না আমার। যা বলতে চাই তা প্রকাশ করতে পারতাম না ঠিক মতন। সমস্ত দিন কলকাতার রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতাম।

মাঠে মনুমেণ্টের তলায় গিয়ে অকারণে বসে থাকতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সে-সব যুদ্ধের আগেকার কথা। কোনও বৈচিত্র্য নেই কোথাও। হয়ত এক একদিন কোথাও বেরুলাম না। কলেজ কামাই করে চুপচাপ শুয়ে পড়ে রইলাম তক্তপোশের ওপর। পাশের বাড়ির জানালায় একটা কাক কা-কা করে চিৎকার করে ডাকছিল, তাকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার ফিরে এসে শুই। মেসের অন্য সব লোক যে-যার কাজে বেরিয়ে গেছে। নিচের কলতলাতেও ঝি-এর বাসন-মাজার শব্দ থেমে গেল, তখনও আমি চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। বিকেলবেলা বলাই ফিরে আসবার আগেই আমি বেরিয়ে পড়তাম। কখনও গিয়ে বসতাম লাইব্রেরিতে হাতের কাছে যা পেতাম, পড়তাম।

বলাই পোস্টাপিসে চাকরি করতো। খাটুনি ছিল তার আপিসে। গাধার খাটুনি। সারাদিন ধুলো ময়লা ঘেঁটে এসে এক-কাপ চা খেয়ে তবে সুস্থ হতো। সকালবেলা তার ছোলা ভিজোন থাকতো। নুন আদা দিয়ে তাই সে খেত।

বলাই বলতো—দাদা, আমাদের পোস্টাপিস নিয়ে একটা গল্প লিখুন তো,—আর তো পারি না—

—কেন? কী হলো?

বলাই বলতো—কাজের আর শেষ নেই দাদা, কাজের যেন পাখা গজায়,—এত চিঠি লোকে কোথায় লেখে বলুন তো? কাকে লেখে?

বলে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়তো। তার নিজের চিঠি লেখবার লোক নেই ভেবে যেন হতাশ হয়ে পড়তো।

নিকুঞ্জ আসতো রাত করে। বলতো—ছেলে পড়াতে যায়। দিনের বেলা কোথায়-কোথায় কাজের চেষ্টায় ঘুরতো কে জানে, আর সকাল-সন্ধ্যেয় টিউশানি করতো। অর্ধেক দিন খাবার সময় পর্যন্ত পেত না। খেটে-খেটে হয়রান হয়ে থাকতো কিন্তু তবু

রাত্রে ঘুম আসতো না তার! আজকের দিনে এমন ঘটনা তেমন সচরাচর হয় না। তখন আপিসে একটা চাকরি খালি নেই, একটা লোক মরেও না কোথাও যে চাকরি খালি হবে। বসে বসে বহু ছেলের খবরের কাগজ দেখে চাকরির দরখাস্ত করাই ছিল সারাদিনের কাজ। এ-সব দিন আমি দেখেছি। যুদ্ধের আগেকার সেই সব দিনগুলো।

হঠাৎ আবার অন্ধকারের মধ্যে নিকুঞ্জ আস্তে আস্তে ডাকে —দাদা, ঘুমোলেন নাকি ?

হয়ত কোনও ঘটনা ঘটেছে রাস্তায়, কোনও কথা মনে পড়েছে সেই কথা বলবে। নিকুঞ্জর যত কথা এই রাত্রে। বলাই সারাদিন পোস্টাপিসে কাজ করে এসে তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তার দিক থেকে কোনও সাড়া-শব্দ নেই। কিন্তু আমারও যেমন অহেতুক ভাবনা, নিকুঞ্জরও তেমনি। কারোরই ঘুম নেই—

নিকুঞ্জ মাঝে মাঝে বলতো—দেখবেন দাদা, একদিন নিশ্চয় আপনার নাম হবে—দেখে নেবেন।

বলতাম—তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক নিকুঞ্জ, তাই- যেন হয়—

—কিন্তু আমি যা বলি, সেই সব লিখুন দিকি, কোনও বেটা আর আটকাতে পারবে না আপনাকে, ওই সব বেকার দুঃখ দুর্দশা, ওসব নিয়ে আর লিখবেন না দাদা, ও তো দুদিনের— আমাদের দুঃখ, ও হাজার লিখেও আপনি ঘোচাতে পারবেন না—

—তাহলে কী নিয়ে লিখবো ?

নিকুঞ্জ বলতো—কেন, প্রেম ? প্রেমের গল্প লিখতে পারেন না ? বড়লোকেরা যেমন করে প্রেম করে, গরীবরা তেমন করে প্রেম করতে পারে না ভেবেছেন ?

বলতাম—গরীবরা খাওয়া-পরার কথা ভাববে না প্রেম করবে ?

—তবেই আপনি গল্প লিখেছেন দাদা! আপনি হাসালেন।

রাগ হয়ে যেত। বলতাম—তুমি যা জানো না তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। বরং চাকরির চেষ্টা দেখো, দুটো পয়সা রোজগারের চিন্তা করো, কাজ হবে—

এর পর আর কথা বলতো না নিকুঞ্জ। অন্ধকারের মধ্যে আবার দুজনে চুপচাপ শুয়ে থাকতাম। আমি চিন্তা করতাম আমার গল্প-উপন্যাসের কথা, আর নিকুঞ্জ হয়ত টাকা-পয়সার চাকরি-বাকরির কথাই ভাবতো।

সেদিন রাত্রেও নিকুঞ্জ, বলাই আর আমি শুয়ে আছি।

নিকুঞ্জ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—দাদা, ঘুমোলেন নাকি?

বললাম—কী?

নিকুঞ্জ বললে—'কোমল' মানে কি দাদা?

বললাম—কোমল মানে নরম।

নিকুঞ্জ বললে—নরম? ঠিক জানেন?

বললাম—হ্যাঁ, ঠিক জানি।

নিকুঞ্জ বললে—কিন্তু কোমল মানে তো পদ্ম!

বললাম—রাত্তিরবেলা তোমার হঠাৎ মানের দরকার হলো কেন নিকুঞ্জ?

নিকুঞ্জ এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না। কিন্তু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই জিজ্ঞেস করলে—দাদা, বাঙলা ডিক্সনারি আছে?

—কেন? কী হবে?

নিকুঞ্জ বললে—কোমল মানেটা একবার দেখতাম।

বললাম—আমি তো তোমায় বললাম, কোমল মানে নরম!

নিকুঞ্জ বললে—আপনি অবিশ্যি বাঙলায় এম-এ পড়ছেন, কিন্তু বড় ভুল হয়ে গেল তো!

বললাম—কিসের ভুল?

নিকুঞ্জ আর কিছু কথা না বলে সরে গেল। নিকুঞ্জ বেশিদূর

লেখাপড়া করেনি। তবে ছাত্র পড়ায়, তাই হয়ত মাঝে মাঝে আটকে গেলে আমায় প্রশ্ন করে। এক-একদিন রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে অঙ্ক কষাতে আসে। বলে—এই অঙ্কটা একটু বলে দিন দাদা, নইলে একেবারে বে-ইজ্জৎ হয়ে যাবো।

বলে—ক্লাস এইটে আজকাল খুব শক্ত শক্ত অঙ্ক দেয় দাদা, দেখেছেন? ফেল করিয়ে ইস্কুলের কী লাভ বলুন তো?

নিকুঞ্জ বলে—এই দেখুন—পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৮০ বৎসর। দশ বৎসর পূর্বে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের দ্বিগুণ ছিল। পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স কত?…দেখেছেন স্যার, কী শক্ত? আমিই হিমসিম খেয়ে গেছি অঙ্ক করতে, তো ক্লাশ এইটের মেয়ে পারবে কেন?

মেয়ে!

বললাম—তুমি আবার মেয়েদেরও পড়াও নাকি? বলোনি তো আগে?

নিকুঞ্জ বললে—আজ্ঞে, আপনি রাগ করবেন বলে বলিনি—

হাসি এল। বললাম—তুমি যা ইচ্ছে করো আমার তাতে রাগ করবার কী আছে, কিন্তু তারই যে ভবিষ্যৎটা নষ্ট হচ্ছে! নিজেই তো তুমি ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়েছ কিনা সন্দেহ!

—কী করবো দাদা, খুব ধরলে ওর মা!

—কার মা?

নিকুঞ্জ বললে—আজ্ঞে সবিতার মা।

আমি আর ঘাঁটালাম না নিকুঞ্জকে। কে সবিতা, কে-ই বা তার মা, কোথায় তাদের বাড়ি—অনেক কথা জিজ্ঞেস করার ছিল আমার। কিন্তু সেদিনের মত কৌতূহল দমন করে নিলাম। নিকুঞ্জও আর বেশি কথা বলে না। লক্ষ্য করি, চান করতে করতে নিকুঞ্জ হয়ত গুনগুন করে গান করছে। বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে সে-গান। হঠাৎ ভিজে কাপড়ে আসতে আসতে আমার

সামনে পড়ে যেতেই হঠাৎ গানটা থামিয়ে দেয়। কিম্বা দেখি ঘন ঘন দাড়ি কামাচ্ছে। আমার টাঙানো আয়নাটায় মুখ দেখে মাঝে মাঝে। কিম্বা ঘন-ঘন কাপড়ে সাবান দিতে দেখি। দেখি বেরোবার সময় প্রাণপণে কোঁচাটাকে কুঁচিয়ে কুঁচিয়ে টান করছে।

সেদিন রাত্রে মাঝরাত্রে হঠাৎ ও-পাশ থেকে আবার আওয়াজ এল—দাদা, ঘুমোলেন নাকি ?

বললাম—বলো।

নিকুঞ্জ বললে—আপনি রেগে যাবেন না তো ? একটা গোপন পরামর্শ ছিল।

গোপন পরামর্শ !

বললাম—গোপন পরামর্শ আমার সঙ্গে না বলাইএর সঙ্গে ?

নিকুঞ্জ বললে—না দাদা, আপনার একার সঙ্গে।

—কিন্তু ঘরে তো বলাই রয়েছে।

নিকুঞ্জ বললে—ও থাক দাদা, ও অঘোরে ঘুমোচ্ছে ও পোস্টাপিসের খাটুনি খেটে হয়রান হয়ে আছে এখন—

তারপর একটু থেমে বললে—আমি একটু মুশকিলে পড়ে গেছি দাদা, একটা মস্ত সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার !

বললাম—কী হলো, টিউশানিটা গেছে ?

—না, টিউশানিটা গেলে তো বাঁচতুম, আর বোধহয় টিউশানি করতেই হবে না, বসে বসে খেতে পারবো সারাজীবন।

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—সবিতার মা কি আর পড়াবে না মেয়েকে ?

নিকুঞ্জ বললে—না দাদা, আর পড়াবে না। বলে, লেখাপড়া শিখে কী হবে !

বললাম—তাহলে বিয়ে দেবে বুঝি মেয়ের ?

নিকুঞ্জ বললে—মেয়ের বয়েস তো হয়েছে, ক্লাশ এইট-এ পড়লে কী হবে। আর তাছাড়া নিজের বাড়ি রয়েছে মেয়ের মার। শশী

হালদার লেনের বাড়িটা যে ওদের নিজের। বাড়ির লোভে পাত্রের কি অভাব হবে ভাবছেন ?

বললাম—কার সঙ্গে বিয়ে হবে ? পাত্র ঠিক হয়েছে ?

নিকুঞ্জ বললে—হ্যাঁ দাদা, পাত্র ঠিক হয়েছে !

—পাত্র কী করে ?

নিকুঞ্জ এ কথার কোন উত্তর দিলে না। আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলো। তারপর আলো জ্বাললো হঠাৎ। তারপর বলাই-এর বিছানার কাছে গিয়ে মুখ নামিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করলে।

বললে—গোপন পরামর্শ কি না, তাই ভাল করে দেখে নিলাম বলাই ঘুমোচ্ছে কি না ঠিক—

আমি তখন আরো কৌতূহলী হয়ে উঠেছি। শেষ পর্যন্ত নিকুঞ্জটার কপালে অনেক দুঃখ আছে দেখছি। বেচারী অনেকদিন ধরে পড়াচ্ছে। পড়াতে পড়াতে একটা মায়া পড়ে গেছে। কতদিন পড়িয়ে এসে বলেছে—আজকে আর খাবো না দাদা, পেট ভর্তি—

—কেন ?

নিকুঞ্জ বলেছে—সবিতার মা ছাড়লে না, খুব পেট ভরে খাইয়ে দিলে দাদা—

আবার একদিন রাত্রে হঠাৎ হয়ত ডেকেছে—দাদা ঘুমোলেন নাকি ?

বললাম—বলো।

নিকুঞ্জ বলেছে—বলাইটা ঘুমিয়েছে এতক্ষণে, তাই চুপ করে ছিলাম, আচ্ছা, একটা অঙ্ক বলে দেবেন ? দুইটি সংখ্যার গুণফল ৮১৬, একটি ৫১, অপরটি কত ?

রাগ হয়ে গিয়েছিল। বললাম—এই বিদ্যে নিয়ে কেন তুমি ক্লাশ এইট-এর ছাত্রীকে পড়াতে যাও বলো তো ? তোমার নিজের বিদ্যে কতদূর ?

নিকুঞ্জ বললে—আমার বিয়ে তো আপনি জানেন দাদা, কিন্তু ওদের বলেছি বি-এ পাশ—

বি-এ পাশ ! বললাম—ওরা তাই বিশ্বাস করেছে ?

—বিশ্বাস করবে না কেন? ওদের কাছে তো মাইনে নিই না।

বললাম—মাইনে না নিয়ে পড়াও, তাতে তোমার লাভ ?

নিকুঞ্জ কেমন গম্ভীর হয়ে যায় খানিকক্ষণ। তারপরে বলে—লাভ ?

আমার দিকে চেয়ে কী বলবে যেন ভেবে পায় না, কিংবা যা বলতে চায় তা যেন লজ্জায় বলতে পারে না। তারপর একটু আমতা-আমতা করে বলে—ওরা লোক কিন্তু খুব ভালো।

বললাম—ভালো লোক বলেই বুঝি মিথ্যে কথা বলে ঠকাচ্ছো ? তুমি বি-এ পাশ এ-কথা বলতে গেলে কেন ?

নিকুঞ্জ বললে—বি-এ পাশ না বললে যে আমাকে মাস্টার রাখবে না।

এ-সব কথা আমার জানা ছিল। এর জন্যে নিকুঞ্জকে বকাবকিও কম করিনি। মিথ্যে কথা বলে, মিথ্যে পরিচয় দিয়ে মেয়েদের সঙ্গে মিশে তাদের সর্বনাশ করার প্রবৃত্তিকে আমি নিকুঞ্জর কাছে বার বার নিন্দে করেছি। ওদের কথা উঠলেই আমি নিকুঞ্জকে বলেছি—তুমি আর ওখানে যেও না নিকুঞ্জ, ওখানে আর তোমার যাওয়া উচিত নয়।

নিকুঞ্জ কথা দিয়েছে—না না দাদা, আমি কথা দিচ্ছি আর ওখানে যাবো না।

বলতাম—হ্যাঁ, নিজের জীবনটা তো নষ্টই করেছ, আর একজন নিষ্পাপ মেয়ের জীবন নষ্ট করবার কী অধিকার আছে তোমার ?

নিকুঞ্জ বলতো—হ্যাঁ দাদা, ঠিক বলেছেন, আমার আর যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু না গেলে যদি ডেকে পাঠায় ?

—ডেকে পাঠালেও যাবে না। বামন হয়ে তোমার আকাশের চাঁদে হাত দেবার দরকার কী?

নিকুঞ্জ বলতো—ঠিক বলেছেন, ওতে অকারণ অশান্তি কেবল, আপনি ঠিকই বলেছেন, বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার দরকার কী আমার? আর আমি কি একটা পাত্র? আমার না আছে চাল-চুলো, না আছে চাকরি, না জানি লেখাপড়া—সবিতার কাছে আমি একটা কিছুই না দাদা, আপনি তাকে দেখেননি, দেখলে বুঝতে পারতেন, আমি তার বাঁ-পায়ের কড়ে আঙুলের নখের যুগ্যিও নই—

এই সব আমার সঙ্গে আগে হয়েছিল। সুতরাং আমি জানতাম নিকুঞ্জ আর ওদের বাড়ি যাবে না।

মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতাম তবু—আর ওদের ওখানে যাও না তো নিকুঞ্জ?

নিকুঞ্জ বলতো—দাঁড়ান দাদা, বলাই ঘুমোচ্ছে কিনা দেখে নি—

বলে বিছানা থেকে উঠে আলো জ্বালতো। তারপর বলাই-এর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করতো। তারপর বলতো—না, বলাই ঘুমিয়েছে, এবার কী বলছিলেন বলুন?

বললাম—বলছিলাম, তুমি আর ওদের বাড়ি যাও না তো?

নিকুঞ্জ বলতো—কমিয়ে দিয়েছি দাদা, আগেকার মত আর যাই না—নেহাত একেবারে না গেলে কী মনে করবে তাই যাই, তা আজকে গিয়েছিলুম, সেখান থেকেই আসছি—

—সেখান থেকেই খেয়ে এলে বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সবিতার মা না খাইয়ে ছাড়লে না আর, কী করবো বলুন, তবে কাল থেকে আর যাবো না এই আপনার সামনে দিব্যি গালছি—

তা এমনি করেই দিন কাটছিল। ক'দিন নিজের সমস্যাতে

নিকুঞ্জর খবরও আর নেওয়া হয়নি। বলাইও সকাল বেলা চলে যেত পোস্টাপিসে, আর নিকুঞ্জ কখন কত রাত্রে এসে বিছানায় শুয়ে পড়তো খবর রাখতে পারতাম না।

সেদিন অনেক রাত্রে আবার নিকুঞ্জ গলা শুনলাম—দাদা, ঘুমোলেন নাকি ?

আর তারপর যখন শুনলাম সবিতার পাত্রও ঠিক হয়ে গেছে তখন আরো নিশ্চিন্ত হলাম।

বললাম—ভালোই হয়েছে, এবার আর ও-বাড়ি যেও না—

নিকুঞ্জ বললে—বলেন কি দাদা ? আমিই যে পাত্র, আমার সঙ্গেই যে বিয়ে হচ্ছে !

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম ! নিকুঞ্জর সঙ্গে বিয়ে ? নিকুঞ্জই পাত্র ?

—কিন্তু একটা মুশকিল হয়ে গেছে দাদা, আপনাকে একটু উপকার করতে হবে, একটু সাহায্য করতে হবে আমায়, তা না হলে বিয়েটা হবে না।

বলাই যেন একবার পাশ ফিরলো ঘুমোতে ঘুমোতে। নিকুঞ্জ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর আস্তে আস্তে আবার আরম্ভ করলো—দাদা, ঘুমোলেন নাকি ?

বললাম—আমি তোমার কোনও উপকার করতে পারবো না, তুমি এখন ঘুমোও—

তারপর অনেকবার ডেকেছে নিকুঞ্জ। আমি সে-রাত্রে আর কোনও সাড়া দিইনি। সকালবেলা উঠেও নিকুঞ্জ আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে, কিন্তু ঘরে বলাই থাকাতে সুবিধে হয়নি। তারপর আমিও বেরিয়ে গিয়েছি।

কিন্তু পরের দিন রাত্রিবেলা আবার সেই কাতর ডাক—দাদা, ঘুমোলেন নাকি ?

বললাম—কী বলো ?

বলাই-এর ঘুম তখন অঘোর। পাশ থেকেই বুঝতে পারছি বলাই তখন ঘুমে অচেতন। সেদিক থেকে কোনও বাধাই নেই। নিকুঞ্জও তাই দেখে অন্যদিনের চেয়ে বেশি সাহস পেয়ে গেল। যেন এবার কান্নার মতন শোনালো নিকুঞ্জর গলাটা। বললে—দাদা, আপনি যদি সাহায্য না করেন তো আত্মহত্যা করবো আমি, আমি বিবাগী হবো, এই বলে রাখলাম—

আমি কোনও উত্তর দিলাম না।

নিকুঞ্জ বললে—নিজের দাদা মা বাবা কেউ নেই তাই আপনাকেই দাদা বলে মনে করি, এখন আপনিও যদি বিমুখ হন তো আমার বেঁচে কী লাভ ?

বলে সত্যি সত্যিই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো নিকুঞ্জ।

নিজেও কেমন বিরক্ত হলাম। বললাম—কী সাহায্য তোমার চাই, বলো শুনি ?

নিকুঞ্জ কান্না থামালো। বললে—বেশি কিছু নয় দাদা, আপনাকে একবার যেতে হবে ওদের বাড়ি।

অবাক হতে যেন তখনও আমার বাকি ছিল। আমাকে যেতে হবে ? ওদের বাড়ি ?

—হ্যাঁ দাদা, ওরা আপনাকে ডেকেছে—

—আমাকে ডেকেছে ? কেন ?

—আজ্ঞে, আমি বলেছি। আপনি আমার হয়ে সাক্ষী দেবেন।

—সাক্ষী ?

নিকুঞ্জ বললে—হ্যাঁ দাদা, আপনি সাক্ষী না দিলে আমার বিয়েই হবে না। ওরা আমার কথা বিশ্বেস করতে চায় না। আপনি গিয়ে বলবেন ওর মাকে যে আমি বি-এ পাশ, আমাদের দেশে মস্ত বাড়ি, আমাদের এককালে খুব টাকাকড়ি ছিল, এখন

বেশি নেই, আর বলবেন আমার সঙ্গে বিয়ে হলে সবিতার কিছু কষ্ট হবে না—এই সব সাক্ষী দিতে হবে—

এতখানি মিথ্যে কথা বলবার অনুরোধ যে করতে পারে সে আমার মতে মানুষও খুন করতে পারে। নিকুঞ্জর কথা শুনে নিকুঞ্জর সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

অনেকদিন আগেকার কথা। অনেক বছর আগেকার কথা। মনের চিন্তার মোটা মোটা পর্দাগুলোই শুধু আজ মনে পড়ছে। কিন্তু তার ভগ্নাংশগুলোর কথা কি এতদিন পরে মনে থাকা সম্ভব? মনে আছে নিকুঞ্জ শেষ পর্যন্ত আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কেঁদেছিল হাউ হাউ করে। বলেছিল—আমার যদি উপকার হয় তো আপনার কী ক্ষতি দাদা? আমার ভালোর জন্যে না হয় একটু মিথ্যেই বলবেন!

সত্যি-মিথ্যের প্রশ্ন নয় অবশ্য। কিন্তু সেদিন আমার সে-কথা মনে হয়নি। আমার মনে হয়েছিল একটি মেয়েকে ঠকিয়ে যদি নিকুঞ্জ তার সর্বনাশ করে তো আমি কেন তার মধ্যে নিমিত্তের ভাগী হই? আমি কেন এই মিথ্যাচারের মধ্যে নিজের দায়িত্বের অপপ্রয়োগ করি। নিকুঞ্জর যদি ইচ্ছে হয় তো করুক যা খুশি, আমার কী! আমি নিকুঞ্জরই বা কে আর সেই মেয়েটিরই বা কে? এক মেসের একটি ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে একসঙ্গে রাত কাটানো ছাড়া আর কিসের সম্পর্ক আমার নিকুঞ্জের সঙ্গে? কেন আমি আমার শিক্ষা দীক্ষা চিন্তা আর প্রতিষ্ঠার এমন অপব্যয় করতে যাবো অকারণে?

প্রথম দু'একদিন কিছু বলিনি। নিকুঞ্জর সঙ্গে কথাই বলিনি। বললাম—আর কাউকে গিয়ে বলো গে যাও, আমার দ্বারা ও-কাজ হবে না—

কিন্তু মেসের ঠাকুরের কাছে একদিন হঠাৎ শুনলাম নিকুঞ্জবাবু ক'দিন ধরে ভাত খাচ্ছে না। কখন আসে, কখন যায়, কোথায়

ঘুমোয় কিছুই কেউ টের পায় না। একদিন দেখলাম উস্কো-খুস্কো চুল, রুক্ষ চেহারা, শুকনো মুখ। আমাকে দেখেই সরে পড়ছিল। কাছে ডাকলাম। বললাম—কী খবর? কোথায় থাকো?

নিকুঞ্জ মুখ নিচু করে বললে—আমার আর থাকা, বেঁচে আছি কোনরকমে।

বললাম—আর সেই তারা? তোমার ছাত্রী?

—তারাও সেই রকমই আছে।

বললাম—বিয়ে হয়ে গেছে তার?

নিকুঞ্জ বললে—আপনি তো আর কিছু করলেন না, সে-ও সেইরকম ঝুলছে।

বললাম—তুমি সত্যিই মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাও?

নিকুঞ্জ বললে—সে তো আপনাকে বলেই দিয়েছি দাদা?

—তাহলে আমার সামনে প্রতিজ্ঞা করো মেয়েটাকে কোনও কষ্ট দেবে না।

নিকুঞ্জ বললে—ভালবাসার মানুষকে কেউ কষ্ট দিতে পারে?

—দিতে পারে কি না পারে, সে-কথা শুনতে চাই না। তুমি কষ্ট দেবে না বলো?

—কথা দিচ্ছি কষ্ট দেব না।

বললাম—মেয়ের যে বাড়ি আছে, তা খেতে-না-পেলেও বিক্রি করবে না।

—করবো না, কথা দিচ্ছি দাদা, এই আপনার পা ছুঁয়ে কথা দিচ্ছি।

মনে আছে নিকুঞ্জর কথামত শেষ পর্যন্ত শশী হালদার লেনের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বেশ ছোট একতলা বাড়ি একটা। সামনে পৈঁঠে। বাড়ির লাগোয়া একটা জঁাতিকাটা ফুলের গাছ। সঙ্গে নিকুঞ্জ ছিল। সবিতার বিধবা মায়ের নামেই বাড়িটা। ওই একটি মেয়ে নিয়েই বিধবা হয়েছিলেন। তারপর কষ্টে-সৃষ্টে লেখাপড়া

শিখিয়েছেন, মানুষ করেছেন। বাউণ্ডুলে নিকুঞ্জটা যে এমন জায়গায় কেমন করে জুটলো কে জানে!

নিকুঞ্জই গিয়ে দরজার কড়া নাড়লো। ভেতর থেকে একজন দরজা খুলে দিতেই নিকুঞ্জ কী যেন বললে চুপি চুপি। তারপর আমাকে ডাকলে—আসুন দাদা, ভেতরে আসুন—

কেমন করে সমস্ত জিনিসটা অভিনয় করবো তাই-ই তখন ভাবছি।

নিকুঞ্জ বলেছিল—আপনার নাম বলবেন রমেশ গাঙুলী, পাবনায় আপনাদের বাড়ি, আমি আপনার খুড়তুতো ভাই, ভুলবেন না যেন—

ঘরের ভেতর বসেছিলাম তক্তপোশের ওপর। নিকুঞ্জ তাড়াতাড়ি তালপাতার পাখা নিয়ে আমায় বাতাস করতে লাগলো। বললে—মাকে ডেকেছি, মা এখুনি আসছেন—

সেদিনের সেই মিথ্যে অভিনয়ের জন্যে আজ চুঁচড়োর এই মাদ্রাসার সামনে দাঁড়িয়ে যে এমন করে জবাবদিহি করতে হবে তা যদি তখন জানতাম! সংসারে সব অপরাধেরই যে একদিন জবাবদিহি করতে হয় তাও যদি জানতাম! যদি জানতাম নিকুঞ্জ তার সব প্রতিজ্ঞা এমন করে ভাঙবে!

মনে আছে একে-একে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন মহিলা। থান ধুতিটা বদলে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমার সামনে। আমি তক্তপোশের ওপর বসেছিলাম, আর তিনি দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন।

বলেছিলেন—তোমার নামই তো রমেশ গাঙুলী? তুমিই তো বাবা নিকুঞ্জের দাদা?

বললাম—হ্যাঁ, নিকুঞ্জ আমার খুড়তুতো ভাই।

—বেশ বাবা, নিকুঞ্জ তোমার কথা প্রায়ই বলে। নিকুঞ্জ তো আমার ঘরের ছেলের মতই হয়ে গেছে, অমন ছেলে হয় না বাবা, ও না থাকলে কী যে করতাম, আমার অসুখের সময়ে

কী সেবাটাই করলে তোমার ভাই, পেটের ছেলে থাকলেও অমন করে করতে পারতো না—তোমাকে একটু জলখাবার এনে দিই বাবা—

—না না, থাক, আমি খেয়ে এসেছি।

নিকুঞ্জ দৌড়ে ভেতরে গেল। বললে—আমি আনছি মা—

মহিলাটি বললেন—বুঝছোই তো বাবা, মেয়ের বিয়ে বলে কথা, একটু তো খোঁজ খবর নিতে হয়, তাই তোমাকে ডাকা। আমার তো পয়সা-কড়ি কিছু নেই, তবু পেটের মেয়েকে তো আর যার-তার হাতে তুলে দিতে পারি না, আর নিকুঞ্জর স্বভাব চরিত্র তো এত বছর দেখছি, আর যখন বি-এ পাশ—

বললাম—হ্যাঁ, বি-এ'টা পাশ করেছে ও—

মহিলাটি বললেন—তাই ভেবে দেখ বাবা, বি-এ পাশ পাত্তর আমি কোথায় পাচ্ছি, আমার কি টাকা আছে না সোনা-দানা আছে, কত্তা এই বাড়িটা করে গিয়েছিলেন তাই মাথা গুঁজে আছি কোনরকমে—

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—না, নিকুঞ্জ আপনার জামাই হিসেবে ভালোই, লেখাপড়া জানে—চেষ্টা চরিত্র করে একটা চাকরি জুটিয়ে নেবেই, আর আমরাও তো আছি—

মহিলাটি বললেন—তুমি মত্ করছো তো বাবা? আমার তো বড় ভয় করছে—

বললাম—না, আপনার ভয় করবার কিছু নেই, বংশ আমাদের খুব বিখ্যাত, গাঙ্গুলী বংশ বললে ওদিকে যাকে জিজ্ঞেস করবেন, সেই চিনতে পারবে, এখন অবিশ্যি অবস্থা পড়ে গেছে—

মহিলাটির মুখ আনন্দে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—ডাকলেন—খুকি, ও খুকি—

ভেতর থেকে একটি মেয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। দেখে মনে হলো নিকুঞ্জর পছন্দ আছে বটে। এসে আমার সামনে আড়ষ্ট

হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মহিলাটি বললেন—প্রণাম কর মা এঁকে, ইনি নিকুঞ্জের জ্যাঠতুতো দাদা—

মেয়েটি প্রণাম করতে আসতেই আমি পা ছুটো টেনে নিয়ে একটু বিব্রত বোধ করলাম।

মহিলাটি মেয়ের পিঠে হাত দিয়ে বললেন—নিজের পেটের মেয়ে বলে বলছি না, এমন লক্ষ্মী বউ বাবা তুমি কোথাও দেখতে পাবে না, লেখাপড়া, সেলাই ফোঁড়া, রান্না-বান্না সব কাজ শিখিয়েছি মনের মত করে—

তারপর মেয়েকে লক্ষ্য করে বললেন—যাও মা, দাদার জন্যে জলখাবার পাঠিয়ে দাও—

মেয়েটি চলে যেতেই মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন—তা তুমি কোথায় বিয়ে করেছো বাবা ?

হঠাৎ এ-প্রশ্ন শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। এ-প্রশ্নের জবাব তো তৈরি করে আসিনি ! কী বলবো ঠিক বুঝতে পারলাম না। নিকুঞ্জ ঘরে ঢুকছিল একটা রেকাবিতে রসগোল্লা নিয়ে। সে বললে—দাদা বিয়ে করেছে রামপুরহাটে, মুকুজ্জেবাড়ি—

মহিলাটি বললেন—তা বৌমা কোথায় ?

নিকুঞ্জই আমার হয়ে জবাব দিলে, বললে—রামপুরহাটে, কলকাতায় থাকি মেসে, দাদা তো এম-এ পড়ছে, এই বছরে পাশ করেই চাকরিতে ঢুকবে, তখন কলকাতায় বাসা করেই বৌদিকে আনবো, তখন ছু'ভাই ছু'বউকে নিয়ে কোনও কষ্ট হবে না আমাদের—

মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন—দেশে মাথার ওপর তোমাদের কে আছেন, কাকা জ্যাঠা···

আমি বলতে যাচ্ছিলাম—কাকার অসুখ—

নিকুঞ্জ আমার মুখে কথা কেড়ে নিয়ে বললে—জ্যাঠামশাই মারা গেছেন আজ সাত বছর হলো, সাত বছরই তো, না দাদা ?

বললাম—হ্যাঁ, ঠিক সাত বছর।

নিকুঞ্জ বলতে লাগলো—জ্যাঠামশাই মারা যাবার পর থেকেই আমাদের অবস্থাটা খারাপ হতে লাগলো। আমার বাবা, ছোট কাকা—সব তো জ্যাঠামশাইএর কাছেই মানুষ, আমার জ্যাঠামশাই, এই রমেশদার বাবা, ছিলেন দেবতুল্য মানুষ—

—বাবা, এই মিষ্টি দুটো খেয়ে নাও।

বললাম—কেন আবার এ-সব আনতে গেলেন,—বলে মিষ্টিটা মুখে পুরে দিলাম।

মহিলাটি বললেন—আমার তো খোঁজখবর নেবার লোক নেই—আমি একা বিধবা মানুষ, নিকুঞ্জ এ বাড়ির ছেলের মতন, যখন যা দরকার হয়েছে করেছে, মাইনে পত্তোরও দিতে পারিনি, খুকিকে লেখাপড়া শেখানো, সবই তো ও করলে এতদিন—

বললাম—নিকুঞ্জকে জামাই করলে আপনার কোনও কষ্ট হবে না—

—তোমরা তাই বলো বাবা, তোমাদের মুখ চেয়েই আমার মেয়েকে নিকুঞ্জর হাতে তুলে দিচ্ছি, আমার দেখবার কেই বা আছে বলো; তিনি যেদিন হঠাৎ চলে গেলেন…

বলতে বলতে হঠাৎ ভদ্রমহিলা চোখে আঁচল দিলেন। খানিকক্ষণের জন্যে কোনও কথা বলতে পারলেন না মুখ দিয়ে। তারপরে একবার সামলে নিয়ে বলতে লাগলেন—শেষের সময়টা আর কিছু কথা বেরোয়নি বাবা, কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর, আমি তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলেছিলাম—কিছু বলবে তুমি?

তা কথাই তিনি বলতে পারছেন না, বলবেন কী! আমার যে তখন কী অবস্থা বাবা, তোমাকে কী বোঝাবো, ডাক্তার আর কী করবে—আমি একলাই কাঁদতে লাগলুম, খুকি তখন এই এতটুকু—এক হাতে তাকে কোলে জড়িয়ে আছি, আর এক হাতে কর্তাকে—

একটা কথা না বললে খারাপ দেখায়, তাই বললাম—বাড়িতে আর কেউ ছিল না ? পাড়াপড়শী কি আত্মীয়-স্বজন ?

—কেউ না বাবা, একটা লোক নেই তখন সামনে যার ওপর মেয়েটাকে অন্ততঃ এক ঘণ্টার জন্মে ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

—তারপর ?

নিকুঞ্জ এতক্ষণে কথা বললে। বললে—মাথার ওপর ভগবানই ছিল একমাত্র ভরসা—গরীবের আর কে থাকে দাদা ?

—ঠিক বলেছে নিকুঞ্জ, আমি ভগবানের ওপরই বিশ্বেস করে বরাবর জীবন কাটিয়েছি বাবা, কর্তা বেঁচে থাকতেও একদিনের তরে কারো খোসামোদ করিনি। এই যে বাড়ি উনি করে গেছেন, এ-ও ভগবানের দয়া, নইলে কর্তা ছাপাখানায় কাজ করতেন তো, কত আর পয়সা পেতেন, তাই থেকেই নিজে না খেয়ে জমিয়ে জমিয়ে এইটে করতে পেরেছিলাম। এইটে ছিল বলেই না আজ মাথা গোঁজবার একটা জায়গা রয়েছে। তারপর তোমাদের মত ছু'পাঁচজন ভদ্রলোক ছিল তাই মেয়েটিকে মানুষ করতে পেরেছি। মেয়ে-ইস্কুলের হেড্-দিদিমণির কাছে গিয়ে বললুম—বিধবার মেয়ে মাইনে আমি দিতে পারবো না, একে আপনাকে পড়াতে হবেই—

তা আমার কপাল যেমন একদিকে ভেঙেছে, ভগবান অন্যদিকে তা পুষিয়েও দিয়েছেন। একদিন ভাবিইনি ওই মেয়েকে আবার মানুষ করতে পারবো, লেখাপড়া শেখাতে পারবো,—তা সবই যখন হলো বিয়েটাও কি আটকাবে! শেষে নিকুঞ্জও জুটে গেল আমার কপালে, এখন তোমার সঙ্গে কথা বলে বাবা বড় ভরসা পেলাম, বি-এ পাশ জামাই হবে, তাই কি খুকি ভাবতে পেরেছিল, আর এতবড় বংশ !

অনেক কথার পর কী বলবো বুঝতে পারছিলাম না, বললাম—এবার আমি—

—সে কি বাবা, আমার খুকিকে পছন্দ হয়েছে তো ?

বললাম—এখন নিকুঞ্জকে যে আপনাদের পছন্দ হয়েছে এই-ই তো যথেষ্ট !

—কী যে বলো বাবা, ভগবান ছিল মাথার ওপর তাই তোমরা জুটে গেলে, নিকুঞ্জ যদি একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পারে, আর পারবেই না-বা কেন, বি-এ পাশ করেছে—

নিকুঞ্জ আগ-বাড়িয়ে বললে—চাকরি তো আমি এতদিন মনে করলে কবে···দাদা আমায় কতদিন বলেছে, দাদা ইচ্ছে করলেই আমায় একটা চাকরি করে দিতে পারে—

ভদ্রমহিলা বললেন—তা দাও না বাবা, এবার তো তোমার ভাই-এর বিয়ে থা হোল—! চাকরিটা হলে আমি একটু নিশ্চিন্ত হতে পারতুম বাবা, বাড়িটা তো রয়েছে, চাকরিটা হলেই আমি নিশ্চিন্তে চোখ বুজতে পারতুম।

বললাম—হ্যাঁ, চাকরি একটা এবার ওকে করে দিতে হবে—

ভদ্রমহিলা বললেন—তা হলে বিয়েটা কবে দিতে চাও বলো বাবা, এ-মাসে তো আর দুটো দিন, এত তাড়াহুড়োর মধ্যে কি আর হয়ে উঠবে ?

বললাম—কেন হবে না, কলকাতা সহরে বিয়েতে আবার কীসের ভাবনা—দেরি করে লাভ নেই।

ভদ্রমহিলা বললেন—না, তা তো নেই, কিন্তু এত সব করবে কে বাবা ?

বললাম—আমি আছি, নিকুঞ্জ আছে, নিকুঞ্জ একলাই সব করতে পারে।

নিকুঞ্জ হঠাৎ বললে—মনে নেই দাদা, তোমার বিয়ের সময় আমিই তো সব বাজার-হাট করলুম—

ভদ্রমহিলা বললেন—আমার মেয়ের বিয়ে তো আর তেমন বিয়ে নয় বাবা,—কর্তা বেঁচে থাকলে ধার দেনা করেও আমি কিছু খরচ করতাম—

আমি বললাম—না না, সে কথা আপনি ভাববেন না, থাকলে তো নিকুঞ্জরই থাকবে, আপনি আসছে পঁচিশেই ব্যবস্থা করুন—

কথা বলে চলেই আসছিলুম, হঠাৎ মা আবার মেয়েকে ডাকলেন।

—ওরে খুকি, শুনে যা—

খুকি এল। এসে প্রথমবারের মত পায়ের ধুলো নিলে।

ভদ্রমহিলা বললেন—আশীর্বাদ করো বাবা, যেন সুখী হয় ও—

আশীর্বাদ করলাম। কী বলে আশীর্বাদ করলাম তা মনে নেই আজ। রক্ষে শুধু এই যে আশীর্বাদ মনে মনে করলেও চলে। মনে আছে মেয়েটিকে ভালো করে দ্বিতীয়বার লক্ষ্য করেছিলাম তখন। বেশ স্বাস্থ্যবতী, লক্ষ্মীপ্রতিম চেহারা। আয়ত দুটি চোখে লজ্জা জড়ানো। একমাথা চুল একেবারে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলছে। মনে মনে যেন বড় অনুশোচনা হলো। এমন মেয়ের আমি কী সর্বনাশ করলুম। কেন করলুম। কী আমার স্বার্থ এতে!

রাস্তায় বেরিয়ে নিকুঞ্জর প্রায় আমার পা জড়িয়ে ধরার উপক্রম।

বললে—দাদা, আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেবো, আমার মায়ের পেটের দাদা হলেও এমন করে করতো না আমার জন্যে—

তখনও অনুশোচনার জ্বালা জ্বলছিল মনে মনে।

বললাম—তোমার জন্যে খুব পাপ করলাম নিকুঞ্জ—কিন্তু বিয়ের পর যদি মেয়েটিকে কষ্ট দাও তো তোমার ভালো হবে না তা বলে রাখছি—

—কী যে বলেন দাদা, আমি ওকে কষ্ট দেব? জানেন না দাদা, আমি দরকার হলে ওর জন্যে প্রাণ দিয়ে দেব আমার।

বললাম—প্রাণ তোমায় দিতে হবে না, কিন্তু ওকে কষ্ট না দিলেই হলো—

কথাগুলো বললাম বটে, কিন্তু মনের অশান্তি আমার গেল না।

মেয়েটিকে দেখে পর্যন্ত কেমন যেন পাপবোধ আরো বেড়ে গিয়েছিল।

সেদিন রাত্রে বলাই ঘুমিয়ে পড়বার পর নিকুঞ্জ বললে—দাদা, ঘুমোলেন নাকি?

মনে আছে সেদিন রাত্রেও নিকুঞ্জকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম যদি কোনওরকম ভাবে নিকুঞ্জ কষ্ট দেয় মেয়েটিকে তো আমি তার শাস্তি দেব নিজের হাতে। নিকুঞ্জ চাকরি করবে একটা, সেই চাকরিতে যা মাইনে পাবে সব যেন শাশুড়ীর হাতে এনে তুলে দেয়। এখন যতদিন চাকরি না হয়, ততদিন টিউশানির টাকাগুলোও তুলে দিতে হবে শাশুড়ীর হাতে।

বললাম—যতদিন শাশুড়ী বেঁচে থাকবে ততদিন শাশুড়ীর হাতে দেবে, শাশুড়ী যখন থাকবে না তখন বউ-এর হাতে তুলে দেবে—রাজী তো?

বিয়ের দিন ধার্য হয়েছিল পঁচিশে। হাতে তখন আর কয়েকটা দিন মাত্র ছিল।

বললাম একদিন—তোড়-জোড় কেমন চলছে নিকুঞ্জ?

নিকুঞ্জ বললে—আজকে গিয়েছিলাম সবিতার গয়না পছন্দ করতে—

এমনি করে আর কিছুদিন মাত্র তখন বোধহয় বাকি ছিল। কয়েকটা দিন পরেই যথারীতি আমিও নেমন্তন্ন খেয়ে আসতে পারতাম নিকুঞ্জর বিয়েতে। কিন্তু হঠাৎ সেই সময়েই একটা ঘটনা ঘটে গেল। দিল্লীতে একটা চাকরির দরখাস্ত করেছিলাম, এতদিনে তার উত্তরও ঠিক এই সময়ে পাওয়া গেল। চাকরিটা ছিল জরুরী। এম্-এ পরীক্ষার ফলটা যখন ইচ্ছে বেরোক, তা নিয়ে আমার তখন মাথা-ব্যথা ছিল না মোটে। সুতরাং আমাকে দিল্লী চলে যেতেই হলো। নিকুঞ্জকে একলা ঠিক অকূল সাগরে ফেলে গেলাম বলা চলে না।

যাবার সময় নিকুঞ্জ বললে—ঠিক এ সময়েই চলে যাচ্ছেন দাদা?

বললাম—তাতে কি হয়েছে, সব ব্যবস্থা তো করে দিয়েছি, আর যদি কিছু দরকার থাকে তো বলাইকে বলো না—

নিকুঞ্জ বলেছিল—না দাদা, থাক্, ওকে আর বলে দরকার নেই—আমি একলাই সব পারবো—

তারপর আমি আর কিছুই জানি না। কলকাতা থেকে নতুন জায়গা রাজধানীতে গিয়ে নতুন করে স্থির হয়ে বসতেই কেটে গেল কয়েকদিন। তারপর এক বাসার পর অন্য বাসায় বদল করতে করতে অনেকবার ঠিকানা বদলে যখন পাকা ঠিকানায় জুত করে বসতে পারলাম, তখন নিকুঞ্জর বিয়ে হয়ে পুরোন হওয়ার কথা। তারপর থেকে নিকুঞ্জর আর কোন খবর জানি না। নিকুঞ্জর বউ কিম্বা শাশুড়ী তাদের কারোর খবরই জানতাম না আর। তাছাড়া নিজেকে নাম বদলে 'রমেশ গাঙুলী'তে রূপান্তরিত করেও মনে মনে খুব সুখী ছিলাম না। সুতরাং ও-প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলতেই চেয়েছিলাম। এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কথা ভুলেও গিয়েছিলাম।

আজ এতদিন পরে সেই সেদিনকার সবিতার এই পরিবর্তন দেখে কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। নিকুঞ্জ শেষকালে বউকে এখানে এনে তুলেছে! শশী হালদার লেনের সে বাড়িটা থেকে উঠে এখানেই বা আসতে গেল কেন? সে বাড়িটাও কি বিক্রি করে দিয়ে টাকাগুলো খেয়ে বসেছে? বউটার গায়ে একটা গয়নাও রাখতে নেই! শেষে এই হাল করে ছেড়েছে বউটার?

গাড়িতে উঠেও যেন মেয়েটার চোখ দুটো সামনে দেখতে পেলাম। যেন জল্ জল্ করে জ্বলছে। অন্ধকার গাড়িটা কখন চলতে আরম্ভ করেছে, কখন সভার উদ্যোক্তা ভদ্রলোকেরা যথারীতি বিদায় নিয়েছে, কিছুই যেন আমার খেয়াল ছিল না। মনে হলো যেন মেয়েটিও আমার সঙ্গে দৌড়চ্ছে।

হঠাৎ স্পষ্ট গলায় যেন আবার বললে—বলুন, আমার কথার জবাব দিন?

কী আর জবাব দেব! তখন অনুশোচনায় আমার সমস্ত দেহ অবশ হয়ে আসছে। হঠাৎ ড্রাইভারকে বললাম—গাড়ি ঘোরাও—

অন্ধকারে একটা চৌমাথার সামনে গাড়ি ব্রেক্ কষে থমকে দাঁড়াল। বললাম—সিনেমা হাউসের দিকে একবার নিয়ে চলো তো।

ড্রাইভার আবার গাড়িটা পেছনের দিকে ঘোরাল। এতক্ষণে সহর ছাড়িয়ে অনেকদূর চলে এসেছিলাম। আবার সেই বাজারের পথ। যে-পথ দিয়ে সভা করতে গিয়েছিলাম। রাস্তায় ভিড় রয়েছে বেশ। সিনেমা হাউসের সামনে আরো ভিড়, আরো আলো, আরো জৌলুষ। সিনেমার কোনও গান জোরে বাজছে।

বললাম—এর পেছনের বস্তীতে যেতে হবে একবার—

ড্রাইভার বস্তীটা আন্দাজ করে গাড়িটা নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালো। আমি গাড়ি থেকে নামলাম। ফুলের মালা, সিল্কের চাদর সব গাড়ির ভেতর রেখে এলাম। তারপর বড় লাইটপোস্টটার নিচে বিরাট নর্দমাটা পার হয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ছোট বড় নানান মাপের খাপরার ঘর। টিমটিমে আলো জ্বলছে ভেতরে। কোনও কোনও বাড়ি অন্ধকার। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেও লোকজন, মেয়েমানুষ, ছোট ছোট ছেলেমেয়ের কল-শব্দে মুখর হয়ে রয়েছে আবহাওয়া।

এতক্ষণে নিশ্চয় বাড়ি ফিরেছে সবিতা।

বস্তীর সব বাড়িগুলোই না হয় খুঁজবো। না হয় না-ই চিনলাম বাড়িটা। নিকুঞ্জর নামটা বললে কি আর চিনতে পারবে না? না হয় চেহারার একটা বর্ণনা দেব। বস্তীতে সবাই সবাইকে চেনে। শহরের মধ্যের কথা আলাদা। আশে-পাশের লোকজনদের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখি। অন্ধকারে ভালো ঠাহর

হয় না। কিন্তু হঠাৎ যদি নিকুঞ্জকে দেখে ফেলি। চিনে ফেলি। আমার সেদিনকার সেই অভিনয়ের জন্যেই তো এত কষ্ট বউটার।

একজনকে সামনে দেখে কেমন যেন সন্দেহ হলো। বললাম—নিকুঞ্জ না ?

—কে ?

লোকটা যেন আর একটু হলে আমার সঙ্গে ধাক্কা খেত। বললে—কাকে চাই বাবুজী ?

বললাম—নিকুঞ্জ বলে কেউ আছে ভাই এখেনে ? নিকুঞ্জ গাঙ্গুলী ?

লোকটা বললে—বাঙালী আছে ? নেহি বাবুজী—আমি নতুন আদ্‌মী, ছ মাহিনা হলো এসেছি—

তবে ! আবার এগিয়ে গেলাম। চীৎকার করে ডাকতে ইচ্ছে হলো। একবার একটা ফাঁকা জায়গায় এসে চীৎকার করে ডাকলাম—নিকুঞ্জ—

—কীস্‌কো মাঙতা বাবুজী ?

বললাম—নিকুঞ্জ গাঙ্গুলী বলে একজন থাকে এখেনে, কোন্ বাড়িটা বলতে পারো ভাইয়া ?

আরো কয়েকজন আমার কথা শুনে কাছে এল। নিকুঞ্জ গাঙ্গুলী। ও-নাম কেউ জানে না। ও-নামের কেউ এখানে থাকে না।

বললাম—তার বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে থাকে···

চেহারাটাও একটা মোটামুটি পরিচয় দেবার চেষ্টা করলাম। তবু কেউ চিনতে পারে না। তবে কি নিকুঞ্জও নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্যে পরিচয় গোপন করে এখানে বাস করছে ? নিজের নামটাও হয়ত বদলে ফেলেছে। বলা যায় না। হয়ত সর্বস্ব খুইয়ে বউ-এর রোজগারে খায় শেষ পর্যন্ত। নইলে অত রাগ কেন বউটার ? আমার ওপর অত রাগ, অত ঘৃণা নিয়ে কেন জবাবদিহি চেয়েছিল আমার ? আমার অভিনয়ের জবাবদিহি !

হঠাৎ একটা গলার আওয়াজ শুনে যেন খুব চেনা মনে হলো।

—আরে, দাদা না ?

দেখি বলাই। লুঙি পরা, খালি গায়ে দাঁড়িয়ে। আমি তাকে দেখে অবাক হয়ে গেছি, আমাকে দেখেও বলাই অবাক হয়ে গেছে।

বললে—দাদা আপনি ?

বললাম—তুমি ? তুমি এখেনে কী করতে ? এখানকার পোস্টাপিসে বদলি হয়েছ নাকি ?

বলাই টুপ করে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বললে—চলুন দাদা, আমার বাড়ি চলুন, এসেছেন যখন এখেনে, পায়ের ধুলো দিতেই হবে—

বললাম—আমি এসেছি নিকুঞ্জকে খুঁজতে, তার কাছে একবার নিয়ে চলো আমাকে, তোমার বাড়ি আর একদিন যাবো—

বলাই কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। বললে—নিকুঞ্জ ?

বললাম—হ্যাঁ, নিকুঞ্জর বউ-এর সঙ্গে দেখা হলো একটু আগে, বউটাকে বড় কষ্ট দিয়েছে, তাকে একবার শায়েস্তা করতে চাই, বলতে গেলে আমিই তো ওদের বিয়ের জন্যে দায়ী !—

বলাই থমকে দাঁড়াল কথাটা শুনে।

বললে—সে কি দাদা, আপনি কিছু শোনেননি !

কী শুনবো ! বলাই বললে—নিকুঞ্জর বিয়ে তো হয়নি ওখানে দাদা।

সে কী ! এত মিথ্যে কথা, এত অভিনয়, সব কি জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত।

বলাই বললে—নিকুঞ্জ তো মিথ্যে কথা বলেছিল ওদের কাছে, ও তো বি-এ পাশ করেনি।

বললাম—তা সে-কথা ওরা জানলে কী করে ?

বলাই হাসতে লাগলো। বললে—সে কথা আমিই ওর মার কাছে গিয়ে সব বলে দিলুম দাদা।

—তুমি বলে দিলে ? তুমি জানলে কী করে ?

বলাই বললে—আজ্ঞে, আপনারা যখন কথা বলতেন রাত্তিরবেলা শুয়ে শুয়ে, আমি যে তখন সব চুপি-চুপি শুনতাম—

—তুমি সব জানতে ?

বলাই হাসতে হাসতে বলতে লাগলো—হ্যাঁ দাদা, আপনি দিল্লী যাবার পরই আমি গিয়ে সব ফাঁস করে দিলাম সবিতার মাকে, বিয়ে ভেঙে গেল—নিকুঞ্জ সেই যে পালালো আর এ-মুখো হয় না—

—তাহলে মেয়েটার সঙ্গে কার বিয়ে হলো ?

বলাই বললে—আজ্ঞে, আবার কার হবে, আমাকেই বিয়ে করতে হলো শেষকালে।

আমি কথাটা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লাম। বলাই-এর আপাদমস্তক চেয়ে দেখতে লাগলাম। দাঁত বার করে হাসছে তখনও। যেন মহা কীর্তি করেছে একটা। কী বলবো বুঝতে পারলাম না। কী বলা উচিত তাও বুঝতে পারলাম না।

বলাই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো।

বললে—আপনার বইটা দেখলুম দাদা, আপনার খুব নাম হয়েছে চুঁচড়োয়। একটা উপকার করুন না দাদা, আমায় একটা চাকরি যোগাড় করে দিন না দাদা, পোস্টাপিসের সে চাকরিটা আমার গেছে, ইন্‌সিওরের খাম চুরি করেছিলুম বলে, এখন বড় কষ্টে আছি দাদা, বউটা যা রোজগার করে ভদ্দরলোকের বাড়ি বাসন মেজে তাইতেই কোনরকমে সংসার চলছে—আপনার তো এখন খুব নাম-ডাক, কাউকে বলে একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিন না—

বলে বলাই তার খালি-গা চুলকোতে লাগলো। আমি সেই অন্ধকারের মধ্যেই যেন এক নতুন জগৎ দেখতে পেলাম। নিকুঞ্জকে জানতাম এক-কান কাটা। কিন্তু বলাই যে এমন দু'কান-কাটা তা যেন এতদিনে জানতে পারলাম।

সবিতার গল্প শুনলেন। এবার বনলতার গল্প শুনুন।

একদিন সাহিত্য-সভায় নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন কয়েকজন ভদ্রলোক।

ভদ্রলোকরা বললেন—শনিবার দিন যাবেন আর সোমবার চলে আসবেন, আপনার কোনও কষ্ট হবে না।

বললাম—মিটিং-এ আমি যাই না, বিশ্বাস করুন, মিটিং-এ যেতে আমার ভালো লাগে না।

ভদ্রলোকেরা বললেন—সকলের বড় আগ্রহ আপনাকে দেখবার জন্যে, আপনি না গেলে সবাই খুব হতাশ হবে, আর আপনার থাকা-খাওয়ারও কোনও অসুবিধা হবে না।

বললাম—আমার স্বাস্থ্যও খারাপ, অতদূরে গিয়ে শরীরও খারাপ হবে।

ভদ্রলোকেরা বললেন—আপনার জন্যে আমাদের ইস্কুলের হেড্-মিস্ট্রেস নিজে সব ব্যবস্থা করেছেন, আপনি যা খেতে চাইবেন, সেই রকম বন্দোবস্তই করবেন তিনি বলেছেন! তাঁরই বিশেষ আগ্রহ আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

বললাম—দেখুন দু'টো প্রতিজ্ঞা করেছি আমি, এক—পুজো সংখ্যায় আমি লিখবো না, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে—কোনও মিটিং-এ সভাপতিত্ব করবো না—

ভদ্রলোকরা কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

বললাম—আপনারা যান্, গিয়ে এই কথা বলুন গিয়ে তাঁকে—

ভদ্রলোকেরা বললেন—কিন্তু আপনাকে না নিয়ে যেতে পারলে তাঁর কাছে আমরা মুখ দেখাতে পারবো না, তিনি বলেছেন তাঁর নাম করলেই আপনি যাবেন, আপনি তাঁকে চেনেন—

আমি তাঁকে চিনি! কেমন যেন অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—আপনাদের কোথায় মিটিং হবে ?

—মছলন্দপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যেই এই সভা।

বললাম—আপনাদের ইস্কুলের হেড-মিস্ট্রেসের নাম কী ?

—কুমারী বনলতা হাজরা।

বনলতা হাজরা! সমস্ত অন্তরাত্মা এক নিমেষে যেন আর্তনাদ করে উঠলো আমার। কুমারী! এখনো বিয়ে হয়নি বনলতার। বনলতার চেহারাটা যেন এক মুহূর্তে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। এখন তো অনেক বয়েস হয়েছে সেই বনলতার। ভুবন মুহুরী সেই সময়েই তো মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলো। শুধু শ্রীবিলাসবাবুই আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু সে তো অনেক দিন আগের কথা। অনেক বছর আগের কথা। এখনও বিয়ে হয়নি ? কিন্তু এতদিন পরে নিজেকেও যেন একটু দায়ী মনে হলো। আমি কী করতে পারতাম! আমি কেমন করে উদ্ধার করতে পারতাম বনলতাকে! আমার নামে যে-অপবাদ দিয়েছিলেন শ্রীবিলাসবাবু, তার জন্যে কি সত্যিই আমাকে দায়ী করা যেত ?

ভদ্রলোকরা বললেন—তিনি আপনাকে এই একটা চিঠি দিয়েছেন—

চিঠিটা নিলাম হাত বাড়িয়ে। খামটা ছিঁড়ে পড়লাম।

লেখা আছে—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমাদের ইস্কুলের বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আপনাকে এখানে উপস্থিত হতে অনুরোধ করছি, আমার একান্ত অনুরোধ আপনি অবশ্য আসবেন। আপনি না এলে ক্ষুন্ন হবো।

নমস্কারান্তে নিবেদিকা

বনলতা—

ভদ্রলোকেরা জানতেন বোধহয় যে চিঠিতেই কাজ হবে। বললেন—আমাদের সব আয়োজন শেষ, কার্ডও ছাপা হয়ে গেছে—

জিজ্ঞেস করলাম—শ্রীবিলাসবাবু কোথায় ?

ভদ্রলোকেরা বললেন—তিনি তো বছর খানেক হলো মারা গেছেন, তাঁর ভাই শ্রীদামবাবু এখন আছেন—

শ্রীবিলাসবাবু নেই ! আর তিনি নেই বলেই কি বনলতা আমাকে চিঠি লিখতে পেরেছে ! আর সেই জন্যেই আমাকে যেতে অনুরোধ ?

বললাম—আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যাবো—

বললাম তো যাবো, কিন্তু আমার সমস্ত মন যেন বিশ্ব-পরিক্রমা শুরু করলো। বিশ্ব-পরিক্রমা না হলেও আত্ম-পরিক্রমা তো বটেই। বনলতা হাজরা ! মছলন্দপুরে না গেলে বনলতা হাজরাকেই কি আমি চিনতাম, না চিনতাম শ্রীবিলাসবাবুকে !

বহু দিন, বহু বছর আগের কাহিনী। তবু যেন সব আমার স্পষ্ট মনে আছে।

বলতে গেলে সেই আমার প্রথম একলা ট্রেনে চড়া। একেবারে একলা। বাবা নেই, মা নেই, সমস্ত গাড়িতে আমার যা খুশী তাই করতে পারি। জানালা দিয়ে ঝুঁকে বাইরে চেয়ে দেখতে পারি, কেউ শাসন করবার বা বারণ করবার নেই। আর দশজন প্যাসেঞ্জার যেমন খুশিমত চা কিনে খাচ্ছে, পান কিনে খাচ্ছে, আমিও তেমনি কিনতে পারি। পুরি, জিলিপী, রসগোল্লা, চিনে বাদাম যা খুশি কিনতে পারি।

বয়স তখন বেশি নয় আমার। সবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি।

তবু বাবা স্টেশনে এসে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেছেন। ট্রেন ছাড়বার আগে বলে দিলেন—দরজা দিয়ে বাইরে ঝুঁকো না যেন—গিয়ে একটা চিঠি দিও—

যেন বিলেত না আমেরিকা যাচ্ছি ! অনেক দূরের পথ ! অথচ

আমি বাড়ির বড় ছেলে। আজকাল ও-বয়েসে ছেলেরা কত স্বাধীন কত কাজ তাদের, কত তাদের আকর্ষণ! আমি অন্য ভাবে মানুষ। সে-বয়সেও আমি নভেল পড়িনি। এক ইস্কুলের বই ছাড়া অন্য কোনও বই পড়াই ছিল আমাদের বাড়িতে অপরাধ। লুকিয়ে পড়ার সাহসও ছিল না। বাবা মায়ের শাসনে তাঁদের ইচ্ছে মতই তখন চলেছি। নভেল পড়ে খারাপ ছেলেরা, সুতরাং ও-সব পড়বো না। বিকেলে খেলার পর দেরি করে বাড়ি ফেরে খারাপ ছেলেরা, সুতরাং ছ'টা বাজতে-না-বাজতে মাঠ থেকে ফিরি। চা খাই না, পান খাই না, বিড়ি সিগারেটের কথা কল্পনা করাও পাপ। মাথার চুলগুলোতে ক্লাশ সিক্সের পর থেকে প্রথম চিরুনি ছোঁয়াতে শুরু করলুম। তাও আবার সামনের দিকে কপালের ওপর এনে একপাশে টেনে দিতাম। বাহার নয়, বিলাসিতা নয়—শুধু স্বাস্থ্যরক্ষা। এই ছিল তখনকার দিনের ভালো ছেলেদের লক্ষণ!

কাকা লিখেছিলেন—'তোমার জন্যে স্টেশনে লোক দাঁড়াইয়া থাকিবে, তাহার সঙ্গে চলিয়া আসিও'—

এদিকে হাওড়া স্টেশনে বাবা তুলে দিয়ে গেছেন আর ওদিকের প্রান্তে কাকার লোক—সুতরাং কোথাও কোনওদিকে হারিয়ে যাবার ভয় নেই, শুধু এই মাঝখানের পথটা। এইটুকু পথ ট্রেনে কাটবে। এইটুকু পথ যদি চরিত্রটুকু ঠিক রাখতে পারি তো গুরুজনদের মুখরক্ষা হবে। বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে। পাছে দোকানের খাবার খেয়ে শরীর খারাপ হয় তাই বাড়ি থেকে ট্রেনে খাওয়ার জন্যে খাবার করে দিয়েছিল মা। ট্রেনে উঠেই যেন ক্ষিদে পেতে লাগলো। চারদিকে দেখে দেখে অন্যমনস্ক থাকার চেষ্টা করেও যেন খাওয়ার কথা ভুলতে পারলাম না। গাড়িতে কেউ তখন বিড়ি খাচ্ছে, কেউ চিনেবাদাম—কেউ খবরের কাগজ পড়ছে। যে-যার নিজের কাজে ব্যস্ত। বার বার সকলের দিকে চেয়ে দেখলাম, কেউ আমার দিকে দেখছে কিনা। কেউ-ই দেখছে না। কারোর মাথা-ব্যথা নেই

আমার জন্যে! তবু লজ্জা করতে লাগলো। সকলের সামনে কেমন করে খাবো! লুচিগুলো আলুভাজা দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে কেমন করে খাবো। সবাই যে দেখবে আমাকে! কিন্তু উপায় নেই। এক-একটা স্টেশন চলে যাচ্ছে আর আমি একটা ছোট নোটখাতায় স্টেশনের নামগুলো লিখে রাখছি। এই গেল হরিশ্চন্দ্রপুর, এই বারুইপাড়া, এই···।

এক-একটা স্টেশন যায় আর নোট বইটাতে নামটা লিখে রাখি।

সামনের এক বুড়ো ভদ্রলোক চুপ-চাপ বসেছিলেন। হঠাৎ বললেন—কী লিখছো খোকা?

বললাম—ইস্টিশনের নাম—

ভদ্রলোক বললেন—ইস্টিশনের নাম বুঝি জানো না? লাইনে কখনও আসোনি আগে?

বললাম—না—

—তা আমি বলছি, আমার মুখস্থ আছে, লিখে নাও—

কিন্তু আমার যেন ভাল লাগলো না প্রস্তাবটা। প্রতি পদে পদে একটা অচেনা জায়গা, আর অচেনা নাম-এর যে রোমাঞ্চ তা ভদ্রলোক কেমন করে বুঝবে! যদি সব স্টেশনের নাম জানাই থাকবে, সবগুলোই চেনা হবে, তো চোখ বুজে ঘুমোতে ঘুমোতে গেলেই হয়! কাউকেই দেখবার প্রয়োজন নেই, কিছুই জানবার দরকার নেই। সব জানা হয়ে গেছে আমার, সব দেখা শেষ হয়েছে, কিছুতে আর অবাক হবো না—এ-ও তো এক রকমের মৃত্যু! তা হলে এই একলা একলা রেলে চড়ার দরকার কি ছিল? বাড়িতে তো বাবার শাসন, বিদেশে কাকার, মাঝখানে এই রেলগাড়ি চড়া, এটুকুতে শাসন করবার লোক, চিনিয়ে দেবার লোক সহ্য হবে কেন?

ভদ্রলোক হয়ত বুঝলেন না। দেখি কিছু করবার না পেয়ে কামরার দেয়ালে মাথা লাগিয়ে চোখ বুজিয়েছেন।

ভাবলাম এই সুযোগ! এই সুযোগেই খাবারটা খেয়ে নেওয়া যাক। আস্তে আস্তে বেঞ্চির তলা থেকে মুখবাঁধা মাটির নতুন হাঁড়িটা বার করলাম। ভেতরে লুচি আর মিষ্টির গন্ধ আসছে জিভ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। তবু আস্তে আস্তে মুখের বাঁধা দড়িটার গেরো খুললাম। তারপর একখানা লুচি নিয়ে জানালার বাইরে মুখটা বাড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে চিবোতে লাগলাম।

খুব লজ্জা করতে লাগলো। সত্যি খুব লজ্জা! ছোটবেলা থেকেই এই লজ্জা আমাকে অনেক রকম বিপদে ফেলেছে বহুবার। বহুবার বহুভাবে এই লজ্জার জন্যে লোকে আমায় ভুল বুঝেছে। লজ্জাকে অনেকে অহঙ্কার বলে ভেবেছে, কখনও আবার লজ্জাকে অবহেলা বলেও অনেকে ভুল করেছে।

শ্রীবিলাসবাবুও বলেছিলেন—আপনার এত লজ্জা করবার নেই—আপনি মুখ ফুটে একবার শুধু বলুন—

তবু, আমি কিছুই বলতে পারিনি। বলতে ইচ্ছে করছিল সেদিন অনেক। বলতে ইচ্ছে করছিল—বনলতা নামটা বড় চমৎকার। বনলতা নামটার মত বনলতার চেহারাটাও বড় চমৎকার! বলতে ইচ্ছে করেছিল—বনলতা নামটা কে দিয়েছে? শ্রীবিলাসবাবু, না বনলতার বাবাই রেখেছে মেয়ের নাম! আরো কত কি বলতে ইচ্ছে করেছিল! মছলন্দপুরের জমিদার বাড়িতে এসে এমন করে যে না-চাইতেই হাতে স্বর্গ পাওয়া যাবে, তার জন্যেও তো আমার শ্রীবিলাসবাবুর ওপর কৃতজ্ঞতা ছিল অনেকখানি! লজ্জার জন্যে সে-কৃতজ্ঞতাটুকুও তো তখন মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারিনি! সে কি শ্রীবিলাসবাবু বুঝেছিলেন!

শ্রীবিলাসবাবু বলেছিলেন—বড় ভালো মেয়ে বনলতা, বুঝলেন, আমার স্কুলের সব চেয়ে ভালো মেয়ে, লেখাপড়ায় গান বাজনায়—সব বিষয়ে—

আমি এ-কথার জবাবে কি আর বলবো। শুধু চুপ করেই ছিলাম।

কিন্তু তখনও কি জানি—পৃথিবীতে মানুষ শুধু এক-রকমেরই নেই—কোটি কোটি মানুষ, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তাদের রকমফের। কোথায় কলকাতা আর কোথায় মছলন্দপুর। ভারতবর্ষের ম্যাপে সে গ্রামের নামের অস্তিত্বটুকু আছে কিনা তা-ও সন্দেহ। সাহেবগঞ্জে নেমে কত মাইল গরুর গাড়ী আর কত মাইল হাঁটার পর, নদী নালা পার হয়ে তবে মছলন্দপুর। প্রথমে আম-কাঁঠালের বাগান, সর্ষেক্ষেত, আনাজের ক্ষেত, তারপর মছলন্দপুরের জমিদার বাড়ি। দূর থেকে শ্যাওলা-ধরা দেয়াল দেখলে মনে হবে বুঝি পোড়ো একটা বাড়ি। তখনও লোকজন দেখতে পাওয়া যাবে না। খোঁয়াড়ে গাই গরু দেখা যাবে না। আমলা কর্মচারীদের কাছারিবাড়ি দেখা যাবে না। শুধু দেখা যাবে বাড়ির লাগোয়া একটা ন্যাড়া শিমুলগাছ ডালপালা মেলে হা হা করে হাত তুলে হাসছে।

যে লোকটা আমাকে স্টেশনে আনতে এসেছিল তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম—আর কত দূর গো?

সে বলেছিল—আর একপো পথ—

সেই একপোয়া পথ যেন হাজারপোয়া পথ হয়ে সামনে ছড়িয়ে আছে। ভোরবেলা স্টেশনে পৌঁছেছি। রাতই বলা যায়। আকাশে ফুটফুট করছে তারা। ট্রেনে বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছিলুম। বুড়ো ভদ্রলোক ঠেলে তুললেন—খোকা নামবে না এখানে? সাহেবগঞ্জ এসে গেছে যে—

শ্রীবিলাসবাবু বলেছিলেন—এই যে পথটা দেখছেন, আগে মগ্‌রা এই পথ দিয়ে বাঙলা দেশে আসতো, লুঠপাট করতো, আর গাঁয়ের লোক ছেলেমেয়ে নিয়ে যে-যেদিকে পারে ছুটে পালাতো—

চারিদিকে বেত আর বেত-আঁচড়ার বন। জায়গাটা ভয়াবহ। তবু সমস্ত পরিষ্কার করতে চেষ্টা করছেন শ্রীবিলাসবাবু। তখন আমার কী-ই বা এমন বয়েস। কিন্তু সেই বয়সেই শ্রীবিলাসবাবু

যেন একটু বেশি সমীহ করে কথা বলতে লাগলেন। আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম তখন। কিন্তু তখনও তো তাঁর আসল উদ্দেশ্য জানি না।

এ-ধারে কাকার আস্তানা। তারপর ছোট একটু উঠোন। উঠোনের ওপারেই শ্রীবিলাসবাবুর কাছারি।

শ্রীবিলাসবাবু আমাকে দেখেই ডাকলেন—শুনুন না এদিকে, আপনি বুঝি কাল এসেছেন ?

বললাম—আমাকে 'আপনি' বলে ডাকবেন না, আমি এবার সবে ম্যাট্রিক দিয়েছি—

—তা হোক, আপনি আমাদের নগেনবাবুর ভাইপো—

কাকা সারাদিনই ব্যস্ত। কাজের তাঁর শেষ নেই। সকাল বেলাই দেখতাম জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে যেতেন। কোথায় মাঠের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে তাঁর কাজ হতো। সেটেলমেণ্ট্ অফিসারের কাজ কম নয়। লোক-লস্কর আসতো। তাদের সঙ্গে কী সব কথাবার্তা হতো কিছু বুঝতে পারতাম না। তারপর সার্ট প্যাণ্ট্ পরে তৈরি হতেন। কাকীমা পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন—ও-বাড়ি থেকে ওঁরা আজ মাছ পাঠিয়ে দিয়েছেন জানো—

—মাছ !

কাকা অবাক হয়ে যেতেন। বলতেন—কেন ? মাছ কেন ? তুমি নিয়েছ নাকি ?

—না-নিয়ে কী করবো, ফেরত দেব ?

—হ্যাঁ ফেরত দেবে ! দেখছো সেটেলমেণ্টের কাজে এসেছি, জমি-জমার ব্যাপার, ও-সব ঘুষ নেওয়া পছন্দ করি না—

তারপর আমাকে ডেকে বললেন—খুব সাবধানে মিশো ওঁদের সঙ্গে তুমি—

বললাম—ওই কাছারিতে যিনি বসে থাকেন, উনি আমাকে ডাকছিলেন সকালবেলা—

কাকা বললেন—ডাকলে যাবে, কিন্তু বেশি মেলামেশা করতে যাবে না—ওদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করাই ভালো—

—ওরা লোক খারাপ বুঝি ?

তা শ্রীবিলাসবাবু আবার সেদিন ডাকলেন। কাছারি বাড়িতে বসে ছিলেন। সকালবেলা থেকে ওই তক্তাপোশটার ওপর বসে থাকাই কাজ তাঁর। কয়েকটা তাকিয়া আশে-পাশে ছড়ানো। সামনে হু'একজন আমলা ঢালু-ঢালু ডেস্কের ওপর খেরো বাঁধানো খাতা নিয়ে লেখাপড়ার কাজ করছে।

হরিশবাবু বলে—হুজুর মালো-পাড়ার দক্ষিণের বিলের জলকর এবার এখনও দেয়নি ভঞ্জরা—

শ্রীবিলাসবাবু রামায়ণ মহাভারত যাহোক একটা কিছু নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। মুখ তুলে বললেন—বড় ভঞ্জকে একবার ডেকে পাঠান তা হ'লে—

তারপর কী ভেবে বললেন—ক'সনের বাকি পড়েছে দেখুন তো ?

হরিশবাবু বললেন—তিন সন—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—আচ্ছা ডাকতে হবে না, আমি তো ইস্কুলে যাবো, তখন বলে আসবো—

তারপর উঠোনের দিকে কাকে যেতে দেখেই ডাকেন—ও গোলাম মোল্লা, ছেলে কেমন আছে তোর ! ভাত খেয়েছে ?

গোলাম মোল্লা সোজা একেবারে পায়ের কাছে নিচু হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। বললে—কবিরাজ মশাইএর কাছে যাচ্ছি হুজুর, আবার যেন গা-টা কেমন গরম গরম ঠেকছে—

—একটু হুশিয়ার থাকিস্, বর্ষা বাদলে ঠাণ্ডা লাগাসনে, ক'দিন থেকে ছোট ছেলেটাকেও তো ইস্কুলে দেখছিনে তোর ?

সকাল থেকে কাকার ঘর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। অচেনা জায়গা। কোথাও বেরোবার উপায় নেই। সামনে চেয়ে

দেখলে শুধু ধু-ধু মাঠ। সামনের দিকে কয়েকটা ঘর-বাড়ি। খামার। খড়ের চালের ওপর লাউ কুমড়োর বাহার, চালের ফাঁক দিয়ে উনুনের ধোঁয়া উঠছে। লাঙল কাঁধে নিয়ে চাষারা চলেছে ক্ষেতের কাজে। ওধারে হাট, মস্ত বড় বড় কয়েকটা অশথ গাছ—বটগাছ, তার নিচেয় হাট বসে হপ্তায় একবার করে। কাকার বাড়ির বারান্দা থেকে এসব দেখা যায়। তারপর হাঁ হাঁ করা রদ্দুরে কাকাকে দেখতাম দূর থেকে মেঠো পথ ধরে বাড়ির দিকে আসছেন আর কাকার চাপরাশি মাথায় ছাতা ধরে পাশে পাশে চলেছে!

প্রথম দিন বেশি কথা হয়নি।

জিজ্ঞেস করলেন—কখন এলেন?

বললাম—কাল।

—ট্রেনে কোনও কষ্ট হয়নি তো?

বললাম—না—

বললেন—আপনার কোনও জিনিস দরকার হলে আমাকে বলবেন, নতুন জায়গা, কিছু লজ্জা করবেন না—

কথাগুলো শুনে কেমন যেন অস্বস্তি লাগলো।

বললাম—আমাকে 'আপনি' বলে ডাকবেন না, আমি এবার সবে ম্যাট্রিক দিয়েছি—

বললেন—তা হোক, আপনি আমাদের নগেনবাবুর ভাইপো—আমাদের বাড়িতেই তো অতিথি—আপনাদের কোনও কষ্ট না হয় সে তো আমারই দেখা কর্তব্য—

আমি চুপ করে রইলাম। শ্রীবিলাসবাবু বললেন—জলের কোনও কষ্ট হয় না তো আপনাদের?

বললাম—আমি তো সবে কাল এসেছি, চৌবাচ্চার তো অঢেল জল রয়েছে দেখলাম—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—জল যদি কম দেয় তো খবরটা দেবেন তো, কেদারকে আমি রেখেইছি আপনাদের জলের জন্যে—

তারপর হঠাৎ ডাকলেন—কান্তি, মা কী করছে রে?

কান্তি পাশেই পাখা নিয়ে বাতাস করছিল। বললে—এই তো দেখে এলুম পূজোর ঘর থেকে মা বেরোলেন এখন—

—যা তো, নগেনবাবুর ভাইপোকে ভেতরে নিয়ে যা, বলবি ইনি নগেনবাবুর ভাইপো, কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছেন—যান্, আপনি যান্ কান্তির সঙ্গে—

প্রথম একদিন দু'দিন বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়নি। পাশে গিয়ে বসতাম, কান্তিবাবু মহাভারত রামায়ণ পড়ে শোনাতেন।

বললাম—আপনি মহাভারত রামায়ণ পড়তে বুঝি খুব ভালো-বাসেন?

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—এর মত বই আর পৃথিবীতে আছে নাকি?—এই দেখুন না—

বলে গড় গড় করে পড়তে লাগলেন—

হেনকালে কুন্তীদেবী গিয়া সেই স্থানে
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মধুর বচনে,
কর্ণ মহাবীর ছিল আমার নন্দন
সুতপুত্র বলি যারে বলিলা বচন
কন্যাকালে জন্ম হৈল আমার উদরে
সূর্যের ঔরসে জন্ম জানাই তোমারে—

বললেন—আমার তো আর কোনও খেয়াল নেই, পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকি, বিদ্যেও বেশি নেই আপনাদের মত—এই মহাভারত পড়েই সময় কাটাই—

বললাম—ভোরবেলা রোজ কোথায় যান?

বললেন—ওই একটা ইস্কুল করেছি, নিজে তো বেশিদূর লেখাপড়া করতে পারিনি, তাই গাঁয়ের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে কিছু প্রায়শ্চিত্ত করছি—

মনে আছে বাড়ির ভেতরে যেদিন গিয়েছিলাম, শ্রীবিলাসবাবুর

মাকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। এত রূপ, এমন চেহারা মানুষের হয়? বয়েস হয়েছে অনেক। ভিজে চুলগুলো পিঠের ওপর এলিয়ে দিয়েছেন। বিধবার শ্বেত-শুভ্র শুচিতা যেন সারা মুখে মাখানো। আমাকে কান্তির সঙ্গে দেখে যেন অবাক হয়েছিলেন —কিন্তু মুখে তার কোনও আভাষ ছিল না। কান্তি সামনে গিয়ে বললে—মা, এই নগেনবাবুর ভাইপোকে এনেছি, দাদাবাবু পাঠিয়ে দিলেন আপনার কাছে---

—ও, তুমিই নগেনবাবুর ভাইপো, বেশ বেশ— বিলাস বলছিল আমাকে বটে, তা তোমাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো, অসুবিধে হলে বলবে—

তারপর কাকে ডাকলেন—ওরে—

তার আগেই আমি নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছিলাম।

এক পা পিছিয়ে গিয়ে আমাকে ধরে বললেন—থাক্ থাক্, বিলাসের কাছে শুনছিলাম তুমি এবার পরীক্ষা দিয়ে এসেছ—

পাশে কে একজন এসে দাঁড়াল। অপূর্ব রূপসী। ঘোমটা দেওয়া মুখখানা, সকালবেলাই স্নান করে সিঁদুরের টিপ কপালে লাগানো।

শ্রীবিলাসবাবুর মা বললেন—বৌমা, এই নগেনবাবুর ভাইপো, এর জন্যে একটা রেকাবীতে জলখাবার এনে দাও তো— বোস তুমি এখেনে—

বাড়িতে খাবার সময় কাকীমা বললে—কী রে খাচ্ছিস না কেন, ক্ষিদে নেই বুঝি?

কাকীমার রান্না খুব ভালো ছিল। সারাদিন কোন কাজও ছিল না রান্না ছাড়া। কাকা চলে যেতেন বাইরে মাঠের তাঁবুতে। তারপর থেকেই কাকার আর্দালীকে নিয়ে রান্নার তদ্বির তদারক চলতো কাকীমার। এক-একদিন নারকোল, এক-একদিন ডাল-বাটা। সামান্য জিনিস দিয়ে সব অসামান্য পদ তৈরি হতো কাকীমার হাতে। কাকার খাওয়ার বিশেষ সময়ও ছিল না,

লোভও ছিল না। সময় আর লোভ যদি কিছুতে কাকার ছিল, সে শুধু আপিসের কাজ। সারাদিন তো বটেই, সারা রাত কাজ করতে পেলেও যেন কাকা বেঁচে যেত।

কাকীমার কোন কাজ ছিল না। একমাত্র কাজ ছিল কাকা যেখানে বদ্‌লি হবে, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে যাবে। কাকীমার পড়াশোনার বা সেলাই-ফোঁড়ার বাতিক ছিল না। কোথাও গেলেই সেখানে কী কী জিনিস পাওয়া যায় তারই খোঁজ নিত। কাটোয়ার ডাঁটা, কেষ্টনগরের সরপুরিয়া, মেদিনীপুরের ডাল, বহরমপুরের মণ্ডা, নদীয়া জেলার খাজা কাঁঠাল। কাকীমা আর্দালীকে দিয়ে হাট থেকে কিনতে পাঠাতো। কাকার নিষেধ ছিল কারো কাছ থেকে যেন কোনও জিনিস বিনা-পয়সায় না নেওয়া হয়। কাকীমাই সব সংগ্রহ করতো, কিন্তু ছেলে-পুলে ছিল না বলে রান্না করে খেয়েও তৃপ্তি হতো না। যখন ইস্কুলে ছুটি হতো আমি প্রায়ই যেতাম কাকীমার কাছে। পেট ভরে কাকীমার রান্না খেয়ে দু'দিনে শরীরটা সারিয়ে নিয়ে আসতাম।

কাকীমা রোজ আমার সামনে বসে এটা-খা ওটা-খা করতো।

কিন্তু সেদিন কিছুই খেতে পারলাম না।

কাকীমা সাহেবগঞ্জ থেকে পেড়া আনিয়েছিল লোক পাঠিয়ে। নানা রকম তরকারি করেছিল। কোথা থেকে ইলিশ মাছ যোগাড় করেছিল। সব পড়ে রইল, মুখে দিতে পারলাম না।

কাকীমা দুঃখ করতে লাগলো।

বললে—এবার কলকাতা ফিরে গেলে দিদি বলবে আমার কাছে ছেলে পাঠিয়ে রোগা করে দিয়েছে—কী হলো তোর? রোজ তো খাস, আজ কী হলো!

বললাম—ক্ষিদে নেই কাকীমা—

কাকীমা বললে—সকালে তো বেশি খাস্‌নি কিছু—ক্ষিদে নেই-ই বা কেন?

বললাম—ওঁদের বাড়ি গিয়ে খেয়েছিলাম আজ সকালে।

—কাদের বাড়ি ?

কাকীমা অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে।

বললাম—ওই শ্রীবিলাসবাবুদের বাড়ি—

কাকীমা বললে—ওঁদের বাড়িতে খেতে গেলি কেন ? তোর কাকার কানে গেলে কিন্তু রাগ করবেন খুব, সেদিন মাছ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ওঁরা, তাই-ই নিতে বারণ করলেন, শুনলি না ?

বললাম—ছাড়লে না যে কিছুতেই—

—কে ? ছাড়লে না কে ?

বললাম—ওই শ্রীবিলাসবাবুর বউ !

—কর্তার বড়ছেলে ? কর্তার বড়ছেলের আবার বিয়ে হলো কবে ? ও তো ছোটছেলের বউ রে—

ছোটছেলের বউ ! আমি অবাক হয়ে গেলাম। তা হলে শ্রীবিলাসবাবুর বউএর কী হলো ?

কাকীমা বললে—কর্তার বড় ছেলে তো বিয়ে করেনি—

—কেন কাকীমা, বিয়ে করেনি কেন ?

শ্রীবিলাসবাবুকে দেখতে কিন্তু চমৎকার। কোঁকড়া চুল, তার ওপর চুলগুলো মাথার দুপাশে দু'ভাগ করা। গায়ে একটা ফতুয়া। সকালবেলা দেখেছি আমার ঘুম ভাঙবার আগেই বেরিয়ে গেছেন। তখন বারান্দাটা ফাঁকা। আমলা কর্মচারীরা কেউ আসেনি তখন। কাকা বেরিয়ে যাবার পর হরিশবাবু আসে। তারপর আসে আর সবাই। পাশের দেরাজ থেকে খেরো খাতা বেরোয়। দোয়াত কলম বেরোয়। আর উঠোনে আস্তে আস্তে জড়ো হয় প্রজা পাঠক সবাই। কারো বাকি খাজনা, কারো আর্জি, কারো খয়রাতি সাহায্য, কারো দাদন। সরকারের খাজনা মকুব করতে হবে, চাকরানের বিলি বন্দোবস্ত করতে হবে। ও-সব কাজের কিছু বুঝি না। শুধু কান দিয়ে শুনতে পাই। চাষীরা ধান চাল পোয়াল

মেপে মেপে মরাইতে তুলে দিয়ে যায়। বেশ গোবর লেপা ঝকঝকে তকতকে উঠোন। পশ্চিমের দিকে গাছের গুঁড়ির ওপর বসানো সার সার মরাই। তার তালা খোলা হয়। ফর্ ফর্ করে কতকগুলো চামচিকে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। তার ওদিকে গোয়াল-শাল। কেরষান এসে দেখেছি বিকেল বেলা একপাল গরু নিয়ে গোয়াল-শালে ঢুকিয়ে দেয়। তার পাশেই ওদের রান্নাবাড়ি। সন্ধ্যেবেলা যখন সবে অন্ধকার নেমে আসে চারদিকে তখন ফাঁক দিয়ে জমাট-বাঁধা ধোঁয়া আকাশের দিকে ওঠে। তার সাঁজাল দেবার সময়। গরু বাছুরকে মশায় কামড়াবে না। ঘরের ভেতরে মশা ঢুকবে না। শুধু বাইরে পালে পালে মশাগুলো আকাশে দল বেঁধে উড়তে থাকে।

প্রথম এখানে এসে কাকীমা একদিন গিয়েছিল ওদের বাড়ির ভেতর।

কত ঘর, কত মহল। রান্নার মহল, আঁতুড় ঘরের সার, চাকর মহল, কুয়োতলার উঠোন, ঠাকুর-বাড়ি দরদালান, দেউড়ি, শোবার ঘর, বাতিঘর, তারপর বার-বাড়ি।

শ্রীবিলাসবাবুর মা এক-একটা করে জায়গা দেখিয়েছেন আর বলেছেন—এদিকটা কর্তার নিজের হাতে করা—তিনি থাকতে বাহার ছিল অনেক, তিনিও চলে গেছেন, আমারও শরীর আর বয়না, নিজের চোখে সব তো আর দেখতে পারিনে—

কাকীমা বলেছিল—ছেলেদের বিয়ে দেননি ?

—ছোটছেলের বিয়ে দিয়েছি, ডাকছি, অ বৌমা—

পাশের মহল থেকে একটি ছোট্ট রাঙা টুকটুকে বউ বেরিয়ে এসে কাকীমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে। কাকীমা তার চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খাবার সময়ে মুখখানা দেখে অবাক হয়ে গেছেন। এমন রূপ! চোখ জুড়িয়ে যায় যেন। কপাল, ঠোঁট নাক যেন পটে আঁকা।

—এটি আমার ছোটছেলের বউ—

—এর বাপের বাড়ি কোথায় ?

শ্রীবিলাসবাবুর মা বললেন—রাজসাহী জেলার ভৈরবপুর চেনেন ? সেই ভৈরবপুরের বড়-তরফের নাতনি, ভারি লক্ষ্মী বউ হয়েছে আমার—কর্তার বড় সাধ ছিল বিলাসের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে যান—

থেমে গেলেন শ্রীবিলাসবাবুর মা।

কাকীমা বললেন—বড়ছেলের বিয়ে হয়নি আপনার ?

শ্রীবিলাসবাবুর মা বললেন—এ-বউএর সঙ্গে তো বিলাসেরই বিয়ে একেবারে ঠিক-ঠাক—

—তা হলো না কেন বিয়ে ?

শ্রীবিলাসবাবুর মা বললেন—কর্তা তখন বেঁচে, ভৈরবপুরের লোক ঘটকালি করতে ঘটক পাঠালো কর্তার কাছে, তিনি মেয়ে পছন্দও করে এলেন—ছেলে বেঁকে বসলো—বললে বিয়ে করবো না—

—তারপর ?

জমিদার বাড়ির বড়ছেলে বিয়ে করবে না এ কেমন কথা ! রোজগার করতে হবে না, রোজগার করে বউকে খাওয়াতেও হবে না—তবু বিয়ে করবে না, এ কেমন কথা !

কাকীমা সে-গল্প শুনেছিলেন। গ্রামময় কথা উঠলো। এ-বাড়ি ও-বাড়ি এ-পাড়া ও-পাড়া সর্বত্র।

কর্তামশাই, মছলন্দপুরের কর্তামশাই, কথা দিয়ে এসেছেন ভৈরবপুরের বড়-তরফের কাছে ! মেয়েটি সুলক্ষণা। ভালো করে দেখতেও হয়নি, এক পলকেই বুঝে নিয়েছেন এ-মেয়ে ঘরের লক্ষ্মী, ঘরে এলে ঘর লক্ষ্মীমন্ত হয়ে উঠবে।

তখন ওইখানে কর্তা রোজ আমলা-কর্মচারীদের নিয়ে দরবার করতেন। ওই যেখানে এখন শ্রীবিলাস বসে। তামাক পুড়তো

গড়গড়াতে আর একে একে সকলের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ-মামলা-মকর্দমার ফয়সালা করতেন মুখের কথায়। তাঁর মুখের কথাই ছিল আইন। কেউ টু শব্দ করতে পারতো না তাঁর হুকুমের পর। কিন্তু বেঁকে বসলো বড় ছেলে।

বড় আঘাত পেয়েছিলেন তিনি। গ্রামের ইস্কুল থেকেই পাশ করে সদরে কলেজে পড়তে গিয়েছিল। সাহেবগঞ্জের সমাদ্দার-বাড়িতে থেকে শ্রীবিলাস পড়তো। কর্তামশাই দেখে আসতেন গিয়ে মাঝে মাঝে। পড়াবার মাস্টার ছিল। ইংরিজী, অঙ্ক, ইতিহাস সব আলাদা-আলাদা মাস্টার। আলাদা চাকর-বাকর, ঝি সব ছিল। বড় ছেলে পড়বে, তারপর ছোটছেলেও কলেজ ভর্তি হলে ওইখানে থেকে পড়বে! ওখানে খাওয়া-থাকা-পড়াশোনার জন্যেই কর্তামশাই ও-বাড়ি তৈরি করেছিলেন। কর্তামশাই যখন যেতেন, খবর না দিয়েই যেতেন। দেখতেন—ছেলে এসে পায়ের ধুলো নেয়!

জিজ্ঞেস করতেন—পড়াশোনা কেমন হচ্ছে তোমার?

শ্রীবিলাস বলতো—ভালোই হচ্ছে মনে হয়—

—শরীর রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন? রাত জেগে পড়ো নাকি?

—পরীক্ষার সময় জাগতে হয় একটু।

—সারা বছর গেল, এখন রাত জেগে কী হবে? —এ-সব কিসের বই?

দেয়ালের তাক থেকে কয়েকটা বই তুলে নিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। এ-সব কী বই! এ-সব বই কি ক্লাসে পড়ানো হয় নাকি? দেখলেন সাধু সন্ন্যাসীর ছবি লাগানো মলাটের ওপর। যোগ না ব্যায়াম কি-সব লেখা রয়েছে। প্রাণায়াম ট্রাণায়ামের কথাও লেখা রয়েছে। সব পড়া হলো না। একটু-একটু চোখ বুলোতেই বোঝা গেল।

বললেন—এ-সব বই পড়ো নাকি তুমি?

শ্রীবিলাস বললে—পড়ি—

আর কিছু বলেন নি কর্তামশাই, চুপ করে গিয়েছিলেন। খারাপ বই তো নয়, পড়ুক না। তবে পরীক্ষার সময়ে না-পড়লেই ভালো।

মাস্টারদের ডাকলেন। মাসে মাসে মোটা মাইনে দেন। কর্তামশাইএর ডাকে সবাই এসে হাজির হয়েছিলেন।

ইংরিজীর মাস্টার বললেন—পড়াশোনা তো ভালোই হচ্ছে শ্রীবিলাসের, আমি চেষ্টার ত্রুটি করছি না কিছু—

ইতিহাস, অঙ্ক, সকলেরই ওই এক কথা।

ভৈরব বললে—দাদাবাবু তো লেখা-পড়ি নিয়েই থাকে কর্তাবাবু—

—মেলামেশা করে কাদের সঙ্গে? দেখেছিস কিছু! না ঘুমিয়ে থাকিস কেবল!

এমনি করে শ্রীবিলাসের লেখাপড়ার তদারক শুধু মাস্টারদের ওপর ছেড়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি কর্তা। খোঁজ খবর রাখতেন, দেখতেন, যেতেন। আর কি মানুষ করে এর চেয়ে?

শ্রীবিলাসবাবুর মা বললেন—ওমা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছি—চলুন বসবেন চলুন—

কাকীমা বললেন—না উনি আবার আসবেন এখনি মাঠ থেকে—

—তা হোক, বিলাস বলেছে আমাকে, আপনাদের কোনও কষ্ট না হয় দেখতে, এ আপনাদের নিজের ঘর-বাড়ি বলেই মনে করবেন—

বললেন—আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আমিই তো করতাম, তা বিলাস বললে ওঁরা নিজেরাই রান্নাবান্না করবেন—

—এই দেখুন, এই আমার বড় ছেলের ঘর—

কাকিমা ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলেন।

ছোটছেলের ঘর এমন নয়। সে-ঘর নানাকায়দায় সাজানো। ঘরের ভেতর ঢুকে মনে হয় না আর মছলন্দপুরে আছি। দামী ঘড়ি, চেয়ার, খাট, আলমারী।

শ্রীবিলাসবাবুর মা বললেন—এ-সবই ঘর সাজিয়ে দিয়েছেন ভৈরবপুরের বড়-তরফের বাবুরা! তাঁদের অনেক সাধের এক মেয়ে—

কাকীমা বললেন—বড় ছেলের সঙ্গে তাহলে বিয়ে হলো না?

শ্রীবিলাসবাবুর মা বললেন—হলো না বলেই তো ছোট ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলেন কর্তা—বললেন, কথা দিয়ে এসেছি তাঁদের, কথার খেলাপ করে না সমাদ্দাররা।

—তা বড় ছেলে আপনার বিয়ে করলে না কেন?

—এই দেখুন না, ঘর দেখছেন না, ঘর দেখেই বুঝতে পারছেন না?

সত্যিই একটা খাট, খাটের ওপর তোশক আর তার ওপর শেতলপাটি পাতা। মাথার বালিশের কাছে খানকতক বই। দেয়ালের তাকে বই। সর্বত্র বই সাজানো। ঘরে আর কোনও আসবাব নেই কোথাও।

—এই সন্ন্যাসী ছেলে আমার, দিনরাত কেবল লেখাপড়া, বই আর ইস্কুল নিয়েই আছে।

কাকীমা বললেন—ইস্কুল! কা'র ইস্কুল?

শ্রীবিলাসবাবুর মা বললেন—ওই বড় ছেলে এক ইস্কুল করেছে ছেলেমেয়েদের জন্যে, গরীবদের জন্যে, কেবল সেই ইস্কুল আর ইস্কুল, এই ভোর বেলাই সেই ইস্কুলে পড়াতে গেছে, ছেলেমেয়েদের নিজে পড়াবে, সকলের বাড়ি-বাড়ি যাবে—কাছারির কাজ নেহাত না-করলে-নয় তাই করে, মন পড়ে থাকে ওর ইস্কুলের জন্যে কেবল—

শ্রীবিলাসবাবুর মা বললেন—সেই ছেলে কত বছর পরে আবার

যা হোক ফিরলো—তখন কি জানতাম ফিরবে ও, আমরা তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম—

কর্তমশাই তখনও বেঁচে। শ্রীবিলাসবাবুর মা সেই সব গল্প করেছিলেন। কাকীমা সারা বাড়িটা ঘুরে ঘুরে সব দেখছেন। কর্তার বড় শখ ছিল। পাখী পুষেছিলেন, গরু পুষেছিলেন। ফুলের বাগান করেছিলেন, ফলের বাগানও করেছিলেন। কাশী থেকে পেয়ারার বীজ আনিয়াছিলেন, মজঃফরপুর থেকে লিচুর চারা। মেয়ে নেই, ওই দুই ছেলে কেবল। কিন্তু সেবার বিয়ের কথা উঠতেই বড় ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল—

কাকীমা বললেন—নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কেন?

কেন যে সেদিন সমাদ্দার-বাড়ির বড় ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল তা কেউ জানে না। বৈশাখ মাস। মাসের তেইশে বিয়ের তারিখ হয়ে গেছে। ভৈরবপুরের বড়-তরফের আয়োজন অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। তাঁদের বাড়ির প্রথম মেয়ের বিয়ে। আত্মীয়-স্বজনের কাছে খবর দেওয়াও হয়ে গেছে। সাহেবগঞ্জেও কর্তামশাই লোক পাঠিয়েছেন। হরিশবাবু চলে গেছেন কর্তামশাই-এর জরুরি চিঠি নিয়ে। কিন্তু গিয়ে দেখলো চাকর-বাকর সব হতভম্ব। সবাই সকলের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। কী খবর? না, বড় দাদাবাবুকে ভোর থেকে বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না। শোবার ঘরের দরজা খোলা হাট করা।

—কইরে, বড়দাদাবাবু কোথায়?

কারো মুখে কোনও উত্তর নেই। মাস্টারবাবুদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিলে হরিশবাবু। কেউ জানে না কিছু! বলেন কী? কোথায় গেলেন? কেন গেলেন? অনেক প্রশ্ন, অনেক কৌতূহল সেদিন জমে উঠলো সাহেবগঞ্জের ছেলে-মেয়েদের মহলে। হেড্‌ মাস্টার, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল—সবাই ছুটে এলেন। এই সেদিনও তো ক্লাসে গেছে। একটু গম্ভীর-গম্ভীর দেখাচ্ছিল বটে ইদানীং।

কথা বলতো কম। লাইব্রেরী থেকে যোগ-টোগ সম্বন্ধে বই নিয়ে পড়াশোনা করতো। হাতে সে-সব বই কেউ-কেউ দেখেছে। কিন্তু তাতে কী? সমাদ্দার-বাড়ির ছেলে আর রাজার ছেলে, ও-দু'টো একই কথা! কীসের অভাব ছিল তার? কীসের দুঃখ ছিল তার?

শ্রীবিলাসবাবুর মা বললেন—আমি তো সাতদিন সাতরাত খাইনি ঘুমোইনি—পুত্রশোক হলেও মানুষ এত কাতর হয় না মা—

হরিশবাবু কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এল মছলন্দপুরে।

কর্তামশাই তখন ছেলের বিয়ের ফর্দ তৈরির তদারক করছিলেন। কর্তা শুনছিলেন আর মুহুরি বসে বসে লিখছিল।

—শ্রীল শ্রীযুক্ত সংসারভূষণ বাগচি, শ্রীল শ্রীযুক্ত ভূপতি প্রকাশ…

এই রকম অনেক নাম। প্রথম ছেলের বিয়ে, কর্তামশাই নিজে বাপের এক সন্তান। কিন্তু ছেলেদের মাতুলগোষ্ঠী বিরাট, শাখা-প্রশাখা বিরাটতর।

বললেন—মাঝেরগাঁর ফর্দটা একবার শোনাও তো দেখি—

অনেক জ্ঞাতিগোষ্ঠী মারা গেছে। পুরোন খাতায় তাঁদের নাম তখনও কাটা হয়নি।

ধমকে উঠলেন কর্তামশাই।

—কী রকম বেয়াক্কেলে কাজ তোমাদের, খাতা কেন সারা হয় না সময়মত, তাহলে আমলা-মুহুরি রাখা কী জন্যে? আজ বাদে কাল বিয়ে, এখনও ফর্দ তৈরি নেই, কবেই বা পত্র যাবে, আর কবেই বা তাঁরা আসবেন—

মুহুরি আমতা আমতা করতে লাগলো—

—আজ্ঞে, আমি জানতাম না!

—না জানো তো কাজ করছো কেন, ছেড়ে দাও কাজ, নতুন মুহুরি রাখবো আমি, যারা কাজ-কর্ম জানে, কাজের তহুরি জানে—হরিশ কোথায়?

আর পড়বি তো পড় ঠিক সেই মুহূর্তে হরিশবাবু সামনে এসে

হাজির। কাঁচু-মাচু মুখ। ভয়ে সর্বাঙ্গ কাঁপছে! এত সব কাণ্ড জানে না। খবর দিলে—বড়দাদাবাবু সাহেবগঞ্জে নেই—

—কী বললে ?

প্রথমে বুঝতে পারেন নি কথাটা কর্তামশাই।

শ্রীবিলাসবাবুর মা বললেন—সাত দিন সাত রাত পরে যখন জ্ঞান হলো আমার, দেখি বাড়ি-ঘর লোকজনে ভরে গেছে, বাপের বাড়ি থেকে দাদা-দিদিরা এসেছে, মাসি কাকী সব—আমায় পাখার বাতাস করছে চারপাশে ঘিরে—

বললাম—আমার কী হয়েছিল ?

কেউ কিছু বলে না। সাজ সাজ রব পড়ে পড়ে গেছে বাড়িতে। উঠোনে সামিয়ানা খাটানো হচ্ছে। দলে-দলে জন-মজুররা চিঁড়ে-দই খাচ্ছে আর কাজ করছে। রান্নার কাঠ জড়ো হয়েছে পাহাড়-প্রমাণ। সার-সার মাটির জালা বসেছে উঠোনে। কুমোর বাড়ি ঝেঁটিয়ে মাটির গেলাস খুরি এসেছে। কলাপাতার ডাঁই জমেছে দালানে। গাঁয়ের চাষা-ভুষোর ছেলে-মেয়েরা বার-বাড়ির উঠোনে হৈ-চৈ করছে!

ও-সব কী! কীসের আয়োজন! ভাবলাম—তবে কি বিলাস ফিরেছে ?

কর্তামশাই-এর দেখা পাওয়াই ভার। ডাক্তার এসে উঠতে বারণ করে গেছে। সারাদিনরাত শুয়ে আর সময় কাটে না। কেউ কিছু বলে না। একদিন কর্তামশাই এলেন ঘরে।

বললেন—আজ ভৈরবপুরের বড়-তরফের কর্তারা আসবে, তৈরি হয়ে থেকো তুমি—

বললাম—বিলেস ফিরেছে আমার ?

—সে না ফিরুক, আমি কথার খেলাপ করতে দেব না, বিয়ে আমি ওই পাত্রীর সঙ্গে দেবই—

—কা'র সঙ্গে ?

—কেন ? বিলাস নেই বলে কি আমার ছেলে নেই ?

তা তাই হলো। যথানিয়মে তেইশে বোশেখেই বিয়ে হলো। ছোট ছেলে শ্রীদামের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল সেই রাত্রেই। কথার খেলাপ হলো না কর্তামশাই-এর। ধুম-ধাম কিছুরই কম্‌তি হলো না। গ্রামের সমস্ত লোক তিনদিন তিনরাত ধরে পাতা পেতে খেয়ে গেল সমাদ্দার-বাড়িতে।

কাকা বাড়ি আসতেই কাকীমা বললেন—এই যে, ও ওদের বাড়িতে গিয়ে খেয়ে এসেছে আজ কী সব—

কাকা বললেন—কী খেয়েছিস্‌ রে।

বললাম—শ্রীবিলাসবাবু ডাকলেন, আমি খাবো না বলেছিলুম, কিন্তু কিছুতেই ওঁর মা ছাড়লেন না—

—কী খেতে দিলে ?

বললাম—নারকোল নাড়ু, আর ক্ষীরের বরফি—

কাকীমা বললেন—অথচ আমি এদিকে ওর জন্যে খাবার তৈরি করে রাখলাম, এসে কিছুই মুখে দিতে পারে না—

মনে আছে সত্যিই সমাদ্দার-বাড়ির ভেতরে গিয়ে শুধু খাবারই নয়, মানুষগুলোকেও যেন খুব মিষ্টি লেগেছিল সেদিন। শ্রীবিলাস-বাবুর মাকে সেদিন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলাম। প্রণাম করে যেন তৃপ্তি পেয়েছিলাম। আর শ্রীদামবাবুর স্ত্রী, তাঁকেও যেন খুব ভালো লেগেছিল। কী সুন্দর যে বউটি।

বউটি বলেছিল—এই দেখুন মা, কিছু খাচ্ছে না ও,—

শ্রীবিলাসবাবুর মা বললেন—কেন বাবা, খেয়ে নাও, ও-সব আমার ঘরের তৈরি, যাও বৌমা, আর একটা নাড়ু দাও তো ওকে—এই বয়েসেই এত লজ্জা তোমার।

খেতে বসবার জায়গা থেকে শ্রীবিলাসবাবুর ঘরটাও নজরে পড়ছিল। দেয়ালের গায়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একটা মস্ত ছবি

টাঙানো। আর একপাশে শ্রীবিলাসবাবুর মায়ের একখানা ছবি। দু'টোই সামনাসামনি। প্রত্যেকদিন শ্রীবিলাসবাবু ঘুম থেকে উঠে ইস্কুলে যাবার আগে মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে তবে দিনের কাজ শুরু করেন। কাকীমার কাছেই এ-সব কথা শুনেছিলাম। যেদিন মা থাকেন না কাছে, শ্রীবিলাসবাবু ডাকেন—মা, ওমা—

মা ঘুম থেকে ভোরবেলাই ওঠেন। কিন্তু সকালে উঠে তাঁর অনেক কাজ।

বলেন— এই যে বাবা, আমায় ডাকছিলি?

শ্রীবিলাস নিচু হয়ে মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে বলে—আসি মা—

তারপর চলে যেতে যেতে বলে—শ্রীদাম কোথায়?

—এখনও তো ওঠেনি, ডাকবো?

—মা, সদরের কাছারিতে একবার গেলে হতো, ভক্তদের মামলাটার কবে দিন পড়লো—

—তা ডেকে দিচ্ছি।

শ্রীবিলাস বলে—না থাক্—

ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। বৌমার হয়ত ঘুমোতে রাত হয়েছে। বৌমার ঘুম ভাঙলে নিশ্চয় ডেকে দিত। তা থাক্, সদরের উকীলকে খবর দিলেই চলবে। ঘুমোক্ এখন ওরা।

মা বলেন—ও ছেলে যে আবার ফিরে আসবে, আবার জমি-জমা দেখবে, তা কি তখন ভেবেছিলাম মা—

কেউ আত্মীয়-স্বজন এলে বলে—তা মাসীমা, এবার একটা বিয়ে দাও তোমার ছেলের—

মা বলেন—না মা, ভয় করে, তবু যা হোক ইস্কুল-টিস্কুল নিয়ে আছে, বিয়ের কথা তুললে আবার হয়ত বেরিয়ে যাবে, তবু তো এখন ছেলে আমার চোখের সামনে আছে—

শ্রীবিলাস যে ফিরবে সে-আশা কারো ছিল না। কত খোঁজা

হলো। কত জায়গায় লোক পাঠানো হলো। কাশীতে গুরুদেবকে খবর দেওয়া হলো। হরিদ্বারে পুরুতমশাইএর ভাইকে সংবাদ দেওয়া হলো। সবাই জানালে—নেই। কোথাও নেই। ছোট ছেলে শ্রীদাম তখন বিয়ে করেছে। সে-ও ইস্কুলে পড়ছিল। বিয়ের পর লেখাপড়া বন্ধ হলো। লেখাপড়া করে আর কী হবে! বাড়িতেও তখন কোনও আনন্দ নেই। ছোট বউটি সমাদ্দার-বাড়িতে এসে যেন কেমন অবাক হয়ে গেল এ-বাড়ির ভাব-ভঙ্গী দেখে।

মা বউকে দেখে কাঁদতে কাঁদতে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেন।

বলেন—লক্ষ্মী বউ তুমি আমার মা, তুমি এলে, প্রাণটা জুড়োল মা আমার—

সমাদ্দার-বাড়িতে নতুন বউ এসেছে। এ-পাড়া ও-পাড়া এ-গ্রাম ও-গ্রাম সব মেয়ে-বউরা সমাদ্দার-বাড়ির বউ দেখতে এল। খাসা বউ হয়েছে। বড় ছেলের সঙ্গে বিয়ে হতো যে-বউএর, সেই বউ ছোট ছেলের বউ হয়েছে। তা হোক, বেঁচে বর্তে বাড়ি আলো করে থাক্। এই বউ-ই তোমার সব দুঃখ ভোলাবে মা, রাজরাণী হয়ে বেটার বউ-এর সেবা-যত্ন নাও। বউ নয়তো সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! ছোটছেলে শ্রীদাম জমিদারীর কিছু বোঝে না। ছোটবেলা থেকে লেখাপড়া নিয়ে কাটিয়েছে—হঠাৎ তার কাঁধে দায়িত্ব চাপালে চলবে কেন? বউ আসবার পর থেকে শ্রীদাম বউ নিয়েই মেতে থাকে, বউও সেজে-গুজে বেড়ায়।

শ্রীবিলাসবাবু বলেছিলেন—এই দেখুন, জমিদারীর কাজ কি আমার দ্বারা পোষায়?

মহাভারতখানা পড়তে পড়তে বলতেন—শ্রীদাম যদি চালাতে পারতো এ-সব তো আমি আমার ইস্কুল নিয়েই থাকতাম—

কাকীমা বলেছিল—কেবল ইস্কুল আর ইস্কুল—ইস্কুল নিয়েই বড় ছেলে দিনরাত মেতে আছে—

কাকা বলতো—আমারই হয়েছে জ্বালা, কোনও জমিটার বন্দোবস্ত পাকা নয়—দেখবার লোক না থাকলে যা-হয়!

শ্রীবিলাসবাবু বাইরে থেকে এসে ডাকেন—মা—

ছোট বৌমা কাছাকাছি বুঝি কোথাও ছিল। ভাশুরকে দেখে লম্বা ঘোমটা দিয়ে সরে দাঁড়াল।

মা এসে বললেন—এই যে, এসেছিস্ বাবা—

শ্রীবিলাস বললে—তুমি ডেকেছিলে কেন?

মা বললেন—ভৈরবপুরের বড়তরফের চিঠি এসেছে, এই দেখ—বৌমাকে একবার পাঠাতে লিখেছে—বলে চিঠিটা এগিয়ে দিলেন।

শ্রীবিলাস চিঠিটা পড়ে বললে—বৌমা বাপের বাড়ি যাবেন, তা আমি কী বলবো মা, তুমি আছো মাথার ওপর, তুমি যা ভালো বিবেচনা করবে, তাই হবে—

—তবু বড় ভাই, তুই আছিস মাথার ওপর, তোর মত না নিয়ে কি বৌমাকে পাঠাতে পারি?

বাপের বাড়ি যাবার দিন মাকে প্রণাম করতে এল বৌমা। বৌমা আর শ্রীদাম দু'জনেই।

মা পা জোড়া বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—থাক্, বৌমা, হয়েছে, এবার তোমার ভাশুরকে প্রণাম করে যাও—

তখন সকাল বেলা। ভোরই বলা চলে। ভোরবেলাই ট্রেন, গরুর গাড়ি তৈরি, ভৈরবপুর থেকেও লোক-লস্কর হাজির হয়েছে। কিন্তু শ্রীবিলাসের তখনও জপ-আহ্নিক শেষ হয়নি। তার ঘরের দরজা তখনও বন্ধ। সকাল থেকে শ্রীবিলাস আহ্নিক করতে বসে। তারপর জপ সেরে মায়ের পায়ে প্রণাম সেরে ইস্কুলে যায়।

মা বাইরে থেকে ডাকলেন—বিলাস একবার বাইরে এসো, বৌমা যাচ্ছে—

দরজার খিল খুলে গেল।

মা বললেন—বৌমার ট্রেনের সময় হয়ে গেছে, তোমায় একবার প্রণাম করতে এসেছে—

বিলাস বললে—একটু দাঁড়াও মা—

বলে মায়ের পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম সেরে সরে দাঁড়াল।

মা বললেন—নাও, বৌমা, এবার প্রণাম করো ভাশুরকে—

শ্রীবিলাস স্থির হয়ে দাঁড়াল খানিকক্ষণ, বৌমা প্রণাম করলো, শ্রীদামও প্রণাম করলো। তারপর ডান হাত দিয়ে ঘোমটাটা একটু টেনে সরে গেল বৌমা।

শ্রীবিলাস বললে—গিয়ে একটা চিঠি দিতে ভুলো না মাকে—

গরুর গাড়ি দু'টো যখন সমাদ্দার-বাড়ি ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে আমবাগান সর্ষেক্ষেত পার হয়ে গেল, ততক্ষণে শ্রীবিলাসবাবু হাঁটা পথে ইস্কুলে গিয়ে হাজির হয়েছেন। লম্বা-চওড়া মস্ত ঘর একখানা। খান কয়েক বেঞ্চি সার সার পাতা। মাটির দেয়াল আর টিনের চাল। দেয়ালের পাশে মধ্যিখানে একটা চেয়ার আর বড় টেবিল একটা।

—নিকুঞ্জ, পড়া হয়েছে?

নিকুঞ্জ সোজা দাঁড়িয়ে বলে—হয়েছে মাস্টার মশাই।

—পড়া বলো, বই বন্ধ করে বলো, শুনি।

—কাশীধামে এক সাধু বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল তুলসীদাস। তুলসীদাস সাধুদের বড় ভালবাসিতেন। তিনি যখন সাধুদিগের সহিত থাকিতেন, তখন তাঁহার সময়ের হিসাব থাকিত না।

গড় গড় করে মুখস্থ বলে গেল নিকুঞ্জ। এক জায়গাতেও আটকাল না।

শ্রীবিলাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তুলসীদাসের সঙ্গে সর্দার চোরের কী কথা হয়েছিল?

নিকুঞ্জ চুপ করে রইল। শ্রীবিলাসবাবু বললেন—বলো?

—আমি বলবো মাস্টারমশাই ?

—না, বনলতা তুমি বলতে পারো ?

মেয়েটি প্রথম বেঞ্চিতেই বসে ছিল। চুলটা আঁট করে খোঁপা বাধা একটা ডুরে শাড়ি পরণে। সেমিজের মত জামা গায়ে। মাস্টার মশাইএর কথায় দাঁড়িয়ে উঠলো।

—শোন সবাই, মন দিয়ে। বনলতার মতন লেখাপড়া করবে সবাই, কাল থেকে যে পড়া করে আসবে না তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

—মাস্টার মশাই।

ছোট একটু করুণ আবেদনের মতন শোনালো কথাটা। শ্রীবিলাসবাবু বললেন—কী, বলো ?

—আপনি আমার নাম দিয়েছেন বনলতা, ফটিক তবু আমাকে তরুবালা বলে ডাকে।

ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সব। সবাই একসঙ্গে পড়ে। এক বেঞ্চিতে পাশাপাশি। শ্রীবিলাসবাবু যেন ছোটদের সঙ্গে মিশে নিজেও ছোট হয়ে যান। আবার যেন ছোটবেলা ফিরে আসে তাঁর, এক-একদিন খেলেন ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে। গ্রামের লোক-জন অবাক হয়ে দেখে। অবাক হয়ে ভাবে। সাধু হয়ে চলে গিয়েছিলেন একদিন। তারপর বাবার অসুখের খবর পেয়ে বাড়ি চলে এসেছেন। কিন্তু দেখতে পাননি বাবাকে। তার আগেই শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁকে।

ভুবনবাবু একদিন এলেন। ভুবন হাজরা। বহু আগে মুহুরি ছিলেন কাছারিতে।

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—কি খবর ভুবনবাবু ?

ভুবনবাবু বললেন—হুজুরের কাছে এলাম, একটু কথা ছিল, তরুবালার মা বলছিল তাই আপনার কাছে একটা পরামর্শ নিতে এলাম—

—কিসের পরামর্শ ?

—তরুবালার মা বলছিল, মেয়ে তো লেখাপড়া শিখলো অনেক, এবার বিয়ের বন্দোবস্ত করবো ভাবছি, মথুরগঞ্জে একটা ভালো পাত্তোরের খোঁজ পেয়েছিলাম—

শ্রীবিলাসবাবু খানিক ভাবলেন। বললেন—বনলতা বড় মেধাবী মেয়ে, আমার ইস্কুলে আপনার মেয়ের মত মেধাবী মেয়ে আর তো নেই, বিয়ে দিন ভালো, কিন্তু বিয়ে দিয়ে দিলে আর কী লেখাপড়ার চর্চা থাকবে—সেইটে আগে ভাবুন—আর বনলতার বয়েসই বা কত ?

কোথায় কলকাতা আর কোথায় মছলন্দপুর! পৃথিবীর সভ্যজগৎ থেকে কতদূরে! কলকাতায় যখন ট্রাম-বাস দোকান-পাট আলোয় আলো, যখন গরম-গরম খবরে দিন রাত শহর মশগুল, তখন মছলন্দপুরের নিরিবিলি কোণে কোথায় জমিদার বাড়ির শ্রীবিলাসবাবু কোন্ এক অখ্যাত এক ইস্কুলের কোন্ একটি অখ্যাত মেয়ের শিক্ষা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তা নিয়ে আমার গল্প নয়। কিংবা যার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, তার সঙ্গে বিয়ে হয়নি বলে আমাদের গল্পের নায়ক ইস্কুল নিয়ে দিন-রাত মত্ত হয়ে আছেন, তা নিয়েও আমাদের গল্প নয়। সে-গল্প হলে আর এ লেখার প্রয়োজন হতো না। প্রয়োজন হলো এক অবশ্যম্ভাবী কারণে। সেই কারণটাই বলি।

আজ এতদিন পরে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আবার বনলতার সঙ্গে। এই প্রায় পনরো বছর পরে। দেখা হবার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। ভেবেছিলাম মছলন্দপুরে যাচ্ছি, সেই সঙ্গে পুরনো জায়গাটাও দেখে আসবো। দেখে আসবো সেই পুরনো সমাদ্দার-বাড়িটা। সেই ট্রেন থেকে নেমে নদী পার হওয়া, সেই মাঠ,

বাগান, সর্ষে ক্ষেত, সেই জাতিকাটা ফুলের ঝাড় আর তারপর সেই শ্যাওলা ধরা বনেদী বাড়িটা। বনেদী বাড়িটার ভেতর সেই বধূটির চেহারাও যেন চেষ্টা করলে মনে করতে পারি। সেই লজ্জা জড়ানো জড়-সড় বধূটি। ছোট ভাইএর সঙ্গে বিয়ে হয়ে সে যেন অপরাধী হয়ে পড়েছে ভাশুরের কাছে। ভৈরবপুরের বড়-তরফের মেয়ে এ-বাড়ির বড় ছেলের বউ হতে গিয়ে কী করে যে বউ হতে পারলো না, তা নিজেও সে ভালো করে জানে না। কিন্তু ভাশুরের কঠোর ব্রহ্মচর্যের সামনে যেন সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তো !

মা এসে ডাকতো—বিলাস—

যত কাজই থাক, শ্রীবিলাসের কঠোরতা যেন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত মায়ের ডাকে।

বলতো—আমাকে ডাকছো মা !

—পুরত মশাইকে খবর দিতে হবে যে একবার।

—কেন মা ?

—ছোটবউমার আবার ছেলে হবে !

যত কাজই থাক শ্রীবিলাসের, যত অনুষ্ঠানই বাকি থাক, এবং যদিও নিত্য নৈমিত্তিক প্রাণায়াম জপ-তপ সারা হয়নি, কিন্তু সে-সব পরে হবে। তখন ভালো করে রাত ফরসা হয়নি। তখনও সদর গেটের চাবি খোলা হয়নি। তখনি তৈরি হয়ে নিলেন শ্রীবিলাস-বাবু। চাকরকে ডাকলেন।

বললেন—সিঁড়ির আলোটা বাড়িয়ে দে তো, আমি কাছারি ঘরে যাবো—

বাড়ির ঝি আগেই উঠেছিল। ছোটবউ-এর ঝি রান্না-বাড়িতে জল গরম করছে। মারও বিশ্রাম নেই। মাঝরাত থেকে ব্যথা উঠেছে। সেই থেকেই বাড়িতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বড় ছেলেকে ডাকতেন না মা। দাই এসে রয়েছে সন্ধ্যে থেকে। শুধু

একটা দাই-ই নয়। এ-বাড়ির পুরনো দাই আছে, সঙ্গে আছে তার মেয়ে, নাতনি। সমাদ্দার-বাড়ির প্রথম নাতি হবে, সুতরাং পাওনা-গণ্ডার অনেক আশ্বাস আছে। সমাদ্দার-বাড়িতে নাড়ি কাটতে পারলে কাপড়, চাদর, ঘড়া, কলসী, তেল সিঁদে ছাড়াও পার্বণীর লোভও আছে। রাত তখন গভীর। শ্রীদাম নিজের ঘরের বিছানার এ-পাশ ও-পাশ করছিল। বাইরে একটু শব্দ হয়, কি একটা পেঁচা ডেকে ওঠে, কেমন যেন চমকে উঠে শ্রীদাম। জানালা দিয়ে মছলন্দপুরের বাইরের আকাশটা দেখে আর কেমন ভয় ভয় করে। বিলের ওপারে আকাশটা যেন একটু ফিকে হয়ে আসছে। আঁতুড় ঘরে বাড়ির ছোটবউ কাতরানির শব্দ করে। দাই আঁতুড়ঘরে ঢুকেছে, তার মেয়ে নাতনিও ঢুকেছে। বাইরে শাশুড়ীও উদগ্রীব হয়ে প্রহর গোণে।

—নন্দর মা ?

নন্দর মা ভেতর থেকেই বলে—কোনও ভয় নেই মা আপনার বউমা ভালো আছে—

কাছারি ঘরে গিয়ে পুরুত মশাইকে ডাকতে পাঠিয়ে শ্রীবিলাস মহাভারতখানা টেনে নেয়।

পড়িয়াছে সত্যভামা ভূমির উপর
মুক্তকেশী গড়াগড়ি ধূলায় ধূসর ॥
বসন ভূষণ ভিজে নয়নের জলে।
শশিকলা যেমন পড়িলা ভূমিতলে ॥
অচেতন ছিল সখী পাইল চেতন।
সৌরভে জানিল গৃহে কৃষ্ণ আগমন ॥

ভেতর থেকে যেন একটা আওয়াজ আসছে না ? পড়তে পড়তে যেন বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে হয়। ভুবন হাজরা মশাই বলেছেন—লেখাপড়া করে কী লাভ তরুবালার ! তরুবালা নামটা যেন কেমন ! তরুবালা নামে কেন ডাকে সবাই ?

শ্রীবিলাস বলেছিল—তোমার মেয়ের নাম বদলে দিলাম মুহুরি মশাই—

ভুবন হাজরা বলেছিল—হুজুর, ওটা ওর গর্ভধারিণীর দেওয়া নাম,—

—হোক গর্ভধারিণীর দেওয়া, মেয়ের তোমার ও-নাম পছন্দ হয় হোক, আমার পছন্দ নয়—

ভুবন হাজরা বলেছিল—হুজুর, মেয়ে আমার ঐ একটা, আপনার যদি পছন্দ হয় তো বদলে দি—

শ্রীবিলাস বলেছিল—হ্যাঁ, আমি আপনার মেয়ের নাম বদলে দিয়েছি, ইস্কুলের খাতায় নাম বদলে বনলতা রেখেছি—

ভুবন হাজরা বলেছিল—তা হুজুরের যা খুশী নাম রাখবেন, মেয়েকে আমি আপনার হাতেই ছেড়ে দিলাম হুজুর, আপনি যেমন খুশী ওকে মানুষ করবেন—ওর গর্ভধারিণীর তো কোনও জ্ঞান-বিচার নেই আজ্ঞে—

শ্রীবিলাস বলেছিল—আমি তোমার মেয়ের সব ভালো মন্দের ভার নেব যখন বলেছি, তখন আর তুমিই বা কেন ভাবো—

ভুবন হাজরা বলেছিল—না হুজুর, আমি আর ভাববো না—

ভুবন হাজরা ভাবেওনা সত্যি। চুয়াল্লিশ বছর সমাদ্দার-বাড়িতে মুহুরিগিরি করে করে এখন আর ভাববার ক্ষমতাও নেই তার। তরুবালার গর্ভধারিণী বহু আগেই পাগল হয়ে গেছে। রাঁধে, বাড়ে, ভাত খেতে দেয়, সবই করে সংসারের, কিন্তু কিছু একটা কথা জিজ্ঞেস করো—এলোমেলো উত্তর দেবে।

এক এক সময়ে সামনে নিজের মেয়েকে দেখেই চিনতে পারে না। বলে—কে তুমি? কে?

—আমি মা, আমি—তরুবালা!

—তরুবালা!

বলে কী যেন ভাবে খানিকক্ষণ, তারপরে বলে—তরুবালা, তা

আমাদের বাড়ি কেন বাছা ? আমাদের বাড়িতে কিচ্ছু হবে না—অন্য বাড়ি যাও—

ভুবন হাজরা হয়ত একদিন ডাকলে—ওগো শুনছো—

রান্না ঘরে কাজ করছে। কোনও সাড়া শব্দ নেই সেখান থেকে। ভুবন হাজরা কাছে গিয়ে জোরে ডাকল—ওগো, শুনতে পাচ্ছো না ?

গিন্নী হঠাৎ মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে বলে—এত রাত্তিরে কী চাও তুমি ?

—রাত্তির কোথায় গো ? কী বলছো তুমি ? রোদ খট্‌ খট্‌ করছে, দেখ দিকিনি কাণ্ড, মাথা-খারাপ নিয়ে হয়েছে আমার সংসার !—বলি ভাত দেবে না ?

—এই তো ভাত দিলাম, আবার ক্ষিদে পেল ?

কখন যে ভুবন হাজরা খেলে, আর কখন রাত্তির হলো তা তরু-বালার গর্ভধারিণীই জানে, কিন্তু সে-কথা বোঝায় কার সাধ্য আছে ! আবার বেশি কথা বললে কান্নাও আছে। কেঁদে-ভাসিয়ে দেয় মানুষটা। একেবারে হাউহাউ করে কাঁদে। বলে—কী কপাল করেছিলাম মা, আমার একটি মেয়ে, সেই মেয়েই বিধবা হলো মা—

পাড়ার লোকজন যারা কান্না শুনে ছুটে আসতো তারা হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারতো না। মেয়ে তো ইস্কুলে গেছে, জমিদার-বাবুর ইস্কুলে বই শেলেট নিয়ে লেখাপড়া করছে। ভালো ঘরে ভালো বরে তার বিয়ে হবে। তাকে দেখতে শুনতে ভালো, তার গড়ন-পেটন ভালো, লেখাপড়ায় বুদ্ধি আছে বেশ, সে কেন বিধবা হতে যাবে ! শোন মায়ের কথার ছিরি।

হঠাৎ ভেতর বাড়িতে শাখ বেজে উঠলো। শ্রীবিলাস একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

রাত তখন শেষ হয়ে আসছে। পুরুতমশাই ওই শব্দটির জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। পাঁজিপুথি খুলে রেখেছিলেন সামনে।

বললেন—দশমপতি কেন্দ্রে পড়েছে, আর রবি চন্দ্র মঙ্গল বুধের পূর্ণদৃষ্টি আছে বৃহস্পতির ওপর, এতে রাজযোগ হয়েছে বাবাজী—জাতক কীর্তিমান, ধনবান, দীর্ঘায়ু হবে—

এ-শুধু একবার নয়। প্রতিবার, প্রত্যেকবারই ভেতরে শাঁখ বেজে উঠেছে, আর উত্তেজনায় শ্রীবিলাসের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ভৈরবপুরের বড়তরফের মেয়ে এ-বাড়িতে এসে কীর্তিমান, ধনমান আর দীর্ঘায়ু সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। আর প্রত্যেকবার উত্তেজনায় আনন্দে যত অধীর হয়ে উঠেছেন শ্রীবিলাস, আর তত তাঁর কৃচ্ছ্রসাধন দিনদিন বেড়ে গিয়েছে। আগে ভোরবেলা ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে প্রাণায়াম করতেন, শীর্ষাসন করতেন, উৎকটাসন করতেন। ক্রমে বেড়ে গেছে তাঁর আসনের সংখ্যা। এখন বিকেলেও হয় আসন, রাত্রের গভীরেও হয় আসন। ছেলে যখন খেতে বসে, মা পাশে এসে বসেন। রান্না-বাড়ি থেকে ভাত ডাল তরকারি ধরে ধরে এনে সাজিয়ে দেয় সামনে। শ্রীবিলাস আচমন করে দু'টি ভাত উৎসর্গ করে ইষ্টদেবতাকে। তারপর প্রসাদ গ্রহণ করে।

মা বলেন—রান্না কেমন হয়েছে বাবা?

—ভালোই তো হয়েছে।

—তবে লাউঘণ্টটা খেলিনে যে?

তারপর অন্যান্য অনেক প্রসঙ্গ ওঠে। খেতে খেতে বৈষয়িক কাজকর্মের কথাও ওঠে। ভঞ্জরা কয়েক সনের খাজনা বাকি রেখেছে, সিংহীরা এবার জলকর দেয়নি, এমনি সব প্রসঙ্গ।

—আরো একশো টাকা এবার ইস্কুলের জন্যে তবিল থেকে নেবো মা।

—তা, নে না। তুই নিবি তা আমাকে আবার জিজ্ঞেস করছিস কেন?

তবু শ্রীবিলাস যখন যা নেয় সব মাকে জিজ্ঞেস করে। টাকা তো তার একলার নয়, শ্রীদামেরও অংশ আছে। সব সম্পত্তির সব

জমিদারির ওপর দু'ভাইএর সমান অধিকার। ইস্কুল তার শখের। সব টাকাটাই নষ্ট বলতে গেলে। একটা চালাঘর প্রথমে ছিল। সেই চালাঘর দালান কোঠা হয়েছে। আগে ছেলেমেয়েরা মাটিতে পাটি পেতে বসতো। তারপর কাঠের বেঞ্চি হলো। ইস্কুলের ভূগোলের ম্যাপ কেনা হলো। বই যারা কিনতে পারবে না তাদের বই কিনে দেওয়া হলো। দরকার হলে জামা, প্যান্ট, শাড়িও কিনে দেওয়া হলো। টাকা কি কম লাগে ওই একফোঁটা ইস্কুলের পেছনে।

সেই কবেকার দেখা ইস্কুল, আবার দেখতে পাবো; এর জন্যে একটু কৌতূহলও ছিল বৈ কি! কয়েকজন গণ্যমান্য লোক এসেছিলেন। বললেন—আমরাই আসবো, এসে আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো, আপনার কিছু ভাবনা নেই।

একজন জিজ্ঞেস করলেন—মছলন্দপুরে আগে বোধ হয় কখনও যাননি, সাহেবগঞ্জে গিয়েছেন তো?

বললাম—হ্যাঁ—

—ওই সাহেবগঞ্জে নেমেই বাবো মাইল ভেতরে।

কেন জানি না মুখ ফুটে বলতে তাঁদের কাছে পারলাম না যে মছলন্দপুরে আমি পনরো বছর আগে একবার গিয়েছিলাম, আর শুধু গিয়েছিলামই নয়, আমার জীবনের একটা স্মরণীয় ঘটনাও ঘটে গেছে ওই মছলন্দপুরের দু'একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করেই।

শুধু জিজ্ঞেস করলাম—ওখানকার জমিদার কে?

একজন বললেন—আগে যিনি ছিলেন, তিনি তো আর নেই, তিনিই তো স্কুলটার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তাঁর ছোটভাই শ্রীদামবাবু এখন আছেন—

তা শ্রীদামবাবুর বয়েস হবে এখন অনেক। তখনই বয়েস হয়েছিল। দু'তিনটে ছেলেমেয়েও হয়ে গিয়েছিল। আমি যেদিন

প্রথম অন্দর মহলে গিয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম শ্রীদামবাবুর বউকে। বড় ছেলেমানুষ মনে হয়েছিল দেখে। দেখে কে বলবে ওরই তুটো তিনটে ছেলেমেয়ে। মুখের চোখের দেহের সর্বাঙ্গে তখনও বয়েসের কোনও ছাপ পড়েনি!

আমি ঠিক এমনি সময়ে মছলন্দপুরে গিয়ে হাজির।

তখন মছলন্দপুরের ইস্কুল বেশ জমে উঠেছে। শ্রীবিলাসবাবুর নাম-ধামও প্রচুর। শুধু জমিদারবাবু বলেই নয়। লোকে বলতো—শ্রীবিলাসবাবু মানুষ নয়, দেবতা—

দেবতাই বটে। গাঁয়ের প্রজারা যখন শ্রীবিলাসবাবুর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতো, সে-প্রণাম যেন তারা তাদের ইষ্ট-দেবতাকেই করতো। গ্রামের মধ্যে টিউবওয়েল হবে, প্রথম জল উঠলে শ্রীবিলাসবাবুই সে-জল পরীক্ষা করে সাধারণের কল্যাণে উৎসর্গ করবেন। কারো বাগানে একটা কিছু ফল ফললে, নিবেদন করে দিয়ে যাবে শ্রীবিলাসবাবুর পায়ে।

বলবে—আশীর্বাদ করবেন হুজুর, যেন ফসল ভালো হয় এবার—

কিংবা পুজোর দিন বড়বাবু না খেলে কেউ প্রসাদ স্পর্শ করবে না।

আমাকে বলেছিলেন—আমার বড় লজ্জা করে—

বললাম—কেন?

—দেখেন না, সবাই দেবতার মতন ভক্তি করে আমাকে! আমি কে? নেহাত বড়লোকের ঘরে জন্মেছিলাম বলেই তো আমার এত টাকা—নইলে নিজের রোজগার করতে হলেই তো গেছলাম—

'বললাম—তা হোক, টাকা তো অনেকেরই আছে, ক'জন আপনার মত প্রজাদের সুখ-দুঃখ দেখে!

—সুখ দুঃখ কি আমিই দেখতে পারি তেমন করে! গরীব প্রজারা গরু বেচে খাজনা দিতে আসে যখন, তখন চোখের জল রাখতে পারি না।

বলতে বলতে বুঝতে পারি শ্রীবিলাসবাবুরও চোখ দু'টো বুঝি সজল হয়ে আসে।

বলেন—শহুরে মানুষ আপনারা, পরের দুঃখ এমন করে প্রকট নয় সেখানে—কিন্তু এরা নিজেদের দুঃখ ঢাকতে জানে না, ভেতরের কথা চাপতে জানে না, দুঃখ হলে বলে ফেলে সোজাসুজি—

বললাম—আপনি অনেক দেখেছেন, অনেক জেনেছেন, আমি আর কতটুকু জানি মানুষের, আমি তো সবে ম্যাট্রিক দিয়েছি, আমার আর বয়েসই বা কতো, আমাকে আপনি শিখিয়ে দিন—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—আমিই বা কতটুকু জানি। ওই জানতেই তো সংসার ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু থাকতে পারলাম কৈ! আমার গুরুদেব আদেশ দিলেন সংসার-আশ্রমে ফিরে যেতে—তাই ফিরে এলুম। তবে মহাভারতটা পড়বেন, সকল জ্ঞানের খনি হচ্ছে মহাভারত। মানুষের চরিত্র গড়তে ওর মত আর দুটি গ্রন্থ নেই পৃথিবীতে।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—চরিত্র গড়তে হলে মহাভারত পড়তেই হবে—মূল মহাভারত—তাই যেটুকু সময় পাই ওই মহাভারত পড়েই কাটাই—কিন্তু সময়ই যে পাই না—

বাড়ির ভেতর যখন যান, ছোট ছোট ভাইপোরা কাছে আসে।

মা বলেন—বৌমা, তোমার ছেলে-মেয়েদের একটু শান্ত করাও, বিলাস আসবে এবার।

কিন্তু ছোট ছেলেটা বলে—জ্যাঠামশাই আমাকে সেদিন কোলে নিয়ে চুমু খেয়েছিল—

শ্রীবিলাস যখন আসে বৌমা নিজের ঘরে ছেলেদের বলে—একটু চুপ করো বাবা, জ্যাঠামণি আসছে—

মা বলেন—অনেক তপস্যা করলে তবে অমন ভাশুর পাওয়া যায় বৌমা—

কিন্তু শ্রীবিলাসের কোনও বিরক্তি নেই। হোক না একটু

গোলমাল, কেন তাকে দেখে সবাই ভয় পাবে। কেন সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে তার আসার সঙ্গে সঙ্গে। ভাশুরের খাবার দিয়ে দেওয়ার পর মা সামনে এসে বসেন। বৌমা পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

মা বলেন—বৌমা, বামুনদিকে বলো তো, বিলাসের পাতে আর দুটো লুচি দেবে—

শ্রীবিলাস বলে—না না বৌমাকে অত ছুটোছুটি করতে হবে না, আমি লুচি নেব না আর—

সেই শ্রীবিলাসবাবুই আমাকে বললেন—চলুন আপনাকে আমার ইস্কুলটা দেখিয়ে নিয়ে আসি—

বললাম—আমি কতটুকুই বা জানি, আমি গিয়ে কি করবো বলুন—

—তা হোক, আপনারা শহরের ছেলে, আপনি গেলে ওরা উৎসাহ পাবে—

মনে আছে ইস্কুলটা দেখে সেদিন খুব ভালো লেগেছিল আমার।

সমস্ত ইস্কুলটার একমাত্র মাস্টার শ্রীবিলাসবাবু, শ্রীবিলাসবাবুই সকলকে পড়ান। ছাত্র-ছাত্রীরা সারা ক্লাশে তাঁর দিকে মুখ করে বসে থাকে।

শ্রীবিলাসবাবু বলেছিলেন—আপনি প্রশ্ন করুন কিছু—দেখুন না, কী-রকম লেখাপড়া হচ্ছে এদের—

দেখলাম ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে সব। ভারি ভক্তি করে শ্রীবিলাসবাবুকে। আমি যেতেই সবাই দাঁড়িয়ে উঠে কী যেন একটা গান করতে লাগলো। আগে থেকে বোধ হয় বলে রেখেছিলেন শ্রীবিলাসবাবু।

ছেলে-মেয়েরা সুর করে গাইছিল—

হে মহামানব, হে ভবার্ণব, অতিথি মোদের ঘরে
মোরা অতি দীন
সঙ্গতিহীন—
জানি না বরণ করিব কেমন করে।

শ্রীবিলাসবাবু সুরের সঙ্গে তাল রেখে হাতে তাল দিচ্ছিলেন। বরণ করার পদ্ধতি জানা নেই, সঙ্গতি নেই ছাত্রদের, তবু আমার মত একজন অতিথিকে তারা ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে অভ্যর্থনা করলে।

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—সেবার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছিলেন, সেবার গানটা আমিই লিখেছিলুম—সেই গানটাই গাইছে ওরা,—

গানের শেষে ছেলে-মেয়েরা বসে পড়লো। শ্রীবিলাসবাবু বললেন—ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন, তোমরা কেমন পড়াশুনো করছো তাই দেখতে, ইনি যা জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা উত্তর দিতে চেষ্টা কোর—

আমাকে বললেন—আপনি কিছু প্রশ্ন করুন—

বললাম—কী প্রশ্ন করবো?

—যা আপনার খুশী। মাইনর ইস্কুল, গ্রামের ছেলেদেব স্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী সবই ওরা উত্তর দিতে পারবে—

বললাম—অঙ্ক না ব্যাকরণ, কী জিজ্ঞেস করবো?

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—অঙ্কও জিজ্ঞেস করতে পারেন—

সামনের ছেলে-মেয়েদের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। কা'কে জিজ্ঞেস করবো! সবাই আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। ওদের দেখে বড় মায়া হতে লাগলো। যদি বলতে না পারে তো আমিই যেন লজ্জায় পড়বো। পরীক্ষা করবো কাকে? ছেলে-মেয়েদের না শ্রীবিলাসবাবুকে! শ্রীবিলাসবাবুই যেন আমার পরীক্ষার পাত্র হয়ে দাঁড়ালেন। লজ্জায় পড়লাম আমি।

শ্রীবিলাসবাবুকে বললাম—বুদ্ধির গুণ পারবে ওরা?

—করিয়েছি তো, পারবে নিশ্চয়ই।

সামনে যে ছেলেটি বসে ছিল, তাকেই জিজ্ঞেস করলাম—কী নাম তোমার খোকা?

ছেলেটি বললে—আমার নাম শ্রীকালিদাস পাল—

বললাম—বলো তো একটি লোক যদি সাইকেলে চড়ে প্রতি ঘণ্টায় ১০ মাইল যায়, আর যদি সে প্রতি ১০ মাইল পর পর ৫ মিনিট বিশ্রাম করে, তবে ৪০ মাইল যেতে তার কত সময় লাগবে ?

কালিদাস প্রশ্নটা শুনে ভাবতে লাগলো।

পাশের একটি ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—আমি বলবো ?

শ্রীবিলাসবাবু বললে—না, তুমি না, যাকে জিজ্ঞেস করেছেন, সে বলবে—

কালিদাস পাল সে-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। পাশের ছেলেটিও পারেনি। শ্রীবিলাসবাবু সেদিন যেন লজ্জায় আধমরা হয়ে গিয়েছিলেন। অঙ্কটা সহজ।

বললেন—ছেলে-মেয়েদের অর্ধেক পেট পুরে খেতেই পায় না, ওরা যে ইস্কুলে আসে এই যথেষ্ট !

যেন কৈফিয়তের সুরেই বলতে লাগলেন—আপনি যে-ক'দিন আছেন একটু আসুন না, ছেলে-মেয়েরা আপনার কাছে কিছু শিখতে পারবে, আমি একলা সকলকে দেখে উঠতে পারি না—

তারপর ডাকলেন—বনলতা !—

প্রথম বেঞ্চির শেষ সারিতে একটি মেয়ে এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। শ্রীবিলাসবাবুর ডাক শুনেই দাঁড়িয়ে উঠলো। নধর চেহারা, একটি প্রীতিমতী মুখ—আর ভীরু একজোড়া চাউনি। সারা শরীরে ডুরে শাড়িটা ভালো করে জড়ানো ছিল। মাথার পেছনে আঁট করে ছোট একটুখানি খোঁপা।

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—আমার ইস্কুলের এই-ই সবচেয়ে মেধাবী মেয়ে, একে আপনি যা ইচ্ছে কিছু প্রশ্ন করুন—

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে মেয়েটি আমার দিকে একবার আয়ত চোখ দুটি তুলেই আবার নিচু করলো।

বললাম—কী নাম তোমার ?

মেয়েটি চুপ করে রইল খানিকক্ষণ।

শ্রীবিলাসবাবু অভয় দিলেন। বললেন—বলো, নাম বলো তোমার ?

মেয়েটি মুখ নিচু করে বললে—আমার নাম কুমারী বনলতা দাসী।

বললাম—বা , বেশ নাম তো,—পাড়াগাঁয়ে বেশ নাম রেখেছে তো ওর বাপ মা !

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—ও নাম তো আমার দেওয়া, ওর বাপ-মা কী নাম রেখেছিল জানেন ? তরুবালা। তরুবালা নাম কি ওকে মানায়, বলুন !

তরুবালা নামটা সত্যিই মানায় কি না তাই দেখবার জন্যে আর একবার ভালো করে চেয়ে দেখলাম। বনলতা বুঝি এতক্ষণ আমার দিকেই চেয়ে ছিল। আমি চাইতেই মুখ নিচু করলে। শ্রীবিলাসবাবুর সত্যিই চোখ আছে।

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—চেহারা তো দেখছেন, আর ওর মেধা যদি দেখেন তো আরো অবাক হয়ে যাবেন।

বলে জিজ্ঞেস করলেন—বলো তো, একটি লোক যদি সাইকেলে প্রতি ঘণ্টায় ১০ মাইল যায়, আর যদি সে প্রতি ১০ মাইল পর পর ৫ মিনিট বিশ্রাম করে. তবে ৪০ মাইল যেতে তার কত সময় লাগবে ?

বনলতা একটুখানি শুধু ভাবলে। তারপর মুখ নিচু করে বললে—৪ ঘণ্টা ১৫ মিনিট—

বললাম—বাঃ—

শ্রীবিলাসবাবুর যেন গর্বে বুকখানা দশহাত হয়ে এল।

বললেন—এবার আপনি ওকে আর একটা প্রশ্ন করুন !

বললাম—আর প্রশ্ন করে কী হবে, খুবই মেধাবী আপনার এই ছাত্রীটি।

—না না, আপনি আর একটা প্রশ্ন করুন। দেখবেন সব জবাব দেবে, ওর মেধা দেখে আমিই অবাক হয়ে গেছি—

কী প্রশ্ন করবো ভাবছিলাম। কিংবা হয়ত মেয়েটিকেই দেখছিলাম। এক-একটা মুখ থাকে মানুষের, যার দিকে চাইলেই মনে হয় যেন সে মুখ হাসছে। অথচ গম্ভীর হয়েই হয়ত আছে! মুখের গড়নের মধ্যে কোথায় যেন কী একটা থাকে তাদের, যা বিচার-বিবেচনা কিংবা অঙ্কের যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় না। এমন একটা স্নিগ্ধ হাসি, যা ঠিক হাসিও নয় আবার হাসিও বটে। নাক, মুখ, চোখ, ভ্রূ, কপাল সব জিনিসগুলো আইনমত হয়ত ঠিক নয়, কিন্তু কোথাও কোনও খুঁত ধরার উপায় নেই। মনে হবে বুঝি দু'দণ্ড তাকিয়ে থাকি মুখখানার দিকে। দু'টো কথা বলি পাশে বসে।

—করুন, প্রশ্ন করুন। যে-কোন প্রশ্ন, যা আপনার খুশী।

বললাম—ব্যাকরণ থেকে প্রশ্ন করবো?

—করুন না।

দেখলাম বনলতার সামনে হাই-বেঞ্চের ওপর বাঙলা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ রয়েছে।

বললাম—দেখি তোমার ব্যাকরণটা?

বইটার মলাট খুলতেই দেখলাম গোটা-গোটা অক্ষরে বই-এর প্রথম পাতায় লেখা রয়েছে নিজের নাম—বনলতা দাসী।

বললাম—বাঃ, আপনার ছাত্রীর হাতের লেখাটাও চমৎকার।

শ্রীবিলাসবাবু হাসলেন। বললেন—ওটা অবশ্য আমার হাতের লেখা, আমিই লিখে দিয়েছি ও-নামটা, তবে ওর হাতের লেখাও ভালো—দেখাও তো বনলতা, তোমার হাতের লেখার খাতাটা দেখাও তো ওঁকে—

মেয়েটি যেন একটু সংকুচিত হলো। লজ্জায় মুখ নিচু করলে। তারপর একটা খাতা নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—আমার হাতের লেখা তত ভালো নয়—

শ্রীবিলাসবাবু খাতাটার দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

বললেন—না না, দেখুন, হাতের লেখা ভালো নয়? আপনি কী বলেন?

বললাম—খুব চমৎকার হাতের লেখা, কে বললে খারাপ?

—তোমার ইংরিজী খাতাটা দেখাও তো বনলতা, দেখবেন ইংরিজী হাতের লেখাও ভালো ওর—

বনলতা বললে—এ তো সবই মাস্টার মশাইএর দেখিয়ে দেওয়া—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—দেখিয়ে তো সকলকেই দিই, তোমাকে যেমন দেখিয়ে দিই, তেমনি সকলকেই দেখাই—কিন্তু সবাই কি তোমার মতন পারে!

অনেকক্ষণ এমনি করেই কেটেছিল। বাঙলা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ থেকে একটা প্রশ্ন করতেও হয়েছিল। কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতেই বনলতার আটকায়নি সেদিন।

শ্রীবিলাসবাবু বলেছিলেন—অথচ সকলকেই তো আমি পড়াই, কিন্তু সকলকে পড়িয়ে কি সমান আনন্দ পাওয়া যায় বলুন?

জিজ্ঞেস করলাম—সেলাই টেলাই শেখানো হয় না মেয়েদের?

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—ওইটি তো আমার দ্বারা হয় না—ওটা যে-যার বাড়িতে শিখে নেয়—মা-মাসির কাছ থেকে।

জিজ্ঞেস করলাম—তুমি সেলাই শিখেছ?

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—সেলাই-এর দিকে তেমন কিছু শেখেনি ও—

—মা'র কাছে কিছু শেখেনি?

—ওর মা থেকেও নেই যে!

—কেন?

—ওর মা'র মাথাটা খারাপ। এই যে লেখাপড়া যা কিছু শিখেছে সব আমার গরজে! ওর বাপ ভুবন হাজরা আমাদের

বহুদিনের পুরনো মুহুরী, আমি না থাকলে কবে ওই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিত, আমিই জোর জবরদস্তি করে আটকে রেখে দিয়েছি তবু—

আমি চুপ করে ছিলাম। বললাম—কিন্তু বিয়ে তো একদিন দিতে হবেই—

—তা তো দিতেই হবে, কিন্তু লেখাপড়া শিখে তখন বিয়েটা হওয়াই তো ভালো! নইলে ছেলে-মেয়ে হলে সেই তো সব গো-মুখ্যু হয়ে থাকবে। আমাদের পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার তো আপনি জানেন না—মেয়েদের অবস্থা দেখলে দুঃখু হয়—

সেদিন ইস্কুল দেখে যথারীতি আমি চলেই এসেছিলাম। আমার সম্মানের জন্যেই সেদিন শ্রীবিলাসবাবু সকাল-সকাল ইস্কুলের ছুটি দিয়ে দিলেন। দেখলাম ছেলে-মেয়েরা শ্রীবিলাসবাবুকে সম্মানও করে, শ্রদ্ধাও করে।

বললেন—এই আমার একমাত্র শখ, জীবনে তো নিজের কিছুই হলো না, অনেক অনেক আশা ছিল কল্পনা ছিল—ভালো গুরুও পেয়েছিলাম, যা অনেকে পায় না। আজ আমাকে এই জমিদারি চালাতে দেখছেন বটে কিন্তু এখন আমার গোমুখীতে গুহার মধ্যে সাধন-ভজন-তপস্যা করার কথা, মানুষ ভাবে এক, হয় আর—

বললাম—এ-ও তো এক রকমের সাধনা, এই সেবার সাধনা।

—সেবা আর করতে পারছি কই মন দিয়ে, বলুন, শুধু তো টাকা-আনা-পাই-কড়া-ক্রান্তি নিয়েই দিন কাটছে। তবু শুধু ওই মায়ের কথা ভেবেই সংসারে পড়ে আছি, মা'র অবর্তমানে আমি আবার বেরিয়ে পড়বো—এমন কপাল, একমনে মহাভারত পড়বো তারও সময় পাই না—

—কিন্তু আপনি না থাকলে, আপনার ইস্কুল কে দেখবে?

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—আমি না থাকলেই যদি ইস্কুল অচল হয়ে যায় তো যাক্, তাহলে আমি থাকলেও অচল হয়ে যাবে—

তারপর বললেন—লেখাপড়া সকলের অবশ্য হয় না, কিন্তু দু'একটা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর জন্যেই যা একটু ভাবনা হয়—। বাপ মায়েরা তো কেউ পড়াতে চায় না, শুধু আমার চাপেই যা একটু পড়াচ্ছে, নইলে ওই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দিয়ে এই বয়েসেই কাজ করায়, জানেন? পুকুর থেকে জল আনায়, মাঠে গরু চরাতে পাঠায়—

রাস্তা দিয়ে দু'জনে বাড়ির দিকে আসছিলাম।

শ্রীবিলাসবাবু হঠাৎ বললেন—ওই বনলতা বলে যে-মেয়েটিকে দেখলেন, ওর কতই বা বয়েস, বলুন, ওর বাপ ভুবন হাজরা বলে কিনা ওর বিয়ে দেবে—ছি ছি, আমার তো রাগ হয়ে গিয়েছিল ওর বাপের কথা শুনে, জানেন—

বেশিক্ষণ বাইরে ছিলাম। তাড়াতাড়ি বাড়ি আসতেই কাকীমা বললেন—কোথায় গিয়েছিলিরে? আজও সমাদ্দার-বাড়িতে খেয়ে এলি বুঝি?

কাকা সব শুনে বললেন—তা জমিদারদের কত রকম বদখেয়াল থাকে, শ্রীবিলাসবাবুর তো কিছুই নেই, সাতক্ষীরেতে গিয়ে দেখেছিলাম সেখানে যত সব···

কাকা আর কাকীমা সেটেল্‌মেন্টের কাজে কত দেশ ঘুরেছে, নানারকম চরিত্র দেখেছে। কাকীমা বললে—সমাদ্দারগিন্নী তো তাই বলছিল, কেবল জপতপ প্রাণায়াম আর ওই ইস্কুল নিয়েই থাকে তো বড়ছেলে, দুঃখ করছিল যে বড় ছেলে সংসারী হলো না, বিয়ে থাও করলো না—

কাকা বললেন—প্রজারা তো বড়বাবু বলতে অজ্ঞান, বড়বাবু নাকি কোনও অন্যায় করতে পারে না, তা এই করে করে জমিদারি কি থাকবে,—তা বড়ছেলে না-হয় সন্নিসী হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, তার সংসারে মন থাকবার কথা নয়, ছোট ছেলেটা তো দেখতে পারে!

শ্রীদামের কাছে কেউ এলে বলে—আমি তো জানি না ওসব, দাদাকে বোল—

সব কাজেই দাদা। দাদাই সব দেখবে। দাদা ছাড়া যেন কোনও কাজ হবার নয়।

প্রথম একদিন ইস্কুল দেখবার পর আর বাইরে যাইনি। কাকা বললেন—কিছু করবার না থাকে, আমার সঙ্গে চলো না—একটু ঘুরে আসবে, নানা-রকম লোক দেখবে—

কাকীমা বললেন—তোমার সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরে কী হবে, বরং বসে বসে বই পড়লেই তো হয়, সমাদ্দার-বাড়িতে অনেক বই আছে, আনিয়ে নিলেই হবে—

পরদিন তাই-ই করলাম। কাকার কাছে খবরের কাগজ আসতো তাই পড়লাম সারা দিন। টাইম-টেবলটা উল্টোলাম, তবু সময় আর কাটতে চায় না। কাকীমা চাকর পাঠিয়ে কিছু বই আনিয়ে দিলেন। একটা বইএর নাম 'কৃতান্তের বৃথা ভ্রমণ' আর একটা বই 'দেবগণের মর্ত্তে আগমন'। বইগুলো পড়ছি। পড়তে পড়তে বিকেল হয়ে গেছে। কাকা মাঠ থেকে এসে খেয়ে নিয়ে আবার গেছেন কাজে। হঠাৎ চাকর এসে বললে—বড়বাবু একবার ডাকছেন আপনাকে—

কাকীমা বললেন—এখন আবার কোথায় যাবি ?

বললাম—যাই কাকীমা,—লোকটি খুব ভালো—

মনে আছে শ্রীবিলাসবাবুর সেদিনের ব্যবহার আমাকে বড় মুগ্ধ করেছিল। বলেছিলেন—আমাদের ভুবন মুহুরি একবার তার বাড়িতে যেতে বলেছে, আপনাকে নিয়ে।

আমি যেন অবাক হয়ে গেলাম ! ভুবন হাজরা আমাকে ডাকবে কেন ?

—ওই যে, আপনি সেদিন ওঁর মেয়ের খুব প্রশংসা করেছিলেন, বাপ তো, মেয়ের প্রশংসা শুনলে কোন্ বাপের না আনন্দ হয় বলুন ?

বললাম—আমি আর কা-ই বা প্রশংসা করেছি—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—চলুন, বেড়াতে বেড়াতে যাওয়া যাক্—

ছোট একটা মাটির বাড়ি, টিনের চাল। চালের ওপর কুমড়ো ফলেছে কয়েকটা। বেশ দূর থেকে দেখা যায়। মেঠো পথ বেয়ে এঁকে বেঁকে খানিকটা যেতে হয়। সমাদ্দার-বাড়ি থেকে বেশ কিছু দূরই হবে।

বাড়ির সামনে গিয়ে শ্রীবিলাসবাবু ডাকলেন—মুহুরিবাবু, ও মুহুরিবাবু—

ডাক শুনে যে বাইরে বেরিয়ে এল সে মুহুরিবাবু নয়, বনলতা। আমাদের দেখেই, কিংবা হয়ত শ্রীবিলাসবাবুর পাশে আমাকে দেখে হেসে ফেলে।

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—আর হাসতে হবে না, কাকে এনেছি দেখ—

বনলতা বললে—আসুন, বাবা তো বাড়িতে নেই—

ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে শ্রীবিলাসবাবু বললেন—তোমার বাবাকে বলছিলুম, মেয়েটিকে তো একেবারে খনা তৈরি করেছো, যা জিজ্ঞেস করি টপাটপ্ জবাব দিয়ে দেয়—কলকাতা হলে সোনার মেডেল পেতো তোমার মেয়ে—

দাওয়ায় একটা মাদুর পেতে দিলে বনলতা।

মাদুরের বাইরে এককোণে বসে বললে—আপনি আমার যা প্রশংসা করেন, আমার বড় লজ্জা করে—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—তোমার সব বিষয়েই লজ্জা, এত লজ্জা করলে কিছু বলব না, এই দেখ ইনি কলকাতার লোক, ইনি পর্যন্ত আমার কাছে তোমার প্রশংসা করছিলেন—

আমি যে কখন প্রশংসা করছিলাম মনে পড়লো না। জড়সড় হয়ে বসেছিলাম আমি।

বনলতা বললে—আমাদের মাটির বাড়িতে ওঁকে নিয়ে এসে কেন কষ্ট দিলেন—

—সত্যি আপনার কষ্ট হলো নাকি ?

শ্রীবিলাসবাবু আমার দিকে চাইলেন।

বললাম—ছি ছি কষ্ট কেন হবে, আমি তো বেড়াতেই এসেছি—

হেসে উঠলো বনলতা। মুখে আঁচল দিয়ে সে এক অদ্ভুত চাপা হাসি। বললে—কষ্ট হলে কেউ বলে নাকি মুখ ফুটে !

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—না না কষ্ট হবে কেন ?

বললাম—সত্যিই তো, বেড়াতে কি কারো কষ্ট হয়, তোমার স্মরণশক্তি দেখে সেদিন আমার খুব ভালো লাগলো, আমার বোনকে একটা কথা বললে তার তো মনেই থাকে না—

বনলতা বললে—আপনার বোন কোন্ ক্লাশে পড়ে ?

বললাম—সে এইবার ক্লাশ নাইনে উঠলো, কিন্তু দু'টো সাবজেক্টে ফেল করেছে—

বনলতা বললে—আমিও ফেল করতাম, যা কিছু শিখেছি ওঁরই দয়ায় সব,—উনি না থাকলে আমার লেখাপড়া কিছুই হতো না, আমাদের বই কেনবার পয়সাই নেই অনেকের—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—পয়সা থাকলেই কি সকলের পড়াশুনো হয়, আমার দয়ার কথা বোল না, ঈশ্বর কি সকলকে লেখাপড়ার মেধা দেন,—

বললাম—তুমি বুঝি পড়তে খুব ভালোবাসো ?

বনলতা বললে—ওমা, পড়তে কে না ভালোবাসে—আমায় যত বই দিন না আমি সব পড়ে শেষ করে ফেলবো, শুধু উপন্যাস উনি পড়তে দেন না—বলেন, উপন্যাস পড়লে মেধা নষ্ট হয়ে যায়—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—তোমার বইগুলো দেখাও না এঁকে একবার—

বনলতা বললে—উনিই তো আমায় সব বই কিনে দিয়েছেন,

যা যা পড়তে হবে সব আনিয়ে দেন কলকাতা থেকে—আমি আর কতটুকু জানি, সব উনিই শিখিয়েছেন—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—আমার আর কীসের খরচ বলুন, বাবার কাছ থেকে পাওয়া টাকা শুধু ভোগই করেছি, তবু যদি কিছু জ্ঞান বিতরণ করি তো আমার কীসের লোকসান বলুন ?

বনলতা বললে—আর শুধু কি আমাকে একলা ? ইস্কুলের যত ছাত্র-ছাত্রী দেখলেন, সকলকেই উনি বই কিনে দেন, বাবা তো তাই বলেন···

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—তোমার বাবাকে সেদিন খুব ধম্‌কে দিয়েছি জানো—

বনলতা বললে—আপনি বাবাকে ধম্‌কে দেবেন, আর আমার হবে জ্বালা—

—কেন ?

বনলতা হাসতে লাগলো। বললে—আপনি বাবাকে যত ধম্‌কে দেন, বাবা তত আপনার গুণগান করেন—

—তাতে তোমার জ্বালা হয় কেন ?

বনলতা আমার দিকে মুখ টিপে আরো হাসতে লাগলো। বললে—তা জ্বালা হবে না, শুধু কি বাবা, সবাই-ই তো আপনার গুণগান করে।

—আমার গুণগান শুনতে তোমার ভালো লাগে না বুঝি ?

বনলতা বললে—তা ভালো লাগবে না কেন ? কিন্তু সবাই আমার কানের কাছে এসেই-বা গুন গুন করে কেন ? আরো তো অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে তাদের কাছে করলেই হয়—

আমিও হেসে ফেললাম, বললাম—কেন আমার কাছেও তো সবাই আপনার গুণগান করে—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—আপনার কাছেও করে নাকি ?

বললাম—আপনাদের দেশে আসবার পর দিন থেকেই করে—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—কেন করে বলুন তো ?

বললাম—আমি নতুন লোক, কী করে বলবো বলুন – বনলতা হয় তো বলতে পারে—

বনলতা—আমি ছোটবেলা থেকে ওর গুণগান শুনে আসছি, ও যখন এই এতটুকু ছিলাম, তখন থেকে—যখন ওঁকে দেখিনি তখন থেকে, তারপর উনি যখন আবার দেশে ফিরে এলেন, তখন আরো বাড়লো—

বললাম—আচ্ছা আপনি সাধু হয়ে গিয়েছিলেন কেন ?

বনলতা বললে—উনি তো এখনও সাধু, শুধু সংসারে আছেন এই যা—নিরিমিষ খান, পুজো করেন, জপতপ করেন, প্রাণায়াম করেন—আচ্ছা আপনি এত জপ তপ করেন কেন বলুন তো! কিসের জন্য ?

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—ও তুমি বুঝবে না—

বনলতা হঠাৎ শ্রীবিলাসবাবুর কাছে সরে গিয়ে বললে—এই দেখুন, জপতপ করে প্রাণায়াম করে করে কি হয়েছে দেখুন—

বলেই টপ্ করে মাথার একটা পাকা চুল তুলে নিয়ে বললে—এই দেখুন, এবার আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন—

শ্রীবিলাসবাবু চুলটা দেখে হাসতে হাসতে বললেন—আমি তো বুড়োই, আমি কি বলেছি আমি তোমাদের মত ছেলেমানুষ ?

বনলতা বললে—ওমা, আমি ছেলেমানুষ নাকি ?

বললাম—আমিও ছেলেমানুষ নই, আমি ম্যাট্রিক দিয়েছি—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—আমার কাছে আপনারা দু'জনেই ছেলেমানুষ ছাড়া আর কি ? আপনার সঙ্গে বনলতার তবু মানায়, কিন্তু আমি ? আমাকে বুড়োমানুষ ছাড়া আর কি বলবেন, বলুন ?

বনলতা বললে—শুনলেন তো উনি হলেন বুড়ো আর আমরা হলাম···

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—হ্যাঁ, আমার তুলনায় তোমরা হলে

খোকা খুকীই! আর তুমি তো কীই সত্যি! তোমার এখনও সব দাঁতও ওঠেনি!

—ওমা, ওঠেনি? কী যে বলেন!

—দেখি, মুখের ভেতরটা দেখি, হাঁ কর?

বনলতা লজ্জায় হেসে গড়িয়ে পড়লো।

—হাঁ কর না, দেখি না সব দাঁত উঠেছে কিনা।

বনলতা আঁচল দিয়ে মুখ চাপা দিয়ে বললে—আমি হাঁ করতে পারবো না, আমার লজ্জা করে না বুঝি?

—দেখেছেন, কি রকম লজ্জা মেয়ের!

শ্রীবিলাসবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন—কি লজ্জা দেখেছেন তো, ওই জন্যেই তো আমি নাম রেখেছি বনলতা!

বনলতা বললে—আমি বুঝি বুনো যে বনলতা হতে যাবো, বনে তো যত ঝোপ-জঙ্গল থাকে—

শ্রীবিলাসবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন—দেখলেন তো, বনে নাকি ঝোপ-জঙ্গল থাকে—

বনলতা বললে—তবে সবাই আমার নামের নিন্দে করে কেন?

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—তারা কি সবাই বনলতা দেখেছে?

—হ্যাঁ, পাড়াগাঁয়ের লোক কিনা বনলতা দেখেনি!

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—আচ্ছা এই এঁকেই জিজ্ঞেস করো—বনলতা নামটা ভালো নয়, আপনিই বলুন তো?

বললাম—খুব ভালো নাম, আর চেহারার সঙ্গেও মিল আছে নামের।

—খুব ভালো নাম নয়? চেহারার সঙ্গেও মিল নেই? বলুন তো—

কি যে হলো! আমারও যেন কেমন বনলতাকে ভালো লাগতে লাগলো সেই মুহূর্তে। বনলতার সেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসির ভঙ্গিটা যেন খুব ভালো লাগলো। মনে হলো যেন

আরো অনেকক্ষণ বসে বসে এখানে এমনি করে গল্প করি। যেন এখান থেকে এখনি চলে যেতে না-হয়।

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—আমি তো চেহারার সঙ্গে মিলিয়েই নাম রেখেছি।

বনলতা বললে—আমি কালো বলেই আমার নাম রেখেছেন বনলতা—আমি কিছু বুঝি না বুঝি?

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—ফরসা হলে কি তোমাকে মানাতো, না সবাইকে মানায়!

হঠাৎ বলে ফেললাম—আমার কাছে কিন্তু কালোই ভালো লাগে বেশি—

বনলতা হাসতে হাসতে বললে—বিয়ে করবার সময় দেখবেন ঠিক ফরসা বউ খুঁজবেন, মুখে অমন সবাই বলে!

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—তা তুমি কি কালো?

—ওমা, কালো নই তো কি ফরসা, আপনার মতন?

শ্রীবিলাসবাবুর গায়ের রং সত্যিই ফরসা। দুধে-আলতা। টকটক করছে গাল দুটো। শ্রীবিলাসবাবুর দিকে চাইলে তাঁর ফরসা রং-এর সঙ্গে দুই চোখের দৃষ্টির দিকেই চোখ আটকে যায় প্রথম।

বনলতা বললে—মাস্টার মশাইকে তো আগে দেখেন নি, এমন রং ওঁর! আমার মাঝে মাঝে মনে হয় গায়ে হাত ঘষে দেখি এমনি রং না গায়ে রং মেখেছেন—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—রং টং আমি জীবনে মাখিনি, মশাই। স্নো-ক্রীম-পাউডারও জীবনে ঘষিনি মুখে—

বললাম—আপনার রং সত্যিই খুব ফরসা—

শ্রীবিলাসবাবু হাসতে হাসতে বললেন—তার জন্যে আমার আর কি অপরাধ বলুন, গায়ের রং তো কেউ বদলাতে পারে না, বলতে গেলে আমার নিজের কালো রংই ভালো লাগে।

বনলতা বললে—দেখেছেন, আমার মন রাখা কথা বলছেন উনি? আমি কালো কি না—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—তোমার মন রেখে আমার লাভ কি শুনি?

বনলতা বললে—বেশ, তাহলে ঝগড়া করতে পারবেন আমার সঙ্গে?

শ্রীবিলাসবাবু হাসতে লাগলেন। বললেন—আমি বুঝি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতেই আসি?

বনলতা আমার দিকে চেয়ে বললে—আচ্ছা আপনিই বলুন তো, উনি ঝগড়া করছেন না আমার সঙ্গে?

বললাম—আমি আর কদিন, আমি তো আজ প্রথম দেখছি—

বনলতা বললে—আসুন, আপনাকে একটা কথা বলবো কানে-কানে—

বললাম—কী কথা?

বনলতা বললে—ওঁর সামনে বলবো না—আপনি একটু বাইরে আসুন—বলে আমায় ডেকে নিয়ে গেল ঘরের ভেতরে। শোবার ঘরই বোধহয়। একটা উঁচু তক্তপোশ আছে। তার ওপর পুরু তোশক বালিশ।

—আসুন, আমার আছে আসুন।

বললাম—বলো—

বনলতা বললে—আরো কাছে আসুন, উনি শুনতে পাবেন যে—

কী যে কথা আমার সঙ্গে কে জানে। কিন্তু আমার যেন কেমন লজ্জা করতে লাগলো! এলাম শ্রীবিলাসবাবুর সঙ্গে, তাঁকে বাইরে রেখে কানে কানে কথা হবে, এই-ই বা কী-রকম!

বনলতা আমার কানের কাছে মুখ এনেই বললে—ওর কাছে আপনি আমার খুব নিন্দে করুন—

—নিন্দে?

বনলতা বললে—আস্তে, উনি শুনতে পাবেন, আপনি এখান থেকে বেরিয়ে আমার খুব নিন্দে করবেন ওঁর কাছে, দেখবেন কি বলেন উনি !

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এই কথা বলবার জন্যে এত গোপনতা !

বললাম—তোমার নিন্দে করবো কেন মিছিমিছি ?

—না-হয় নিন্দেই একটু করলেন, দেখুন না উনি কি বলেন ! কালকে এসে আবার আমায় বলবেন, কেমন ?

বড় বিব্রত হলাম। বললাম—না না আমি তোমার নিন্দে করতে পারবো না—

—কেন, বলতে পারেন না, মেয়েটা কালো-কুচ্ছিৎ আকাট মুখ্যু, এই সব বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারেন না, দেখুন না, উনি কি বলেন !

বললাম—উনি বুঝতে পারবেন তুমি আমায় শিখিয়ে দিয়েছ। আর তোমার নিন্দে করবার মতন যে কিছু নেইও।

বনলতা তবু পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। বললেন—না থাক্ তবু আপনি নিন্দেই না-হয় করলেন—

বললাম—চলো, উনি একলা বসে আছেন, কী ভাবছেন !

বনলতা বললে—উনি কিছু ভাববেন না, আর ভাবলেই বা কি !

—বারে, উনি যদি রাগ করেন !

—রাগ করলে আমিও রাগ করতে জানি ! আমাকে আপনি চেনেন না।

বললাম—তুমি থাকো, আমি চলি—

বনলতা বললে—তাহলে ওই কথাই রইল—আপনি নিন্দে করবেন আমার, কেমন ?

আর কোনও কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে আমি বাইরের

বারান্দায় চলে এলাম। শ্রীবিলাসবাবু তখনও বসে আছেন। বনলতাও হাসতে হাসতে আমার পেছন-পেছন এল।

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—কি কথা হলো আপনার সঙ্গে?

বনলতা বললে—খবরদার বলবেন না কিন্তু—কিছুতেই বলবেন না—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—সে কি? আমার বিরুদ্ধে কিছু কথা বুঝি?

বনলতা বললে—বলবেন না উনি, আমি দিব্যি দিয়ে দিয়েছি—কিছুতেই বলবেন না।

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—বারে, উনি তো আমার দলে, বলবেন না কেন?

মনে আছে সেদিন রাস্তায় আসতে আসতে শ্রীবিলাসবাবু বার বার জিজ্ঞেস করলেন—বনলতা কী বললে আপনাকে বলুন তো?

হাসতে হাসতে বললাম—বনলতা আমাকে বলতে বারণ করেছে যে!

শ্রীবিলাসবাবু বলেছিলেন—ও বলুক গে—আপনি বলুন না—

বললাম—ও যদি কিছু মনে করে?

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—ও ওই রকমই, ওকে ত আপনি চেনেন না—বলুন না কী বললে; আমার বিরুদ্ধে কিছু?

বললাম—আপনার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারে? আপনার নিন্দে তো কাউকেই করতে শুনলাম না আজ পর্যন্ত!

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—নিন্দে প্রশংসার কথা জানি না, নিন্দে-প্রশংসার কথা ভাবিও না, পরে নিন্দে করবে এ-ভেবেও কিছু করিনি জীবনে—তবু কোনও অন্যায় করতে গেলেও যেন হাত পায় বন্ধ হয়ে যায়! মনে হয় সমস্ত অন্যায় বোধহয় আমার বিরুদ্ধেই একদিন প্রয়োগ হবে! মানুষের ওপর অন্যায় করবার অধিকারই কি আছে কোনও মানুষের? আমি কে?

কথা শুনতে শুনতে যেন আবার অন্য শ্রীবিলাসবাবুকে দেখতে পেলাম। এ যেন আর এক রূপ তাঁর!

শ্রীবিলাসবাবু বলতে লাগলেন—এই দেখুন না, এই ভুবন মুহুরীর মেয়ে, আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, অত যার মেধা সেই মেয়েকে দিয়ে বাপ, নিজের বাপ কুয়ো থেকে জল তোলাতো, ঘুঁটে দেওয়াতো, গোবর নেপাতো—বাপ হয়ে কেউ এমন করতে পারে, বলুন তো?

বললাম—আপনার চোখে না পড়লে হয়ত সারাজীবন ওই করেই কাটতো!

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—একদিন দেখি কি জানেন, আমি মাঠ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি আল্ থেকে গোবর কুড়োচ্ছে ওই মেয়ে—

বললাম—তুমি কা'র মেয়ে?

আমি জমিদার মানুষ, লোকে একটু খাতিরও করে, একটু ভয়ও করে। আমাকে দেখে ত ভয় পেয়ে গেল, জানেন!

আমি আবার বললাম—তুমি কাদের মেয়ে! তোমার বাপের নাম কী?

মেয়েটা তখনও যেন সাহস করছে না কথা বলতে।

বললাম—গোবর কুড়োচ্ছ কি জন্যে?

মেয়েটি তবু কিছু বললে না।

বললাম—তোমার নাম কী?

মেয়েটি বললে—তরুবালা!

—কোন্ পাড়ায় থাকো?

—দক্ষিণপাড়ায়।

তোমার বাবার নাম?

—শ্রীযুক্ত ভুবন চন্দ্র হাজরা।

—তুমি আমাদের ভুবন মুহুরীর মেয়ে? তা এই বয়সে গোবর কুড়োচ্ছ কেন?

মেয়েটি বললে—বা রে, আমি না কুড়োলে কে কুড়োবে?

—তোমাদের বাড়ীতে আর কেউ নেই তোমাদের?

তারপর শুনলুম ওই গোবর কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে বাড়ির উঠোন দাওয়া সব নিকোতে হবে, নিজেদের গরু নেই কি না। কী জানি মশাই কী হলো দেখুন, আমার যেন মেয়েটির দিকে চেয়েই মনে হলো ও-মেয়ে গোবর নিকোতে আর উঠান ঝাঁট দিতে জন্মায় নি। এমন সুন্দর মেয়ে কি না ওই কাজ করে জীবন নষ্ট করবে! এর বাপ ভুবন মুহুরীকে গিয়ে ধরলাম। বললাম —তোমার মেয়েকে লেখাপড়া শেখাও না কেন?

ভুবন মুহুরী খুব বুড়ো মানুষ। এতদিন বেয়াল্লিশ বছর ধরে আমাদের বাড়ীতেই কাজ করেছে। বললে—ওর গর্ভধারিণীর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে, আমি একা মানুষ, বুড়ো হয়েছি, কত দিক দেখবো—

আমি বললাম—তোমাকে দেখতে হবে না, আমার ইস্কুলে পাঠিয়ে দাও, ওর বই কেনার খরচা-টরচা যা কিছু লাগে, সব আমি দেব।

সেই দিন থেকেই ইস্কুলে আসতে লাগল। কালো হলে কী হবে, শ্রীবিলাসবাবুর যেন মনে হোলো তরুবালা নামটা ঠিক নয় ওর। যা জিজ্ঞেস করেন, তারই টপটপ উত্তর দিয়ে দেয়। একবার পড়ালে আর দু'বার বলে দিতে হয় না। প্রথম প্রথম ইস্কুলে যেতে একটু গাফিলতি করতো।

খবর নিতে গিয়ে ভুবন মুহুরী বললে—ওর গর্ভধারিণী ওকে যেতে দেয়নি আজ—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—এবার থেকে রোজ আমি ওকে ইস্কুলে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো—

তা সে ব্যবস্থাই হোলো। শ্রীবিলাসবাবু ভোর বেলা ইস্কুলে যাবার পথে দক্ষিণপাড়া ঘুরে যান। বাড়ির সামনেই বনলতা বই খাতা শ্লেট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

শ্রীবিলাসবাবু বলেন—আমার একটু দেরি হয়ে গেছে আজ, একটু পা চালিয়ে চল।

বনলতাও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে।

—পড়াটা মুখস্থ করেছ ত আছ?

বনলতা বলে—মুখস্থ হয়নি আজ মাস্টারমশাই, কাল রাত্তিরে যে রাঁধতে হয়েছিল।

—কেন?

—মার যে আবার অসুখটা বেড়েছে খুব।

—তবে তো মহা-মুস্কিল!

পরের দিন শ্রীবিলাসবাবু নিজের বাড়ি থেকেই একজন রাঁধুনি পাঠিয়ে দিলেন। যতদিন না মার অসুখ সারে ততদিন ভুবন মুহুরীর বাড়িতে রেঁধে দিয়ে চলে আসবে। আর শুধু কি রাঁধুনি, আরো অনেক জিনিস দিয়ে সাহায্য করতে হয়েছে।

এক একদিন বনলতা না আসাতে শ্রীবিলাসবাবু বাড়ির ভেতর গিয়ে খোঁজ নিয়েছেন।

—ও ভুবন, বনলতা কী ইস্কুলে যাবে না?

ভুবন মুহুরী সামনে দৌড়ে এসে বলেছে—আজ তো যেতে পারবে না ও—।

—কেন? আজ আবার কী হলো?

ভুবন কিন্তু-কিন্তু করে বলেছে—হুজুর, পরনের কাপড়খানা ওর এখনও শুকোয় নি।

—তা আর কাপড় নেই? কাপড়ের জন্যে ইস্কুলে যাবে না সে কী কথা?

পরের দিনই ভুবন মুহুরী এসে একেবারে দু' জোড়া শাড়ি নিয়ে গেছে মেয়ের জন্যে। শ্রীবিলাসবাবু সকলকে শুনিয়ে বলেছেন—কাপড়ের জন্যে লেখাপড়া করতে পারবে না, এ কেমন কথা, শুনেছেন কখনও কেউ আপনারা, তা আমাকে তো বলতে হয়?

ভুবন মুহুরী ভক্তির আতিশয্যে প্রায় শ্রীবিলাসবাবুর পায়ে হাত দিতে যাবার যোগাড়।

শ্রীবিলাসবাবু দু'পা টেনে নিয়েছেন···করছো কী, করছো কী, ছি—

—আপনি হুজুর আমার মহা-উপকার করলেন, আমি আর কী বলবো, আপনি হুজুর, আমার অন্নদাতা।

শ্রীবিলাসবাবু আরো রেগে যান। বলেন—যাও, যাও এখন, যখন যা দরকার হয় বলবে; মুখ ফুটে বলতেও কি দোষ হয় তোমার?

শেষ পর্যন্ত ভুবন মুহুরীর দরকার থাক আর না থাক, এসে হাজির হয় সব সময়।

শ্রীবিলাসবাবু বলেন—কী, আবার কী চাই?

ভুবন মুহুরী একলা পেলেই কথাগুলো কানে তোলে। বলে—কাল সারারাত ঘুমোতে,পারিনি হুজুর—

—কেন?

ভুবন মুহুরী বলে—সারারাত কেবল একবার এ-ঘর একবার ও-ঘর করেছি, কোনও ঘরেই ঠাঁই হয় না, আমার জন্যে তো নয়, ওর গর্ভধারিণীর জন্যেও বিশেষ ভাবি না, সে তো পাগল-ছাগল মানুষ—কিন্তু যত কষ্ট সব মেয়ের জন্যে, মেয়েটা সারারাত ঘুমোয়নি—

—কেন, ঘুম হলো না কেন তাই বলো না?

—হুজুর, বিষ্টিতে। চাল দিয়ে জল পড়ছে, জলে সব ভিজে একাকার একেবারে।

—কেন, চালে ফুটো আছে বুঝি?

ভুবন মুহুরী বললে—তা আছে নিশ্চয়ই, নইলে জল পড়বে কেন? একেবারে উপর্ঝরণ জল, যার নাম একেবারে কুকুর ভেজা ভিজেছি—

শ্রীবিলাসবাবু বলেন—শুনলে তো হে তোমরা ভুবন মুহুরীর বুদ্ধিটা? চাল যে ফুটো, তা জল পড়বে না? জলের দোষটা কী?

—আজ্ঞে আমার কপালেরই দোষ, আর আমার মেয়েরও কপালদোষে—

—তোমার মেয়ের কপাল দোষ নয়, তোমারই কপাল-দোষে তোমার মেয়ের এই দুর্গতি, চাল যে ফুটো তা আমাকে বলোনি কেন? দেখ দিকিনি কী কাণ্ড, মেয়েটাকে ভেজালে তো? তা, কত টাকা লাগবে?

—তা কী জানি হুজুর।

শেষে শ্রীবিলাসবাবুই আবার লোক পাঠিয়ে ভুবন মুহুরীর চাল সারিয়ে দিয়েছেন

বলেন—মেয়েটার একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে বলেই ওকে একটু লেখাপড়া শেখাচ্ছি, কিন্তু বাপটার দশা কী দেখেছ—। বাপের জন্যে আমার ভারি বয়ে গেছে, মেয়েটার যদি একটা গতি হয়, ভাল ঘরে পড়ে, তাই আমার এত চেষ্টা।

কেউ কেউ বলে—এবার একটা ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে দিন হুজুর।

শ্রীবিলাসবাবু বলেন—দাঁড়াও হে, লেখাপড়া শিখছে, অত ভালো মেধা, অমনি যার তার সঙ্গে বিয়ে দিলেই তো হোল না, দেখতে শুনতে হবে, চারদিক দেখে ভেবে চিন্তে তবে ত বিয়ে দিতে হবে—না-কি—?

পাত্র কি মনের মত পাওয়া যায় সব সময়? শ্রীবিলাসবাবু বললেন—দেখুন, লোকে বলে আমি ওদের জন্যে নাকি কত করছি, ওদের বিপদে আপদে আমি কত দেখি, দেখি কী জন্যে বলুন? ওই মেয়েটার জন্যেই তো! মেয়েটার মধ্যে আমি মেধা দেখছি—ওকে আমি আরো লেখাপড়া শেখাবো, শেষকালে যদি আমার বিদ্যেতে না-কুলোয় তখন মাস্টার রাখবো, প্রফেসার রাখবো, কলকাতায় রেখে পড়াবো; কিন্তু একটা জীবন তো নষ্ট হতে দিতে পারি না সেইজন্যে—মেয়ে তো অনেক দেখেছি, আরো তো ছাত্রী

আছে আমাদের ইস্কুলে, আর কারো অত ক্ষমতা দেখেছেন, আপনি তো নিজেই পরীক্ষা করে দেখলেন সেদিন, বলুন—?

বললাম—আমি আর কতটুকু বুঝি !

—না, তবু আপনারা হলেন কলকাতার ছেলে, আপনারা অনেক বেশি দেখেছেন, অনেক শুনেছেন—আপনাদের পাড়াতেও তো ছেলে-মেয়েরা আছে, তাদের জিজ্ঞেস করুন তো এমন প্রশ্ন, এ-রকম তাড়াতাড়ি জবাব দিতে পারবে ? অন্তত আমি তো দেখিনি—

সেদিন কাকা বললেন—না, শ্রীবিলাসবাবু লোকটি তো খুবই ভালো, আমিও দেখেছি, আর ওঁর প্রজারাও তো সবাই ওর সুনামই করে—

কাকীমা বললেন—আর সে কী ঘর, জানো, ছোটভাইএর ঘর তো দেখলাম ! সে কি সাজানো, রাজসাহীর জমিদার বাড়িতে বিয়ে হয়েছে তো, ঘর একেবারে সাজিয়ে দিয়েছে তারা—খাট আলমারী চেয়ার সোফা সেট, সেলাই-কল—সব, কিছু দিতে আর বাকি রাখেনি—

বললাম—শ্রীবিলাসবাবু কিন্তু খুব সাদাসিধে, মাছ-মাংস খান্ না —কেবল মহাভারত পড়েন, জপতপ আহ্নিক নিয়ে থাকেন, আর আছে ওই ইস্কুল—ইস্কুলের ছেলে-মেয়েদের মাইনে লাগে না, বই কিনতে পয়সা লাগে না, সব দেন উনি—

কিন্তু পরের দিন বিকেলবেলা আমাকে দেখতে পেয়েই ডাকলেন।

বললেন—আসুন না, কেবল বাড়ির ভেতরেই থাকবেন, বিদেশে এসেছেন একটু বেড়ান-টেড়ান চারদিকে—

কাকীমাকে বলতেই কাকীমা বললেন—তা যাও, তবে খাওয়া-দাওয়া কোর না যেন সেদিনকার মত—

বাইরে আসতেই শ্রীবিলাসবাবু বললেন—আপনাকে বলবো বলেই ডাকলুম—

বললাম—কী বলবেন ?

—জানেন, আজকে একটা অঙ্ক দিয়েছিলাম ক্লাশে, কেউ পারলে না, শুধু বনলতা পারলে—

বললাম—ভালো তো—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—খুব শক্ত অঙ্ক জানেন, একটু শক্ত অঙ্ক দেখেই দিয়েছিলাম, পরীক্ষা করে দেখছিলাম কেউ পারে কি না, আর দেখেছেন তো, ওই তো ওদের বাড়ি, বাপটা একটা মুখ্যু, মা পাগল, লেখাপড়ার ধার দিয়ে ঘেঁষে না কেউ, সেই আবহাওয়ার মধ্যে কি করে এমন প্রতিভা জন্মালো বলুন তো ? আমি রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে এক-এক সময় ভাবি ! যত ভাবি ততই অবাক হয়ে যাই, জানেন—

বললাম—সত্যিই আশ্চর্য !

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—আশ্চর্য বলে আশ্চর্য ! আমাদের এখানে এস-ডি-ও মিস্টার চ্যাটার্জি এসেছিলেন, তাঁকেও দেখিয়েছিলাম, তিনি তো ক্লাশে গিয়ে প্রশ্ন করে অবাক, যা জিজ্ঞেস করেন, সব টপটপ করে উত্তর দিয়ে দেয়, একেবারে কারেক্ট উত্তর, তিনি তো থ ! তিনি আমাকে বললেন—বনলতাকে লেখাপড়া শিখিয়ে যান, ও একটা প্রতিভা—

কত কথাই যে তিনি বলেছিলেন সেদিন, মনে আছে শ্রীবিলাসবাবু কাছে থাকলেই সমস্ত ক্ষণ কেবল বনলতার প্রশংসাই শুনতে হতো। বনলতার প্রতিভা, বনলতার স্বাস্থ্য, বনলতার চেহারা, বনলতার চুল, বনলতার স্বভাব-চরিত্র—এককথায় বনলতার যেন তুলনাই নেই পৃথিবীতে !

দু'চার দিন পরেই একদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। বোধহয় ছুটির দিন সেটা। ছুটির খেয়াল অবশ্য আমার ছিল না। কোথা দিয়ে কোথায় চলেছি ঠিক ছিল না। এমনি এলোমেলো বেড়াচ্ছিলাম। গ্রীষ্মকাল। শ্রীবিলাসবাবু যাতে দেখতে না পান

তাই তিনি কাছারি বাড়িতে নামবার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

বোধ হয় সেটা দক্ষিণপাড়া। কয়েকটা পুকুর পর পর। পুকুরের পাড় দিয়ে যেতে হঠাৎ কানে এল—শুনুন—

ফিরে দেখি বনলতা হাসছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

বললাম—তুমি?

বনলতা বললে—আপনি কোথায় যাচ্ছেন এদিকে?

বললাম—এই একটু বেড়াতে বেরিয়েছি—তুমি এখানে?

বনলতা বললে—আপনাকে দেখতে পেলাম বাড়ি থেকে, তাই তো এলাম, আপনি এত জোরে হাঁটেন। মাস্টার মশাই কোথায়?

বললাম—তিনি তাঁর বাড়িতে—

বনলতা বললে—আপনি তো মাস্টার মশাই-এর সঙ্গেই সব সময় থাকেন দেখেছি—

বললাম—তিনি আমাকে ডাকেন তাই থাকি, তিনি তো আমার চেয়ে অনেক বড়, এখানকার জমিদার—

বনলতা বললে—আপনি তো আর এলেন না পরদিন, আমি যে আসতে বলেছিলাম আপনাকে?

বললাম—আমি একলা কী করে আসি?

—বারে, আপনি সোজা চলে আসতে পারেন না? সেদিন তো রাস্তা চিনে গেছেন!

বললাম—রাস্তা চিনলেই কি সব সময় সব জায়গায় আসা যায়? তিনি সঙ্গে না নিয়ে এলে কী করে আসবো? যদি কেউ কিছু বলে?

বনলতা বললে—বলবে না ছাই, আপনি তো নগেনবাবুর ভাইপো, মাস্টার মশাই-এর বন্ধু,—সবাই আপনাকে চিনে গেছে এখানে!

বললাম—কই, আমি তো কারোর সঙ্গে আলাপ করিনি!

—না-আলাপ করলেই বা! আপনি এসেছেন, ক'দিন আছেন, কে সঙ্গে এসেছেন, আমরা সব জানি!

—বারে, আমি ভেবেছিলাম আমায় কেউ চেনে না বুঝি।

বনলতা বললে—গাঁয়ের লোক আমরা, আমরা সকলের সব খবর রাখি, আপনি মাস্টার মশাই-এর সঙ্গে আমাদের বাড়ি এসে-ছিলেন সে-খবরও সবাই জেনে গেছে!

—তাও জেনে গেছে? তবে তো মুস্কিল হলো!

—কেন, কিসের মুস্কিল?

বললাম—তা হলে আর খোলাখুলি ঘুরে বেড়ানো চলবে না। যেখানে ইচ্ছে যাওয়া চলবে না—

বনলতা হঠাৎ বললে—কেন? আপনি নির্ভয়ে আমাদের বাড়িতে আসবেন!

বললাম—শ্রীবিলাসবাবু না থাকলে কী করে আসি!

—কেন, মাস্টার মশাই কি আপনার মনিব?

বললাম—তিনি হলেন জমিদার, তাঁর সাত খুন মাপ, তাঁর যেখানে যখন খুশী যাবেন, কেউ কিছু বলতে পারবে না—আমার তো তা নয়—

—কেন, আপনি নতুন লোক বলে কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছেন?

হেসে ফেললাম। বললাম—না তা নয়, কিন্তু আমি তো তোমার মাস্টার মশাইও নই, আমি তোমাদের বাড়ি যাবো কীসের অধিকারে?

—আমার সঙ্গে তো আপনার পরিচয় আছে! আমাকে তো চেনেন? তবে আর আপত্তি কীসের?

মনে আছে শেষ পর্যন্ত সেদিন বনলতার বাড়িতে যেতেই হয়েছিল আমাকে। যেতে যে অনিচ্ছে ছিল তা নয়। কিন্তু হঠাৎ গেলে কে কী মনে করবে তাই নিয়েই ভাবনা ছিল।

রাস্তায় যেতে যেতে বললাম—শ্রীবিলাসবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার ?

বনলতা বললে—তাঁর সঙ্গে তো রোজই দেখা হয়—

বললাম—সে তো ইস্কুলে ?

বনলতা বললে—ইস্কুলে যাবার সময় তিনি তো রোজ আমার বাড়ি থেকে আমায় ডেকে নিয়ে যান—

—কেন, একলা যেতে পারো না তুমি ?

বনলতা হাসলো। বললে—না তা ঠিক নয়, আমার বয়েস হচ্ছে কি না—বলে হাসতে লাগলো খুব।

আমি যেন কেমন লজ্জায় পড়ে গেলাম। বনলতার বয়েস হচ্ছে কি না তা তার দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু চোখটা হঠাৎ নামিয়ে নিলাম। মেয়েদের বয়েস পরীক্ষা করতে যাওয়া যে অপরাধ এ-বোধ কিছুক্ষণের জন্যে যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু এ-সম্বন্ধে কোনও কথা বলা উচিত নয় বলেই আর বললাম না।

বনলতা চলতে লাগলো আমার পাশে পাশে, আমিও তার সঙ্গে চলেছি।

হঠাৎ বনলতা জিজ্ঞেস করলে—পাড়াগাঁয়ে এসে কেমন লাগছে আপনার ?

বললাম—ভালোই তো—

বনলতা বললে—ও তো এড়িয়ে যাওয়া উত্তর।

বললাম—তাছাড়া আর কী বলবো বলো ?

বনলতা বললে—লোকে বলে কলকাতার লোকেরা নাকি খুব চালাক-চতুর—

বললাম—আমাকে দেখে কি তাই মনে হচ্ছে তোমার ?

বনলতা হেসে বললে—কিন্তু বোকাও কেউ বলতে পারবে না আপনাকে !

বললাম—কীসে বুঝলে ?

বনলতা বললে—মাস্টার মশাই আমাদের জন্যে কেন এত করেন, সত্যি বলুন তো আপনি বুঝতে পারেন নি !

বললাম—সে তো তোমার স্মরণ শক্তি দেখে, তোমার লেখা-পড়ার ক্ষমতা দেখে—আর কী কারণে ?

বনলতা বললে—শুধু কি তাই ? এই যে আমাদের সংসার-খরচা দেন উনি, বাবাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেন, সে-ও কি শুধু সেই কারণে ?

বললাম—তা ছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে ?

বনলতা আমার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগলো।

বললে—আপনি ন্যাকা, বুঝতে পারেন না কিছু ?

বললাম—বুঝিয়ে না বললে কী করে বুঝবো, বা রে—

বনলতা বললে—তাহলে মাস্টার মশাই-এর সঙ্গে সেদিন একেবারে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন কেন ?

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—উনি যে নিয়ে এলেন আমাকে সঙ্গে করে—

—আর সঙ্গে করে নিয়ে এলেন বলেই আপনি এলেন, আপনার বুঝি ইচ্ছে ছিল না আসতে ?

বললাম—আমরা ওঁদের বাড়িতে আছি, ওঁর কথা অমান্য করি কী করে বলো ?

—কিন্তু আপনার আসতে ইচ্ছে ছিল কিনা বলুন না ?

বললাম—ইচ্ছেও ছিল না, অনিচ্ছেও ছিল না—

বনলতা কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। একটু পরে বললে—তাহলে আজকে একলা-একলা কেন আসছিলেন ?

বললাম—বারে, আমিতো বেড়াতে বেরিয়েছিলাম—

বনলতা বললে—বেড়াবার তো অনেক জায়গা আছে, উত্তর-পাড়া, পুবপাড়া, বামুনপাড়া, নদীর ধারেও তো বেড়াতে পারতেন,

বেড়াবার এত জায়গা থাকতে দক্ষিণপাড়াতেই বা এলেন কেন? আমি বুঝি কিছু বুঝিনা ?

বললাম—তুমি অবশ্য বিশ্বাস করবে না, কস্তু এটা যে দক্ষিণ-পাড়া তাই-ই জানতাম না—

বনলতা তবু বিশ্বাস করলে না। বললে—আমার সামনে যদি বলতে লজ্জা হয় তো আপনাকে বলতে হবে না !

বললাম—লজ্জা ? লজ্জা হবে কেন ?

বনলতা বললে—হয়ত মাস্টার মশাই কিছু মনে করবেন এই জন্যে আপনার লজ্জা—

বললাম—মাস্টার মশাই কিছু মনে করবেন কেন ? তিনিই তো বার বার আমার মুখ থেকে তোমার প্রশংসা শুনতে চান্—তোমাকে দেখতে ভালো, তোমার লেখাপড়ায় মাথা আছে, এ-কথা বললে তাঁর তো খুশী হবারই কথা—

বনলতা বললে—তা হলে আপনি ছাই বুঝেছেন !

বললাম—বাঃ, তাতে তাঁর কেন রাগ হবে, আর আমি তো দু'দিনের জন্যে এসেছি, ছুটি ফুরোলে আমি আবার ফিরে যাবো, কাকা আছেন বলে তাই, নইলে জীবনে বোধ হয় আর শ্রীবিলাস বাবুর সঙ্গে দেখাই হবে না—তা হলে ?

বনলতা হঠাৎ বললে—আপনি কলকাতার ছেলে হলে কী হবে, আপনার কিছু বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই—আসুন—

বলে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। আমিও পেছন-পেছন ঢুকলাম।

মনে আছে সেদিন বাড়িটার ভেতরটা ভালো করে দেখেছিলাম। উঠোনে ছোট একটু বাগান মতন। একটা লাউ গাছ, মাচা বেয়ে একেবারে চালে উঠে গেছে। উঠোনটা গোবর নিকোন। পরিচ্ছন্ন পরিপাটি।

বললাম—কেউ নেই বাড়িতে ?

বনলতা বললে—বাবা তো ঘুরে বেড়ান সারাদিন।

—কেন, ঘুরে বেড়ান কেন?

বনলতা বললে—এই নানা কাজে, এক-জায়গায় এক ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকতে পারেন না, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ান—এখন ঘুরছেন আমার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে—

—তোমার বিয়ে? এত ছোট বয়েসে তোমার বিয়ে দেবার জন্যে ভাবছেন কেন?

বনলতা তেমনি হাসতে লাগলো আমার মুখের ওপর মুখ রেখে।

বললে—ইস্কুলে পড়ি বলে বয়েসটা আমার কম নাকি? আমাদের গাঁয়ের আমার বয়েসী মেয়েদের সকলের বিয়ে হয়ে গেছে—কারো কারো তিনটে ছেলেমেয়েও হয়ে গেছে—তা জানেন!

বললাম—গ্রামের মেয়েদের বোধ হয় খুব শিগ্‌গির শিগ্‌গির বয়েস বাড়ে—

বনলতা বললে—মাস্টার মশাই-এর কিন্তু আমার অত শিগ্‌গির বিয়েতে খুব আপত্তি—কেন জানেন?

বললাম—তোমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে বলে?

বনলতা জিজ্ঞেস করলে—আপনাকে সেই কথা বলেন বুঝি?

বললাম—রোজই বলেন।

বনলতা বললে—রোজই আমার কথা হয়?

বললাম—তোমার কথা ছাড়া আর কোনও কথাই হয় না শ্রীবিলাসবাবুর সঙ্গে—ওঁর মুখে সব সময়েই কেবল তোমার কথা—

তারপর একটু থেমে বললাম—অথচ আশ্চর্য হয়ে যাই ভেবে, ওঁর নিজের সংসার বলতে তো কিছুই নেই দেখেছি, ওঁর ঘরে গিয়েও দেখেছি, বাঘছাল কমণ্ডলু আর বিছানায় শুধু তক্তপোশের ওপর কম্বল পাতা, আর দেয়ালের গায়ে শুধু মহাপুরুষের ছবি—

বনলতা বললে—মাস্টার মশাই তো ওই নিয়েই আছেন আর এই ইস্কুল—

বললাম—কিন্তু ইস্কুলে তো আরো অনেক ছেলে-মেয়ে আছে, তাদের বাড়ীতেও যান ?

বনলতা বললে—যান বৈ কি !

—আর তোমার বয়েসী যে সব মেয়েরা আছে, তোমার চেয়ে বড় যারা—তাদের বাড়িতে ?

বনলতা বললে—মাঝে মাঝে যান !

—আর তোমার এখানে রোজ রোজ ! বোধ হয় তোমার লেখাপড়ায় সকলের চেয়ে বেশী মাথা বলে !

বনলতা বললে—উনি তো তাই বলেন !

বললাম—আমাকেও তাই বলেন—

বনলতা বললে—আপনি বুঝি তা বিশ্বাস করেন না ?

বললাম—আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কী আছে বলো, আমি তো দু'দিনের জন্যে এসেছি, তারপর এখান থেকে চলে গেলে আমার কথা কি তোমরাই মনে রাখবে ?

বনলতা মাদুর পেতে দিয়েছে ঘরের ভেতর। তারই ওপর সামনা-সামনি বসে আছি—

বললাম—আর কাকা না থাকলে এখানে তো আসাই হতো না,—

বনলতা বললে—মনে রাখতেই কি আপনি চান ?

বললাম—আমার চাওয়া-না-চাওয়ার কথা বলছো কেন, কে না চায় সবাই তাকে মনে রাখুক !

বনলতা বললে—অন্য লোকের কথা ছেড়ে দিন, আপনি কী চান তাই বলুন !

বললাম—শুধু আমি কেন ? সকলেই চায় সবাই তাকে মনে রাখুক—

বনলতা বললে—আর মাস্টার মশাই ! মাস্টার মশাইকে দেখে আপনার কী মনে হয় !

বললাম—ওঁর কথা আলাদা, উনি সন্ন্যাসী মানুষ, পরের উপকার করতে পারলেই উনি খুশী—

—আপনি ঠিক ধরেছেন—ওঁর কথা আলাদাই বটে—

বলে হঠাৎ উঠলো। বললে—সেদিন আপনি প্রথম এলেন, আপনাকে অভ্যর্থনা করতে পারিনি, আপনি একটু বসুন—

তারপর একটা রেকাবিতে দু'টো নারকোলের ছাপা নিয়ে এসে বললে—আমার মায়ের মাথা খারাপ, তাই জলখাবার করে দিতে পারলাম না, ঘরের তৈরী এই জিনিসটা নিয়ে এলাম—খান—

বললাম—মিষ্টির দরকার ছিল না, এমনিতেই বেশ মিষ্টি লাগছে—

হেসে লুটিয়ে পড়লো বনলতা। বললে—কী মিষ্টি লাগলো! আমার কথা!

বললাম—মিষ্টি নয়?

—মাস্টার মশাই বলছিলেন আপনি নাকি খুব ভালো ছাত্র, লেখাপড়ায় ক্লাশের মধ্যে ফার্স্ট হন, কিন্তু ভালো ছেলেরা তো একটু লাজুক হয়, মেয়েদের সঙ্গে কথাই বলতে পারে না—

বললাম—শ্রীবিলাসবাবু কোত্থেকে শুনলেন আমি ভালো ছেলে?

—বোধ হয় আপনার কাকার কাছে শুনেছেন!

বললাম—ভুল শুনেছেন, ভাল ছাত্র বটে, কিন্তু তোমার মত ভালো নই তা বলে—তোমার মতন বয়েসে আমি অত জানতামই না, ক্লাশের মাস্টাররা কিছু জিজ্ঞেস করলে হাঁ করে চেয়ে থাকতাম—

বনলতা হঠাৎ বললে—আপনার বসতে একটু কষ্ট হচ্ছে বোধহয়, আপনি ওই পাশ-বালিশটা নিন, আরাম করে হেলান দিয়ে বসুন—

সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। হেলান দিলাম।

বনলতা বললে—আপনার খুব গরম হচ্ছে একটু হাওয়া করি!

বলে পাখাটা নিয়ে সত্যিই বাতাস করতে যাচ্ছিল।

বললাম—ও কি, না না পাখার বাতাস করতে হবে না, গরম

কালে গরম তো হবেই—বরং তোমার মাস্টার মশাইকে হাওয়া কোর—

বনলতা বললে—আপনার দেখছি হিংসেও আছে—

বললাম—হিংসে ? হিংসের কথা বলছো কেন ?

বনলতা বললে—মাস্টার মশাইকে হাওয়া করি বলে আপনার রাগ দেখে—

বললাম—মাস্টার মশাই-এর ওপর আমি রাগ করবো কেন ? তিনি জমিদার, তিনি তোমাদের সংসার চালাচ্ছেন, তোমাকে লেখা-পড়া শেখাচ্ছেন, তাকে হাওয়া করবে না তো কি আমাকে হাওয়া করবে ? আমি তো দু'দিনের—

বনলতা বললে—আপনার বুঝি চিরকালের হতে ইচ্ছে করে ?

বললাম—শুধু ইচ্ছে নয়, লোভও হয়—

বনলতা হাসতে লাগলো। বললে—আমাদের গাঁয়ে একটা কথা আছে, লোভে পাপ পাপে মৃত্যু—

কী জানি আমি বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিলাম কোথায় বসে আছি। কাকা-কাকীমা, মছলন্দপুর, কলকাতা সব কথা ভুলে বসেছিলাম। বললাম—লোভ করবার মত তেমন জিনিসের জন্যে মরাও তো সার্থক—

বনলতা বললে—আপনাদের কলকাতার লোকদের মত কথা বলতে পারি না তো, নইলে এর একটা উত্তর দিতাম—

বলে খুব হাসতে লাগলো।

বললাম—তা বললে শুনবো না—পাড়াগাঁয়ের লোকেরা কথা বলতে পারে না এ-কথা তোমাকে দেখে আর বিশ্বাস হয় না—

বনলতা হঠাৎ আমার কাছে সরে এল। মুখের কাছে মুখ এনে বললে—দাঁড়ান, আপনার গায়ে একটা মশা বসেছে—নড়বেন না—

বলে হঠাৎ আমার গালে ঠাস করে একটা চড় মারলে—। আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো।

—যাঃ, পালিয়ে গেল, আপনি নড়লেন কেন ?

বলে হো হো করে হাসতে লাগলো। হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগলো একেবারে।

—কী হলো ?

হঠাৎ মুখ তুলে দেখি শ্রীবিলাসবাবু ঘরে ঢুকছেন। মাস্টার মশাইকে দেখে আমিও কেমন অবাক হয়ে গেলাম। বনলতাও কেমন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনই সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বললে—দেখুন মাস্টার মশাই, আপনার কলকাতার লোকের কাণ্ড দেখুন—

শ্রীবিলাসবাবুও যেন ঠিক আমাকে এ-সময় এখানে আশা করেন নি।

বললেন—আপনি যে এখানে হঠাৎ ?

বললাম—বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, বনলতা আমাকে ডেকে আনলে, ওঁর লেখাপড়া নিয়ে একটু আলোচনা করছিল···

—না মাস্টার মশাই—মিথ্যে কথা।

বনলতা হঠাৎ আমার দিকে চাইলে। বললে—আমরা আপনাকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম !

—আমাকে নিয়ে !

বনলতা বললে—আমি আপনার নিন্দে করছিলাম, দেখছিলাম উনি কী বলেন।

শ্রীবিলাসবাবু সে-কথায় কান দিলেন না। আমার দিকে চেয়ে বললেন—কতক্ষণ এসেছেন !

বললাম—প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক—

শুনে শ্রীবিলাসবাবু যেন একটু থমকে গেলেন। কিন্তু সে শুধু একটুখানির জন্যে। তারপরে সামলে নিয়ে বললেন—এখানে আপনাকে আনবো বলে যে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম—

—আমাকে!

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—হ্যাঁ, ভাবলাম একসঙ্গেই আসবো দু'জনে! তা ভালোই করেছেন আপনি এসে গেছেন—

কিন্তু আমার মনে হলো শ্রীবিলাসবাবুর যেন ভালো লাগেনি আমার এখানে এই একলা আসা।

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—তোমার পড়াশুনো কতদূর হলো? কালকের পড়াটা মুখস্থ হয়েছে?

বনলতা বললে—আজকে সারাদিন তো সময় পাইনি—

—কিচ্ছু হয়নি?

বনলতা বললে—না। ভেবেছিলাম বিকেলবেলা পড়বো, কিন্তু ইনি এসে গেলেন তাই—

বললাম—আমি তাহলে উঠি আজ, ওর পড়ার ক্ষতি করে গেলাম খুব—

বনলতা বললে—না, আপনি বসুন, পড়া তো রোজই আছে, আপনি তো আর রোজ আসেন না—

হঠাৎ ভেতর থেকে একটা কান্নার আওয়াজ এলো।

—ওমা, আমি কোথায় যাবো গো—আমার মেয়ের কপাল এমন করে কেন ভাঙলো গো—

বিকট চিৎকার! আর্তনাদই বলা চলে। এক মুহূর্তে আব-হাওয়াটা যেন থমথম করতে লাগলো। সবাই চুপ করে গেল। কারো মুখে আর কথা বেরুল না।

বললাম—কে কাঁদছে?

বনলতা বললে—মা!

বললাম—আমি তা হলে চলি—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—চলুন, আমিও চলি আপনার সঙ্গে—তুমি কালকের পড়াটা তৈরি করে রেখো—সকালে ইস্কুলে যাবার সময় আমি আসবো—

বাইরে বেরিয়ে এলাম। মাঝে মাঝে তখনও কান্নার শব্দটা কানে আসছে। বাড়ির সামনেই পুকুর। কয়েকটা আমগাছ। পুকুর পাড়ের পাশ দিয়ে আসছি। মনটা যেন বিষাদে ভরে উঠলো।

বললাম—ওর মার মাথা-খারাপ কেন হলো?

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—অনেক দিন থেকে—

জিজ্ঞেস করলাম—বনলতা স্কুলে ভর্তি হবার আগে থেকে?

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—বনলতা নাম যে বদলে গেছে, ও যে ইস্কুলে পড়ছে, তাই-ই ওর মার খেয়াল নেই—

বললাম—এবার ওর বিয়ে দিলে ভালো হয় একটা—

বিয়ে! শ্রীবিলাসবাবু আমার মুখ থেকে কথাটা শুনে কেমন যেন চমকে উঠলেন।

বললেন—বিয়ে!

কথাটা যেন শ্রীবিলাসবাবুর বুকের ভেতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল। কথাটা অনেকবারই শুনেছেন তিনি ভুবন মুহুরীর মুখ থেকে। অনেকবার অন্য লোকেও বলেছে তাঁকে শুনেছি। কিন্তু মনে হলো তবু যেন তাঁর কাছে বিয়ের কথাটা এই মুহূর্তে বিপজ্জনক মনে হলো।

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—বিয়ে দিলে ওর মাকে কে দেখবে?

বললাম—এখন কে দেখছে?

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—এখন কেউ-ই দেখছে না—কিন্তু যখন বুড়ো হবেন আরো, তখন কে দেখবে, ওর তো ভাই নেই যে মাকে দেখবে—

বললাম—বাপ-মাকে দেখবার লোক নেই বলে কি ওর বিয়ে আটকাবে!

—কিন্তু ওর লেখাপড়া?

বললাম—তেমন জায়গায় বিয়ে হলে লেখাপড়া বন্ধ হবে কেন?

আজকাল কলকাতায় তো অনেক মেয়ে বিয়ের পরেও লেখাপড়া করছে !

শ্রীবিলাসবাবু যেন কী ভাবলেন খানিকক্ষণ !

বললেন—বিয়ের পরও লেখাপড়া চলবে বলছেন ?

বললাম—কলকাতায় তো চলে। আমার দিদিরই তো বিয়ে হয়ে গেছে, এখনও পড়ছে—

শ্রীবিলাসবাবু আবার কী যেন ভাবতে লাগলেন।

রাস্তা দিয়ে চলছিলাম। অন্ধকার হয়ে এসেছিল। চারিদিকে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে জোনাকি জ্বলছে মিটমিট করে। পথ দেখা যায় না ভালো করে। সরু রাস্তা। একেবারে গা-ঘেঁষাঘেষি করে চলেছি। শ্রীবিলাসবাবু অনেকক্ষণ চুপ করে রয়েছেন। দীর্ঘদেহ, তাঁর পাশে আমাকে যেন ছোট ছেলেটি দেখাচ্ছে একেবারে।

এ আজ থেকে কত দিন আগেকার কথা। তারপর কত বসন্ত কত শীত পার হয়ে কত চোখের জলের সমুদ্র, কত হাসির তেপান্তর পেরিয়ে আজ এত দূরে এসে পৌঁছেছি। কত দেখেছি কত শুনেছি ! যা দেখেছি তার থেকে ভেবেছি বেশি, যা শুনেছি তার থেকে অনুভব করেছি বেশি। সেই দেখা-শোনা ভাবা অনুভব করার পরেও সেই সেদিনকার ঘটনাটা যে আজো ভুলতে পারিনি তার কারণ আমি সেদিনকার সেই নাটকে শুধু দর্শকই ছিলাম না, অভিনেতাও ছিলাম একাধারে।

সেদিন বনলতাদের বাড়িতে শ্রীবিলাসবাবুই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে বনলতার পরিচয় তিনিই করে দিয়েছিলেন, কিন্তু দেখেছিলাম তিনিই আবার আমাকে বনলতাদের বাড়ি একলা যেতে দেখে কেমন যেন খুশী হতে পারেন নি। তিনি চেয়েছিলেন বনলতাদের বাড়িতে যদি আমি যাই-ই তো তাঁর সঙ্গেই যাবো। তাঁকে বাদ দিয়ে বনলতাদের বাড়ি যাবার আমার কোনও

অধিকারই যেন নেই। তিনিই আসল, আমি যেন শুধু ছায়া। তিনি ছাড়া আমার যেন কোনও অস্তিত্ব থাকতে নেই। তিনি যদি বনলতাকে বলেন—ভালো মেয়ে, আমাকেও বলতে হবে বনলতা ভালো মেয়ে। তিনি যদি আমাকে বনলতাদের বাড়িতে নিয়ে যান, তবেই যেন আমি যেতে পারবো।

বনলতা যখন হেসে গড়িয়ে পড়ছে, ঠিক সেই সময়ে শ্রীবিলাসবাবুর ঘরে ঢুকে চমকে ওঠা, এবং নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টাটা যেন আমার ভালো লাগেনি, আগের দিনও তাঁর ব্যবহার দেখেছি, পরের দিনও দেখলাম—কিন্তু দু'টো দিনের ব্যবহারের তারতম্য দেখে কেমন দুঃখ হলো। মনে হলো—আমার কী দরকার ওদের বাড়িতে এসে। কাকাই তো ঠিক বলেছিলেন—ওদের সঙ্গে মেলামেশারও দরকার নেই বেশি। ওরা জমিদার, জমিদারই থাক্! আমি এসেছি দু'দিনের জন্যে, এখানকার কোনও ব্যাপারে জড়িয়ে যাওয়ার দরকার কী, লাভই বা কী?

কিন্তু পরের দিন আবার ডেকে পাঠালেন শ্রীবিলাসবাবু।

বললেন—চলুন—

বললাম—কোথায়?

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—বনলতা নাকি আপনাকে চড় মেরেছে—বলছিল আমাকে—

বললাম—কখন বললে?

—এই আজকে ইস্কুলে যাবার পথে, ওকে তো সঙ্গে করেই ইস্কুলে নিয়ে যাই—রাস্তায় যেতে যেতে বলছিল।

বললাম—কী বলছিল?

—এই জিজ্ঞেস করেছিলাম, কালকে আপনারা দু'ঘণ্টা ধরে কী গল্প করলেন!

বললাম—দু'ঘণ্টা অবশ্য কোথা দিয়ে কেটে গেল আমি নিজেই বুঝতে পারিনি।

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—ওর সঙ্গে গল্প করতে বসলে আমারও সময়ের হিসেব থাকে না।

বললাম—আপনার কথা আলাদা, আপনার তো অনেক কাজ—সমস্ত জমিদারিটা আপনার মাথায়—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—ও কিছু না, সরকার আছে, মুহুরী আছে, বাঁধা খাতা আছে, সেই অনুযায়ীই কাজ হয়—আমি ওর কী-ই বা বুঝি, কী-ই বা জানি। বাবা বুঝতেন, তিনি যেমন করে সব কাজ করতেন, তেমনটা আমি পারি না—

—তারপর আপনার নিজের কাজও তো আছে—?

—নিজেরই বা আর কী কাজ? একটু ভগবানের নাম-টাম করা আর মহাভারতটা পড়া।

—আর ইস্কুল!

—হ্যাঁ, ওই ইস্কুল নিয়েই যা কিছু ভাবনা। সব তো আমাকে একলাই করতে হয়। দেখুন না, চেয়ার, বেঞ্চিগুলো ভেঙে গেছে, সারাতে হবে, চাল দিয়ে জল পড়ে, সামনে বর্ষা আসছে, তখন ছেলে-মেয়েদের কী অসুবিধে যে হবে!

বললাম—বনলতাও তাই বলছিল—

হঠাৎ শ্রীবিলাসবাবু বললেন—আচ্ছা দেখুন সেদিন বনলতা আপনাকে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে কী বললে বলবেন না—

বললাম—ও যে বলতে বারণ করে দিয়েছে!

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—ও ওই রকম, ওর কথায় কান দেবেন না। আমার কাছে আদর পেয়ে-পেয়ে একটু বেশি ফাজিল হয়ে গেছে, আর তা ছাড়া আদর না-করে কী করি বলুন, নিজের মায়ের কাছে আদর পায়নি তো! মা যে কী-জিনিস, জানতেই পারলে না, আর তারপর বাপটাকে দেখেছেন তো, কোথায় যে বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়ায়, কী-কাজে যে ঘোরে, তা-ও বোঝা যায় না, অথচ দেখুন—

শ্রীবিলাসবাবু একটু দম নিয়ে বলতে শুরু করলেন—অথচ দেখুন, ওদের তো কোনও ভাবনা নেই, সব ব্যবস্থা সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছি আমি। সংসারের চাল ডাল দিই, ঘর সারিয়ে দিই, কাপড়-চোপড় যা-লাগে ওদের তা-ও কিনে দিই—তবু কীসের ভাবনা ওদের ?

বললাম—আপনি ওদের জন্যে অনেক করেন—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—অথচ কী আমার স্বার্থ! কিছুই নয়,—আমি চাই মেয়েটা লেখাপড়া শিখুক, একটু জ্ঞান ট্যান হোক, একটু ভদ্রভাবে কথাবার্তা বলতে শিখুক! নইলে গরীবের ঘরে জন্মেছে বলে সারাজীবন কেবল হাঁড়ি ঠেলবে আর স্বামীর লাথি-ঝাঁটা খাবে!

বললাম—ঠিকই বলেছেন!

—মেয়েদের আমরা ছোটভাবে কেন দেখি বলুন তো? দেখছি তো চারদিকে! তারা যেন মানুষ নয়, তারা যেন পুরুষের দয়ায় বেঁচে আছে—

এমনি অনেক কথা বলতেন শ্রীবিলাসবাবু। অনেক দিন দেখেছি গ্রামের প্রজারা এসে কাছারি বাড়িতে তার কাছে দরবার করেছে। নানা-লোকের নানান আর্জি। কেউ খাজনা দিতে পারছে না। কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না। কেউ খাবার অভাবে উপোষ করছে। কত অভাব, কত অভিযোগ। সব হাসিমুখে শুনেছেন তিনি।

কেউ বলে—আমার গেল সনের খাজনা মকুব করে দিতে হবে হুজুর, আমার ছেলে মারা গেল আষাঢ় মাসে, হাল ধরতে পারিনি—চাষবাস করতে পারিনি—

গ্রামের বিধবাদের বাৎসরিক বরাদ্দ ছিল। একখানা থান ধুতি। সন পিছু এক মণ ধান। একখানা গামছা। আর পুজোর সময় বাড়ি-বাড়ি সিধে।

শ্রীবিলাসবাবু রোজ শুনতেন সকলের কথা। পাশে হরিশবাবু খাতা খুলে খুলে বলতেন—মাধব কয়ালের তিন সনের বকেয়া—

শ্রীবিলাসবাবু বলতেন—তুমি দু'সনের দাও—এক সন মকুব করে দিলাম।

—বংশী জলকর দেয়নি গেল মাসে।

শ্রীবিলাসবাবু বলতেন—কেন রে? তোর তো মাছের কারবার? মাছ বেচে পয়সাগুলো কা করিস? সব পেটে ঢালবি? জমিদারের জলকর দিতে হবে না?

বংশী মালো বলে—আজ্ঞে মাছ আর ওঠে কই? বানের জলে সব যে ভেসে গেল সেবার—

—তা হলে এবার যা, চোত্-কিস্তীর সময় সব শোধ করে দেওয়া চাই—

শ্রীবিলাসবাবুর সে এক অন্য মূর্তি তখন। দয়া ধর্ম সেবা—তারই যেন প্রতীক। নিজে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে স্নান করে একটা ফতুয়া পরে তক্তপোশের ওপর বসে সব কাজ দেখেন। দেবতার মত তাঁকে সবাই ভক্তি করে। পায়ের ধুলো নিয়ে হাসিমুখে বাড়ি চলে যায়।

বাড়ির ভেতর শ্রীবিলাসবাবুর মা বলেন—বৌমা, তোমার ভাশুরের ঘরটা একবার পরিষ্কার করে রাখো তো, চারুর মা'কে দিয়ে বিশ্বাস নেই—

শ্রীদাম নিজের খেয়াল নিয়েই আছে। ফুটবল খেলা থাকে সাহেবগঞ্জে। মছলন্দপুরের দলের সঙ্গে সাহেবগঞ্জের ইস্কুলের দলের খেলা। সকাল থেকে তারই তোড়জোড় চলে। ফুটবলের দল আসে বাড়িতে। নিচের বৈঠকখানাটা তাদেরই দখলে। লেফ্‌ট ব্যাক সদানন্দর পায়ে ঘা হয়েছে, সমীর সেখানে খেলবে।

শ্রীদামবাবু বলেন—কেবল লং শট্ করবি তোরা, বল পেলে আর পায়ে রাখবি না এক মিনিট—

—কিন্তু শ্রীদামদা, গ্রাউণ্ড খারাপ হয়ে গেছে বিষ্টি হয়ে, আমি কাল গিয়ে দেখে এসেছি। শুনছি ওরা সব বুট পায়ে খেলবে!

তা পরের বছর সকলের বুট এল কলকাতা থেকে।

শ্রীদামবাবু বললেন—এবার বুট পরে খেলতে হবে তোদের, এখন থেকে প্র্যাকটিস্ করা চাই—

শুধু খেলাই নয়। খেলার পর আলোচনা, বৈঠকখানার ভেতর বিড়ি সিগ্রেটও চলে! শ্রীদামবাবু দামী সিগ্রেট খান।

দেখেছি বৈঠকখানার জানলা দিয়ে, শ্রীদামবাবু সিগ্রেট টানছেন আর তুমুল তর্ক চলেছে সমানে। সমীর যদি বলটা পাস করে দিতো কানাইকে তো ও গোলটা হোত না। সমীরেরই তো দোষ।

শ্রীদামবাবু বলেন—সমীর তুই যদি বল্‌টা পাস্ করে দিতিস তো আমাদের দাঁড়িয়ে হারতে হতো না—

তর্ক যখন তুমুল হয়ে উঠেছে, হঠাৎ জুতোর আওয়াজ পাওয়া যায় বড় দাদার!

সঙ্গে সঙ্গে সব গলা নিচু হয়ে পড়ে।

সমীর বলে—ওই বড়বাবু আসছে—

শ্রীদাম হাতের সিগ্রেটটা লুকিয়ে ফেলে।

শ্রীবিলাসবাবু ঘরে ঢুকেও পড়েন। বলেন—কী হলো রে, আজকে খেলার রেজাল্ট কী তোদের?

শ্রীদাম বলে—আমরা হেরে গেছি দাদা—

—কেন? হারলি কেন?

—ওই সমীরের জন্যে! বল্ নিয়ে পায়ে রেখে দেওয়া স্বভাব হয়ে গেছে ওর!

সেখান থেকে দোতলায় ওঠবার পথে উঠোনে বাগানের দিকটা নজরে পড়তেই ডাকেন—খগেন—

খগেন গাছে জল দিচ্ছিল। ভয়ে ভয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়।

শ্রীবিলাসবাবু বলেন—হ্যাঁরে বেলফুলের চারাটা হলো না ?

খগেন বহুদিন ধরে বাগানে কাজ করছে। বাবার আমল থেকে। বললে—নোনা লেগে গেল বড়বাবু—

—একটু তুঁতে দে দিকিনি, তুঁতের জল ছিটিয়ে দেখ না।

—দিয়েছিলাম।

—তামাকের জল ?

খগেন বললে—আজ্ঞে তামাকের জল তো দিইনি, কিন্তু ও-গাছ আর হবে না, একবার নোনা পেলে আর বাঁচবে না কিছুতেই—

নিজের ঘরে ঢোকবার মুখেই থম্‌কে দাঁড়ালেন। বৌমা তাঁর ঘর পরিষ্কার করছিল। তাঁর পায়ের শব্দ শুনতে পায়নি, কী যেন গুনগুন করে একটা গান গাইছিল। বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন শ্রীবিলাসবাবু, হঠাৎ মা দেখতে পেয়েছেন। বললেন—এখানে দাঁড়িয়ে কেন বাবা ?

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—না—

—ও, ঘরে বুঝি বৌমা রয়েছে ? ও বৌমা, তুমি বেরিয়ে এসো, বিলাস এসেছে,—এই তোর ঘরটা একটু পরিষ্কার করতে বলেছিলাম বৌমাকে, আর তো কাউকে ঢুকতে দিই না তোর ঘরে—

শ্রীবিলাসবাবু চোখ নিচু করে রইলেন। একমাত্র পা ছাড়া কখনও ভ্রাতৃবধূর মুখদর্শন করেন নি শ্রীবিলাসবাবু।

বৌমা বলে—মা, যদি ওঁর কোনও জিনিসে হাত দিয়ে ফেলি, উনি হয়ত রাগ করবেন—

মা বলেন—রাগ করবে কেন বৌমা, আমার বিলাস তেমন ছেলে নয়—এ তো শ্রীদাম নয়, ও আলাদা ধরনের—

আমি বনলতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম একদিন—আচ্ছা উনি বিয়ে করলেন না কেন ?

বনলতা বলেছিল—বিয়ে করবার বয়েস কি ওঁর ফুরিয়ে গেছে নাকি ?

বলেছিলাম—এতদিন পরে আর কি বিয়ে করবেন ?

বনলতা বলেছিল—মনে হয় বিয়ে করতে অনিচ্ছে নেই ওঁর।

তারপর একটু থেমে বলেছিল—কিন্তু এখন বিয়ে করা ওঁর পক্ষে মুস্কিল !

—কেন ?

বনলতা বলেছিল—এখন এত নাম, এত খ্যাতি, এখন লোকে ওঁকে এত ভক্তি করে, এখন বিয়ে করতে কি আর পারবেন ?

—তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে নাকি ?

বনলতা বলেছিল—করেছিলাম।

—কী বললেন ?

—ও-সব আলোচনা করতে গেলে রেগে যান, ধমকে দেন, বলেন—তুমি বড় দুষ্টু হচ্ছো দিন-দিন—

পর পর দু'দিন বনলতার বাড়িতে যাবার পর আমার কেমন যেন একটা নেশা হয়ে গিয়েছিল। রাস্তা দিয়ে চলতাম আর মনে হতো বনলতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে যেন ভালো হয়। যেন দেখা হলে ডাকে আমাকে। তাহলে বনলতাদের বাড়িতে গিয়ে দু'জনে গল্প করি। আরও মনে হতো শ্রীবিলাসবাবু না-থাকলেই যেন ভালো হয়। শুধু বনলতা আর আমি।

সত্যিই এক-একদিন দেখা হয়ে যেত।

বনলতা বলতো—কোথায় চলেছেন ?

বলতাম—বেড়াতে—

বনলতা বলতো—আর বুঝি আসবেন না আমাদের বাড়িতে ?

বলতাম—কেন আসবো না ? তোমার সঙ্গে কি আমার ঝগড়া হয়ে গেছে ?

বনলতা বলতো—বাবা রে বাবা, আপনি দেখছি শেষকালে ঝগড়া না বাধিয়ে ছাড়বেন না।

বলতাম—ঝগড়ার কথা বললেই কি ঝগড়া বাধাচ্ছি সত্যি সত্যি ?

বনলতা বলতো—হ্যাঁ, বাধাচ্ছেন তো, ঝগড়ার কথা বলতে নেই মুখে, তাহলে ঝগড়াই হয়ে যায়—

হেসে ফেলতাম। বলতাম—আর ঝগড়া বাধলেই বা কী? আমি তো চলে যাচ্ছি আর ক'দিন পরেই—

বনলতাও হাসলো। বললে—আমার জন্যে মন কেমন করছে বুঝি ?

এর পরে আর কথা বলা যেত না।

বলতাম—চলো চলো তোমাদের বাড়িতেই চলো, আর কথা বলে দরকার নেই—

আজ এতদিন পরে ঠিক সেইখানেই যাচ্ছি এ-ও কেমন এক ভাগ্যের নির্বন্ধ। সেদিন শেষ পর্যন্ত যে-দুর্নাম নিয়ে, যে-অপবাদ নিয়ে আমাকে চলে আসতে হয়েছিল তাতে তখন মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু তার যে এতদিন পরে এমন করে জবাবদিহি করবার সুযোগ পাবো তা কি জানতাম।

মনে আছে কতদিন বনলতার সঙ্গে একসঙ্গে দু'জনে বেড়াতে গিয়েছি। মগেরা লুঠপাট করতে আসতো যে-সব জায়গায় বহু বছর আগে, সেইখানে হয়ত কোনও গাছের গুড়িব ওপর গিয়ে বসতাম। শ্রীবিলাসবাবু আসবার আগেই আবার বাড়ির দিকে চলে আসতাম—

বনলতা বললো—ওঁকে লুকিয়ে লুকিয়ে আসছি আমরা, এটা মাস্টার মশাই জানলে কিন্তু খুশী হতে পারবেন না—

বলতাম—তাহলে ওঁকে সঙ্গে নিয়ে এলেই তো হয়—

বনলতা বলতো—না—

জিজ্ঞেস করতাম—কেন ?

বনলতা বলতো—তিনজনে মিলে ঠিক ভাব জমানো যায় না। আপনার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেছে—

বলতাম—কিন্তু তিনজনে ভাব হতে আপত্তি কী? উনি সঙ্গে থাকলে তো ভালোই—

বনলতা বলতো—জানেন না একটা ছড়া আছে—

একে মিন্ মিন্ দু'য়ে পাঠ,
তিনে গোলমাল চারে হাট।

বলতাম—তিনজনে একসঙ্গে মিললে বুঝি গোলমালই হয় শুধু?

বনলতা বলতো—হ্যাঁ, হয়ই তো—

—তাহলে মাস্টার মশাই-এর সঙ্গেই তুমি বেড়াতে এসো, আমাকে বাদ দাও—আমি তো বাইরের লোক, তোমাদের দু'জনের মধ্যে আমি কেন এসে গোলমাল বাধাই!

বনলতা বলতো—ওমা, আপনি গোলমাল বাধাবেন কেন? আমি কি তাই বলেছি?

বললাম—না, ওঁকে না বলে তোমার সঙ্গে বেড়াতে আসা আমার উচিত নয়—

—কেন? উনি কি আমার গার্জেন?

বললাম—গার্জেনই তো! তিনি গার্জেন না তো গার্জেন কে? কে তোমাকে পড়ার খরচ দিচ্ছে? কে তোমাকে খাওয়াচ্ছে? পরাচ্ছে? কে তোমাদের সংসারের খরচ দিচ্ছে? তিনিই তো? তাঁকে ঠকানো তোমার উচিত নয় এমন করে!

কী যে হলো! আমার কথাগুলো শুনতে শুনতে যেন ভেঙে পড়লো বনলতা। বনলতার চোখ ছলছল করে উঠলো। তারপর এক সময়ে মুখ নিচু করলে। আমার হাতের ওপর টপ্ টপ্ করে তার চোখের জল দু'ফোঁটা পড়লো টের পেলাম।

কী করবো বুঝতে পারলাম না।

হঠাৎ সেই মুহূর্তে তার হাত দু'টো ধরে ফেললাম। ধরতেই বনলতা আমার কোলের ওপর ভেঙে পড়লো। আমি কিছু বলবার আগেই মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

আমি চুপ করে বসে রইলাম। আমার মনে হলো এ-মেয়ে শুধু হাসতেই জানে না, এ-মেয়ে কাঁদতেও জানে। এও তো আমার এক আবিষ্কার! আজকে এই মেয়ের সঙ্গে এইখানে এই নির্জনে না বসলে তো এ আবিষ্কার হতো না।

ভাবছিলাম বনলতাকে সেই অবস্থায় ফেলে রেখে উঠে আসবো কিনা।

আমার তখন কম বয়েস। কিন্তু তবু সেই বয়সেই বুঝেছিলাম যে ঠিক এই ভাবে এইখানে বনলতার মাথা কোলের ওপর রেখে চুপ-চাপ বসে থাকাটা অপরাধেরই সামিল। অথচ বলতে আজ লজ্জা নেই—আমার ভালোও লাগছিল। মনে হচ্ছিল বনলতাকে জোর করে দূরে ঠেলে দিলে আমারও খুব খারাপ লাগবে। সেই বয়েসে সেই রোমাঞ্চকর অনুভূতির কথা আজ এ-বয়েসে আর নতুন করে বুঝতে পারবো না, হয়ত বোঝাতেও পারবো না।

একবার শুধু বললাম—কাঁদে না, ওঠ, ছিঃ—

বনলতা তবু মুখ তুললো না, সেই রকম ভাবেই কাঁদতে লাগলো ফুলে-ফুলে।

বললাম—ওঠ, কেউ যদি দেখে ফেলে—

বনলতা বললে—দেখুক গে, আপনিই যখন খোঁটা দিতে পারলেন…

কথা তার শেষ হলো না। তার আগেই আমি হঠাৎ চমকে উঠে পা সরিয়ে নিয়েছি। বনলতার মুখটাও কোল থেকে সরিয়ে দিয়েছি।

দেখলাম—সামনে সশরীরে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীবিলাসবাবু!

শ্রীবিলাসবাবুকে দেখে আমি চমকে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে উঠলাম। বললাম—আপনি?

বনলতাও তার খোঁপাটা গুছিয়ে নিতে নিতে আমাকে বললে—দেখেছেন তো? আমি আপনাকে বলেছিলুম?

শ্রীবিলাসবাবু হাসলেন। বললেন—কী বলেছিলে ?

বনলতা কাপড়টা গুছিয়ে বললে—বলেছিলাম—আমি আপনার কোলে মাথা দিয়ে শুলে আপনার গা ব্যথা করবে, উনি বললেন—না, ব্যথা করবে না, তুমি শোও—

আমি হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম বনলতার দিকে। এই মেয়ে এমন মিথ্যে কথাও বলতে পারে! কিন্তু বলবার আমার মুখ ছিল না। আমি অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইলাম শুধু।

কিন্তু বনলতা তখন হাসছে। শ্রীবিলাসবাবুও হাসছেন।

বললেন—কোলটা তো আর কারো মাথা রাখবার জন্যে হয়নি মানুষের, বেশিক্ষণ শুয়ে থাকলে ব্যথা তো করবেই—

বনলতা বললে—করবেই তো, কিন্তু উনি কিছুতে বিশ্বাস করবেন না মাস্টার মশাই—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—আপনি হেরে গেছেন বনলতার কাছে—

বলে হাসতে লাগলেন। বনলতাও হাসতে লাগলো হো হো করে।

আমি বোকার মত চুপ করে রইলাম। মুখ ফুটে বলবার মত কোনও কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল না।

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—চলুন, যাওয়া যাক—

তিনজনেই চলতে লাগলাম। যেন শুধু পরাজিত নয়, অপমানিতও মনে মনে হলো নিজেকে। আমি শহরের ছেলে, কলকাতার ছেলে, এখানে এসে একটা গ্রামের ছোট্ট মেয়ের কাছে যেন অপমানিতই হয়েছি। মনে হলো—ছলনা করে নয়, ইচ্ছে করে একজনকে অপদস্থ করতে এদের যেন বাধে না। এরা সব পারে! এরা মানুষকেও খুন করতে পারে!

দক্ষিণপাড়ার কাছে আসতেই বললাম—আমি চলি শ্রীবিলাসবাবু—

—কেন? চলে যাবেন কেন?

বনলতা বললে—না না; আসুন আপনি, না এলে বুঝবো আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন।

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—আপনি বনলতার ওপর রাগ করবেন না, ও অমন অনেক কথা বলে, ওর কথায় রাগ করতে নেই—

বললাম—না রাগ করিনি, কিন্তু আমি চলি—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—কেন? যাবেন কেন? কোনও কাজ আছে?

বললাম—কাকা আজ বাড়িতে আছেন—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—আচ্ছা, আপনাকে তাহলে আর আটকে রাখবো না—

অন্ধকারে পথ খুঁজে খুঁজে আসছি। রোজ রোজ গিয়ে গিয়ে দক্ষিণপাড়ার রাস্তা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তবু যেন কি জানি সেদিন পথ হারাতে লাগলাম। চেনা পথ আমার কাছে হারিয়ে গেল হঠাৎ। এ-ও এক আশ্চর্য ব্যাপার বৈকি!

হঠাৎ পেছন থেকে যেন কার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

দেখি শ্রীবিলাসবাবু তাড়াতাড়ি এসে আমার কাছে দাঁড়ালেন।

হাঁফাচ্ছিলেন তখনও। বললেন—চলুন, আমিও বাড়ির দিকে যাবো—

বললাম—কেন? আপনি আজ পড়াবেন না বনলতাকে?

—না, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

—আমার সঙ্গে? বলুন।

শ্রীবিলাসবাবু হঠাৎ বললেন—আপনি বিয়ে করবেন?

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

—করুন না বিয়ে। বনলতাকেই বিয়ে করুন না!

বনলতাকে?

শ্রীবিলাসবাবু বলতে লাগলেন—অবশ্য আপনার কাকার মত নিতে হবে, বাবার মত নিতে হবে, মাথার ওপর তাঁরা আছেন এখনও, কিন্তু আপনার মত আছে কি না সেইটে বলুন আগে, তারপর যা করবার আমি করবো—

আমি কথা বলবো কি ? আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।

আবার বলতে লাগলেন—আপনি ওদের অবস্থার কথা তো ভাবছেন, ওদের অবস্থা যা-ই হোক, যা দেবার থোবার সবই আমি দেব, আপনার বাবা যদি নগদ চান, তা-ও আমি দেব—

এবারও আমি কোন কথা বললাম না। সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে চলতে লাগলাম।

শ্রীবিলাসবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন—কী, আপনার মত আছে ?

এবারও আমি কোন কথা বললাম না।

শ্রীবিলাসবাবু আবার বলতে লাগলেন—বনলতাকে তো আপনি নিজে দেখছেন, এতদিন মিশলেন,— আপনার পছন্দ হয়েছে কি না বলুন ?

বললাম—আমাকে এ-সম্বন্ধে নাই বা জিজ্ঞেস করলেন।

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—আপনার গুরুজনদের কথা পরে হবে— আপনারও তো একটা মত আছে ?

বললাম—বিয়ে করার বয়েস এখনও আমার হয়নি, আপনি বলছেন কি ?

—কেন ? শ্রীবিলাসবাবু বলতে লাগলেন—বিয়ে করার বয়েস হয়নি আপনার ?

আমার কাছ থেকে কোনও উত্তর না-পেয়ে শ্রীবিলাসবাবু আবার বলতে লাগলেন—আমার বাবার যখন বিয়ে হয় তখন শুনেছি বাবার বয়েস ছিল পনরো বছর, আর মা'র বয়েস

বাড়ির কাছে এসে গিয়েছিলাম।

বললাম—আমি চলি—

বলে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে যেন বাঁচলাম। আমার যেন শ্রীবিলাসবাবুর সঙ্গ ভালো লাগছিল না আর। রাত্রে বাড়িতে গিয়েও কারো সঙ্গে যেন কথা বলতে ভালো লাগলো না। কাকীমা খাবার দিতে এলো।

বললাম—আজ খাবো না, ক্ষিদে নেই—

কাকীমা বললে—কেন? খাবিনে কেন? আজ আবার বুঝি ওরা খাইয়ে দিয়েছে?

বললাম—না—

—তবে?

—আজ শরীরটা ভালো নেই।

আজ অনেকদিন পরে ট্রেনে যেতে যেতে সেই সব কথাই মনে পড়তে লাগলো। সেই বনলতা, সেই শ্রীবিলাসবাবু, সেই ভুবন হাজরা, সেই শ্রীবিলাসবাবুর ভ্রাতৃবধূ। সবাইকে যেন চোখের সামনে দেখতে পেলাম। সেই মাঠ, সেই ঘাট, সেই দক্ষিণপাড়ার পুকুরটা, পুকুরপাড়ে বনলতাদের বাড়ি—তাদের উঠোন, উঠোনের ওপর লাউ মাচা। আর তারপরে শ্রীবিলাসবাবুর স্কুল—ইস্কুলের ছেলে-মেয়েরা।

ভদ্রলোকরা বলেছিলেন—সে ইস্কুল এখন পাকাবাড়ি হয়েছে, শ্রীবিলাসবাবু নিজের খরচে ইস্কুলের বাড়ি পাকা করে দিয়েছেন—

—আর আপনাদের ইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস?

ভদ্রলোকরা বললেন—তাঁর নাম বনলতা হাজরা, তিনি এই মছলন্দপুরের মেয়ে, তাঁর বাবা ভুবন হাজরা ওই শ্রীদামবাবুদেরই মুহুরী ছিলেন—

—ভুবন হাজরা বেঁচে আছেন?

—না, ওঁর বাবা-মা কেউ-ই বেঁচে নেই, ওঁর মা পাগল ছিলেন, তিনি আর সারেন নি শেষকালে। তাঁরা বেঁচে থাকলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে যেতেন, কিন্তু শ্রীবিলাসবাবু নিজেই ওঁকে লেখা-পড়া শিখিয়েছেন তাই উনি ইস্কুল নিয়ে আছেন—

শুনতে শুনতে কেমন মায়া হলো। বনলতার ওপর কেমন যেন দয়া হতে লাগলো। এখনও বিয়ে হয়নি!

ট্রেনেও কোনও অসুবিধে হল না। ভদ্রলোকেরা আপ্যায়নের ত্রুটি রাখেননি। স্টেশনে নেমেও গাড়ি লোকজন কিছুরই অভাব ছিল না। সবই তৈরি।

যা হোক, মনে আছে পরদিনও কেমন করে কাটাব তাই-ই ভেবেছিলাম শুধু। মনে হয়েছিল এর পরে শ্রীবিলাসবাবুর কাছেই বা মুখ দেখাবো কেমন করে! সমস্ত দিন ঘরের মধ্যে বন্ধ রইলাম।

শ্রীবিলাসবাবু ইস্কুল থেকে ফিরে ডাকতে পাঠালেন।

বলে দিলাম—বলে দিও তোমার বাবুকে আমার শরীর খারাপ—

কাকীমাকে বললাম—আমি কলকাতায় যাবো—

—কেন?

কাকীমা অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কি রে? এরই মধ্যে চলে যাবি? ছুটি ফুরোতে তো এখনও অনেক দেরি?

বললাম—আমার আর ভালো লাগছে না এখানে—

—কেউ তোকে কিছু বলেছে?

বললাম—কে আবার কী বলতে যাবে?

শ্রীবিলাসবাবু সেদিন নিজে এলেন। বললেন—শরীর খারাপ হয়েছে শুনলাম, কী হলো?

বললাম—আমি কলকাতায় চলে যাবো।

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—আমার কালকের কথাটা ভেবেছেন নাকি?

বললাম—আমার সঙ্গে এ আলোচনা করবেন না—

শ্রীবিলাসবাবু চলে গেলেন।

মনে হলো সেই দিনই কাকাকে বলবো আমি চলে যাবো কলকাতায়। সমস্ত দিনটা মাথা গরম হয়ে রইল। কিছু ভালো লাগলো না। কিন্তু আবার মনে হলো, এ নিয়ে মন-খারাপ করবারই বা কী আছে! শ্রীবিলাসবাবু কেনই বা আমাকে এত পীড়াপীড়ি করছেন কে জানে। তাঁর কীসের স্বার্থ! আমাকে বনলতার সঙ্গে আলাপ তো তিনিই করে দিয়েছিলেন। তিনিই তো আমাকে প্রথম দিন সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। তিনিই তো দিনের পর দিন আমার কানের কাছে বনলতার নাম উচ্চারণ করেছেন, তাঁর প্রশংসা করেছেন! বনলতার ওপর তাঁর যে অধিকার, আমার সে-অধিকার থাকবে কেন? তিনি নিজের বাড়ির সব সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে, বনলতার ভালো-মন্দ নিয়েই দিনরাত মাথা ঘামাচ্ছেন! তিনি তো সাধু সজ্জন মানুষ। অন্ততঃ গ্রামের লোক তাই-ই জানে! কিন্তু সত্যিই কি তিনি তাই! সত্যিই কি শুধু বনলতার মেধাই তাঁকে আকর্ষণ করেছে, আর কিছু নয়? কেন তিনি বনলতার কাছে কাছে থাকতে চান! কেন তিনি বনলতার সঙ্গে আমার একলা মেশার বিরোধী? তাঁর সঙ্গে বনলতাদের বাড়ি গেলে তাঁর তো হাসিমুখ দেখেছি, অথচ আমি একলা গেলেই কেন রাগ করেন, কেন মুখটা গম্ভীর হয়ে যায় তাঁর? অথচ তাই-ই যদি হয় তো তিনি আমার সঙ্গেই বা বিয়ে দিতে চান কেন? আমার সঙ্গে বনলতার বিয়ে হলে তাঁর কী লাভ?

পরের দিন বিকেলের দিকে কাকা বাড়ি আসতেই সব যেন পরিষ্কার হয়ে গেল।

অন্যদিন কাকা এসে আমার সঙ্গে দু'একটা কথা বলেন। একসঙ্গে তিনজনে জলখাবার খাই। কিন্তু সেদিন কিছুই করলেন না। দেখলাম তিনি এলেন বাড়িতে। জুতোর আওয়াজ পেলাম। কিন্তু আমার ঘরের দিকে এলেন না। সোজা কাকীমার ঘরের

দিকে গেলেন। কী যেন অনেকক্ষণ সব কথা হতে লাগলো। যেন আমাকে নিয়ে কিছু গোপনীয় কথা। মনে হলো কাকাও সব জানতে পেরেছে নাকি! যদি জানতে পেরে থাকে! লজ্জায় আধমরা হয়ে যেতে লাগলাম।

কিন্তু হঠাৎ কাকীমা ঘরে ঢুকলো।

বললে—এ কী সর্বনাশ করেছিস তুই?

আমি কাকীমার চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। কাকীমার মুখ-চোখের এমন চেহারা তো দেখিনি কখনও আগে!

বললাম—কী করেছি আমি?

কাকীমা বললে—আমাদের গালে চুন-কালি লেপে দিয়েছিস একেবারে? ছি ছি, এখন কী হবে? উনি যে কাউকে মুখ দেখাতে পারবেন না!

কী জানি, মনে হলো, তবে কি শ্রীবিলাসবাবুই কাকাকে কালকের ব্যাপার সব বলে দিয়েছেন!

কাকীমা বলতে লাগলো—উনি শুনে পর্যন্ত আপিসের কাজকর্ম কিছু করতে পারলেন না, সোজা বাড়ি চলে এলেন, তোর শেষকালে এই কাণ্ড?

আমি চুপ করে রইলাম। কী-ই বা আমার করবার ছিল!

কাকীমা আবার বলতে লাগলো—ওঁর তো বিশ্বাসই হয় না, আমারও কি বিশ্বাস হয়? কিন্তু তোর মুখ থেকেই শুনি আসল ব্যাপারটা কী।

বললাম—কীসের কী ব্যাপার?

কাকীমা বললে—বনলতা বলে কে একটা মেয়ে আছে এখানে তার সঙ্গে তুই মিশেছিস কোনও দিন? তার নাম শুনেছিস?

চুপ করে রইলাম। বললাম—কী বলেছে সে?

কাকীমা বললে—কিছুই বলেনি, কিন্তু তাকে দেখেছিস তুই কোনদিন?

বললাম—দেখেছি কিন্তু কী হয়েছে তাতে ?

কাকীমা বললে—তার সর্বনাশ করেছিস তুই ?

সর্বনাশ ! বললাম—কীসের সর্বনাশ ?

কাকীমা বললে—মেয়ে-মানুষের যে সর্বনাশ চরম সর্বনাশ হতে হয় সেই সর্বনাশ !

—তার মানে ?

—তার মানে তোর কাকাকে জিজ্ঞেস করগে যা, শ্রীবিলাসবাবুকে জিজ্ঞেস করগে যা, কিন্তু এত বড় বদ হয়েছ তুমি ? তুমি নিজে ডুবেছ, সঙ্গে সঙ্গে সকলের নাম-যশ সব ডোবালে ? এখন কী করে আমরা ওদের কাছে মুখ দেখাই, কী করেই বা এখানে থাকি ?

বলতে বলতে কাকীমা ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। শেষের কথাগুলোতে যেন কান্নার আভাষ মেশানো ছিল।

কিন্তু পরদিন আর ব্যাপারটা চাপা থাকলো না আমার কাছে। আমি ঘরের ভেতরে ছিলাম। সারাদিন ঘর থেকে বেরোই নি। পাশের ঘরে শুনতে পেলাম শ্রীবিলাসবাবুর গলা।

শ্রীবিলাসবাবু বলছেন—একটা মেয়ের সর্বনাশ হোক, এই আপনি চান ?

কাকা বললেন—ও এ কাজ করতেই পারে না—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—কোন্ মানুষ কখন কী করতে পারে কে বলতে পারে ? করতে পারে না, এ আপনি কী করে বলতে পারেন ?

কাকা বললেন—ওর কতই বা বয়েস ?

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—মেয়েটিরই বা কত বয়েস ? দু'জনেই তো ছোট সুতরাং সবই হওয়া সম্ভব !

কাকা বললেন—আমি বিশ্বাস করি না, আমার ভাইপোকে আমি আপনার চেয়ে বেশী চিনি—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—কিন্তু আপনি একবার সেই মেয়েটির কথা ভেবে দেখুন, তার দশা কী হবে ?

কাকা বললেন—সে আপনার কে হয়?

—আমার আর কে হবে! আমার ইস্কুলের একজন ছাত্রী! তা ছাড়া সকলের ভালো-মন্দ তো আমাদেরই দেখতে হয়। মেয়েটির বাবা আমাদের আগেকার মুহুরী ছিল, এখন ছেড়ে দিয়েছেন—আর তার মা পাগল—

কাকা বললেন—এর জন্য নিশ্চয়ই অন্য কেউ দায়ী—

—তা হলে আমি মেয়েটিকে আপনার কাছে আনছি, আপনি তার সঙ্গে কথা বলুন—

কাকা বললেন—তাকে আনবার দরকার নেই, আমি আমার ভাইপোকে চিনি, তার কথাই আমি বিশ্বাস করি—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—তা হলে তার দশা কী হবে? সেটাও তো আপনার একবার ভাবা দরকার? তার যে সন্তান হবে, সে ছেলের কী পরিচয় হবে, কে জেনে শুনে মেয়েটিকে আর পরেও বিয়ে করতে রাজী হবে বলুন—?

কাকা বললেন—আমি কোনও কথাই শুনতে চাই না—

শ্রীবিলাসবাবু বললেন—সেই মেয়েটি নিজে যদি আপনার কাছে এসে বলে তবু শুনবেন না?

কাকা বললেন—না, আমি মনে করি এর মধ্যে কোনও ষড়যন্ত্র আছে—

—ষড়যন্ত্র? আমি কীসের জন্য আপনার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে যাবো?

কাকা বললেন—না, আপনি নয়, আপনার কথা বলছি না—

—তবে? সেই মেয়েটি? এই অল্প বয়েসেই সে এমন ষড়যন্ত্র করতে পারবে বলে আপনার বিশ্বাস হয়?

কাকা বললেন—না, তবে আমার বিরুদ্ধে কোনও লোক হয়ত এই ষড়যন্ত্র করেছে, আমি অনেকের জমি জমা নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি করেছি, অনেক লোকের স্বার্থেও ঘা লেগেছে—

পরের দিনই কাকা টেলিগ্রাম করে ছুটি নিলেন অফিস থেকে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নিয়ে মছলন্দপুর ত্যাগ করলেন। আমি আর মুখ তুলে চাইতে পারলাম না কাকার দিকে।

সেই মাঠের পর মাঠ! সেই সর্ষে ক্ষেত, সেই সমাদ্দার-বাড়ির সামনে আমগাছটা ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

একবার জিজ্ঞেস করলাম—এখন বুঝি শ্রীদামবাবুই সব দেখেন?

ভদ্রলোকরা বললেন—হ্যাঁ,—

—এঁর ছেলেপুলে কী?

ভদ্রলোকরা বললেন—এঁর ছয় ছেলে তিন মেয়ে—

—শ্রীদামবাবুর মা বেঁচে আছেন?

ভদ্রলোকরা বললেন—না, শ্রীবিলাসবাবু মারা যাবার পরই একমাসের মধ্যে তিনি মারা গেলেন। শ্রীবিলাসবাবু সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন কি না—গ্রামের লোক সবাই তাঁকে খুব ভালবাসতো—তাঁর শোকে সবাই মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিল।

বললাম—তা তো বটেই—

ভদ্রলোকরা বললেন—তিনি তো নিজের বলে কিছুই করতেন না, যা কিছু সব দেশের জন্যে করে গেছেন, কত লোকের যে কত উপকার করে গেছেন তার ঠিক নেই! এই যে-ইস্কুলে যাচ্ছেন এটা তাঁরই হাতের সৃষ্টি, এর সমস্ত খরচ তিনি দিতেন, এমন কি ছেলে-মেয়েদের মাইনে পর্যন্ত লাগতো না, কারো কারো আবার সংসার খরচ পর্যন্ত লুকিয়ে লুকিয়ে চালাতেন—

—আর ওঁর ভাই, শ্রীদামবাবু?

—তিনি তো কেবল ফুটবল নিয়েই থাকেন, তবে ইস্কুলের নামটা দাদার নামে আছে বলে মোটা টাকা চাঁদা দেন বাৎসরিক। তিনিই ছিলেন এর প্রাণ!

বললাম—তিনি চলে যাবার পর?

—এখন গভর্ণমেণ্ট কিছু দিচ্ছে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডও কিছু দেয়, আর পাবলিকের চাঁদা!

তারপর বললেন—আর এখন যিনি হেড্ মিস্ট্রেস আছেন মিস্ বনলতা হাজরা, তিনি তো তাঁরই ছাত্রী—

রাস্তা ঘাটগুলো আগের চেয়ে অনেক পরিষ্কার হয়েছে দেখলাম। বড় রাস্তাটা তো পিচ্ বাঁধানোই হয়ে গেছে। ঝোপ-জঙ্গল কাটা হয়েছে। পুকুর আছে, কিন্তু আগেকার মতন নয়!

বললাম—এ জায়গাটার নাম কী?

ভদ্রলোকেরা বললেন—দক্ষিণপাড়া!

দক্ষিণপাড়া! দক্ষিণপাড়া নামটা শুনতেই বুকটা ছাঁৎ করে উঠলো। এই তো সেই দক্ষিণপাড়া। মানুষের কত স্মৃতি কত দেশে কত ভাবে মিশিয়ে থাকে। যেন এক নিমিষে আবার ছোট ছেলেটি হয়ে গেলাম। মনে হলো যেন এই পুকুরপাড়ে দাঁড়ালেই সেই বনলতা এসে ডাকবে—এই, শুনছেন—?

ভদ্রলোকেরা বললেন—আসুন এখানে, এসে গেছি—

গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে চেয়ে দেখলাম। অনেক লোক অপেক্ষা করছিলেন। আমার দিকে এগিয়ে এলেন তাঁরা, সবাইকে নমস্কার করলাম। আলাপ পরিচয় হলো।

—এই ইনি হলেন আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুত···

—এই ইনি হলেন সিনীয়র উকীল শ্রীযুক্ত···

এইরকম কতরকম লোককে যে চিনলাম, শুকনো নমস্কার করলাম তার ইয়ত্তা নেই। আমার জন্যে একটা বাড়ি ঠিক করা ছিল। সেখানেই বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়েছিল। আরো নতুন নতুন ভদ্রলোক এসে আলাপ পরিচয় করে গেলেন।

তারপর বিকেল বেলা মিটিং।

সভাও ভাল হয়েছিল। বক্তৃতাও ভালো হয়েছিল। লোকজনও

হয়েছিল প্রচুর। প্রচুর হাততালিও পেয়েছিলাম, কতকগুলো মিথ্যে কথা মিষ্টি করে বানিয়ে বানিয়ে বলেছিলাম—যা সব জায়গায় হয়ে থাকে। যা সব জায়গার লোকের ভাল লাগে। কিন্তু আমার মন পড়ে ছিল অন্য জায়গায়। কই বনলতাকে তো দেখলাম না! হয়তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এত বছর পরে হয়ত তার চেহারা বদলে গেছে তাই চিনতে পারছি না। তা-ও হতে পারে, কিম্বা হয়ত আসেই নি সে। হয়ত ইচ্ছে করেই আসেনি। সেদিন মিছিমিছি যে-অপবাদটা আমায় দিয়েছিলেন শ্রীবিলাসবাবু, তার জন্যে কে দায়ী! শ্রীবিলাসবাবু না বনলতা? সেটা সেদিন জানা হয়নি। মনে আছে সেই ঘটনার পরই আমরা চলে গিয়েছিলাম এখান থেকে। কাকা সেই যে ছুটি নিলেন আর আসেন নি কখনও মছলন্দপুরে। আর আশ্চর্য, আমাকেও কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। না কাকীমা, না কাকা! তা যদি করতেন তো আমার বোধ হয় দুঃখের অবধি থাকতো না।

মনে আছে চলে যাবার দিন শ্রীবিলাসবাবুর মা কিছু খাবার পাঠিয়েছিলেন গাড়িতে খাবার জন্যে। কাকা তা-ও নিতে বারণ করলেন কাকীমাকে। খাবার নিয়ে লোক ফেরত গেল।

শ্রীবিলাসবাবুও এসেছিলেন যাবার সময়।

কাকা কোনও কথা বললেন না তাঁর সঙ্গে। আমিও কোনও কথা বললাম না। আমরা যখন চলে গেলাম, তখনও শ্রীবিলাসবাবু সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন দেখেছিলাম।

মিটিং-এ শ্রীদামবাবু এসেছিলেন। আমাকে চিনতে পারলেন না। না-পারারই কথা। আমিও পূর্ব-পরিচয় দিলাম না। তিনি বললেন—তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশী হয়েছেন। আমিও তাই বললাম।

তারপর মিটিং-এর শেষে নিজের আশ্রয়ে ফিরে গেলাম। অনেক লোক-জন সঙ্গে ছিল। তাঁরাও আমার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। রাত্রে

এখানেই থাকতে হবে। ভোর বেলা গাড়ি। রাত থাকতে উঠে আমায় যেতে হবে স্টেশনে।

ভদ্রলোকেরা বললেন—আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে থাকুন, আমরা ঠিক সময়ে আপনাকে গাড়িতে তুলে দেব, কামরা আপনার জন্যে রিজার্ভড্ থাকবে—

খেতে খেতে ভদ্রলোকেরা অনেক গল্প করলেন। কেমন লাগলো মছলন্দপুর। দেশের অবস্থা, জনসাধারণের দারিদ্র্য নিয়েও আলোচনা হলো। গভর্ণমেন্টের গাফিলতি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অনাচার —যত সব আজে-বাজে কথা। তারপর একসময়ে তাঁরা চলে গেলেন।

বললেন—এবার আপনি ঘুমোন, আপনাকে খুব বিরক্ত করে গেলাম—

চলে যাবার পর বেশিক্ষণ কাটেনি। তখনও আলোটা নেভানো হয়নি। বসে বসে সেই সব দিনের কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ দরজা ঠেলে কে যেন এল।

আমি চম্‌কে উঠলাম!

না বনলতা তো নয়। সে কেন এমন হবে! খুব মোটাসোটা একজন মহিলা ঘরে ঢুকলেন। চোখে মোটা কাচের চশমা। আমি চিনতে পারলাম না।

বললাম—কে আপনি?

মহিলাটি বললেন—আমি শ্রীবিলাস মেমোরিয়াল স্কুলের হেড মিস্ট্রেস—

—বনলতা?

—হ্যাঁ, বনলতা হাজরা।

বললাম—বোস, বোস এখানে—

বনলতা বসলো না। এ কী চেহারা হয়েছে বনলতার! তবে কি ওর চোখে আমিও বদলে গিয়েছি!

—আপনি আমায় ক্ষমা করুন !

আরো অবাক হলাম। বললাম—কিসের ক্ষমা ?

—বলুন, আপনি আমায় ক্ষমা করেছেন ?

বললাম—সে সব কথা তোমার মনে আছে ?

বনলতা মুখ নিচু করলে। বললে—আমি কিছু ভুলতে পারি না।

মনে পড়লো—শ্রীবিলাসবাবু বলেছিলেন—ওর স্মরণশক্তিটা খুব ভালো। অদ্ভুত মেধা ওর।

চুপ করে রইলাম। বললাম—আমিও ভুলতে পারি না—

বনলতা বললে—আপনার কথা আপনিই জানেন, কিন্তু আমি আমার নিজের কথাই আজ আপনাকে বলতে এসেছি—

বললাম—তোমার নাম শুনেই আমি এখানে এসেছি, নইলে সভা-সমিতিতে আমি যাই না কখনও—

তারপর একটু থেমে বললাম—এখানে এসে পর্যন্ত আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম, কোথাও দেখতে পাইনি তোমাকে—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

বনলতা কিছু উত্তর দিলে না।

বললাম—আমি কাল ভোর রাত্রেই চলে যাবো—

বনলতা মুখ নিচু করে ছিল। বললে—আপনাকে আজ আমি শুধু একটা কথা বলতে এসেছি, সেই কথাটা বলেই চলে যাবো—

বললাম—বলো—

বনলতা বললে—সেদিন যে ঘটনাটা ঘটেছিল, তার জন্যে আমি দায়ী নই।

বললাম—শুধু এই কথা বলতেই এসেছ !

বনলতা বললে—হ্যাঁ।

বললাম—আমি তো তোমাকে দায়ী করিনি ? কে বললে তুমি দায়ী ?

কি জানি কি হোল, বনলতা হঠাৎ আমার পায়ে হাত দিলে। দিয়ে মাথায় ছোঁয়াতে যাচ্ছিল। আমি হাতটা ধরে ফেললাম। বললাম—থাক—থাক—

বনলতা আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে—এবার আমি আসি—

বললাম—আর কিছু বলবে না ?

বনলতা মাথা নাড়লো। বললে—না।

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে ছিলাম। তারপর বললাম—তুমি বিয়ে করলে না কেন ?

বনলতা এ-কথার কোনও জবাব দিলে না।

বললাম—বিয়ে করলে না কেন, বলো না ?

বনলতা মুখ নিচু করে শুধু বললে—হলো না—

বলেই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল। ধরে ফেললাম।

বললাম—কেন হলো না, স্পষ্ট করে বলো ?

বনলতা থর থর করে কাঁপছিল টের পাচ্ছিলাম।

আবার বললাম—কেন বিয়ে হলো না বলো ?

বনলতা বললে—মাস্টার মশাই চাননি যে আমার বিয়ে হোক !

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—সে কি ! তিনিই তো আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন !

বনলতা হাসলো। বড় ম্লান হাসি। বললে—সে ছলনা—

আরো অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—তা হলে সেই অপবাদ ? আমার নামে সেই জঘন্য অপবাদ ? তা-ও কি ছলনা ?

বনলতা বললে—ছলনা নয়, মিথ্যে।

বলে আর দাঁড়াল না। হঠাৎ দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

বনলতার সঙ্গে সেই-ই আমার শেষ দেখা।

পরদিন শেষ রাত্রেই মছলন্দপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে হলো।

ইরা, সবিতা আর বনলতার কাহিনী আপনারা শুনলেন। এখন আপনারাই এবার এদের বিচার করুন।